শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

সমগ্র রচনাবলী

দশম খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

সমগ্র রচনাবলী

দশম খণ্ড

লেখা এবং বক্তৃতা
(১৯৪১-১৯৪৩)

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু

অনুবাদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-410-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

SAMAGRA RACHANABALI X
[Anthology]
of
Subhas Chandra Bose
edited by
Sisir Kumar Bose
and Sugata Bose
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

ডা. শিশিরকুমার বসু এবং নেতাজির কাজ[১]

১৯৪১-এর ১৬ ও ১৭ জানুয়ারির দুই গুরুত্বপূর্ণ রাত্রিতে নেতাজির যিনি সারথি ছিলেন, তিনি ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে যান। ডিসেম্বর ১৯৪০-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশির বসুকে নেতাজি তাঁর পাশে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "আমার একটা কাজ করতে পারবে?" সেই জাদুকরী মুহূর্তের পর থেকে নেতাজির কাজে শিশির বসুর কোনও বিরাম ছিল না। ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সারা সকাল নেতাজির শয়নকক্ষের পাশে সভাপতির দপ্তরে তিনি কাজ করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নেতাজির জীবনের গ্রন্থটি থেকে শিক্ষা লাভ করে। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে নেতাজির বন্ধু দিলীপকুমার রায় শেষবার যখন আসেন, তখন বলেছিলেন, "শিশির, জান তো, loyalty কথাটার কোনও বাংলা সঠিক প্রতিশব্দ হয় না, কারণ আমরা বাঙালিরা loyal হতে জানি না। তুমি কিন্তু loyalty কাকে বলে তা দেখিয়ে দিয়েছ।"

"সুভাষচন্দ্র বসুকে সাহায্য করা"র অপরাধে শিশিরকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে, দিল্লির লালকেল্লায়, লাহোর দুর্গে এবং ল্যালপুর জেলে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। নেতাজির রচনাবলী ১১ এবং ১২ খণ্ডে ওই সব বছরের কথা আছে।[১] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের অগ্রগণ্য শিশুরোগ চিকিৎসক হিসেবে অক্লান্ত কাজের পরেও, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের স্মৃতি রক্ষার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ডা. শিশিরকুমার বসু নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর মাধ্যমে নেতাজির ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ২০০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ৮০ তম জন্মতিথিতে 'উত্তরাধিকার' নামে একটি কবিতা রচনা করে তাঁর প্রয়াস সর্বোত্তমরূপে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

উত্তরাধিকার

আমাদের এই জীবন
পরিপূর্ণতার এক ছবি,
উত্তরাধিকার রক্ষার দায়
ছিল বড়ই কঠিন,
কিন্তু শেষ রক্ষা তো হল
সে এক কাহিনী।
পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে

---

১. ডা. শিশিরকুমার বসু নেতাজি রচনাবলী ১০ম ও ১১তম খণ্ড পুস্তকের আকারে দেখে যেতে পারেননি, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তাঁর জীবনব্যাপী আত্মনিয়োগের প্রতি এটি একটি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

এক যাত্রা, হাতে হাত
ধরে, ইতিহাস প্রতিষ্ঠায়,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রচারে
এবং সর্বোপরি দেশসেবার
বাণী সযত্নে রক্ষায়।
ভালবাসায়, নিষ্ঠায়, সেবায়
সমৃদ্ধ আমাদের এই জীবন।

আশি বছরের জন্মদিনে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

আমাদের দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, *"শিখা থেকে শিখা জ্বালতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নিগ্রহণ করতে হবে।"*

এই 'মহৎ প্রতিষ্ঠান'-এর জন্মদাতা (শিশিরের স্ত্রীকে লেখা শোকপত্রে রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণনের কথায়) এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর একটি ভাষণে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা থেকে, *"মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন— তাঁর সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে— এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনও সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনও লৌকিক ও সাংসারিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তাঁর সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।"*

রবীন্দ্রনাথের লেখাকে একটু এদিক-ওদিক যদি করতে পারি: *"একদিন তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকেই জেনেছিল... তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।"*

সেই অঙ্গীকার আমি ড. শিশিরকুমার বসুর নিজের কথায় শেষ করছি:

কাজ চলছে

ব্যাপারটা ঘটেছিল শীতের এক দুপুরে,
আমার ডাক পড়ল, কাছে বসতে বলে
জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একটা কাজ আছে,
করতে পারবে?
স্নিগ্ধ শান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিলেন
আমার জবাবের আশায়,
আমি কীই বা বলব!
কী কাজ? চিঠি ডাকে দিতে হবে?
টেলিগ্রামের খসড়া করতে হবে?
অথবা কোন অতিথিকে দেখাশোনা?
না, এক গোপন কাজ, এক গোপন যাত্রার
সাথী হতে হবে, কেউ জানবে না!

[ছয়]

জানবে শুধু ইলা।
তাই তো, এ আবার কী কাণ্ড কারখানা?
মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে
বাবা বলেছিলেন
ছেলেটা সুভাষের পাল্লায় পড়েছে,
কথাটা ফলে গেল না কি!
সেই তো কাজের শুরু, কাজ চলছে,
কাজ চলবে।

সুগত বসু

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ডক্টর এ. সি. বোস এবং অগ্রজ জেনারেল এ. গর্তন-কে সম্পাদকীয় কাজে তাঁদের পরামর্শের জন্য, ঐতিহাসিক চক্রবর্তীকে সচিব সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য, প্রয়াত ইনামুল হককে নথিপত্র সংক্রান্ত সহায়তার জন্য, মনোহর মণ্ডল এবং মুন্সীকে অনলে বর্ণালত্র প্রকাশন বিভাগের কাজে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বিবরণগুলি সংগ্রহে সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ প্রয়াতা এমিলি শেঙ্কল, প্রয়াতা নাওমি ভেটার, প্রয়াত অ্যালবার্তো কুয়ারোনি, প্রয়াত ড. অ্যালেকজান্ডার ওয়ার্থ, ড. মিলোস্লাভ ক্রাসা এবং ইউরোপের অন্যান্য বন্ধুদের প্রতি।

এই সুযোগে আমরা আরেকবার নেতাজির স্ত্রী এমিলি শেঙ্কল এবং তাঁদের কন্যা অনিতা পাফকে, নেতাজি রচনাবলীর অধিকারস্বত্ব নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোকে উদারভাবে দান করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভূমিকা

১৬-১৭ জানুয়ারি ১৯৪১-এর রাতে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে কলকাতায় এলগিন রোডের গৃহ পরিত্যাগ করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির একটি ওয়ান্ডারার গাড়িতে বিহারের গোমো রেল জংশন পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যান। যাত্রার আগে তিনি পরবর্তী তারিখের কয়েকটি পোস্টকার্ড লিখে রেখে যান যাতে শিশির কলকাতায় ফিরে ডাকে দিতে পারেন এবং ব্রিটিশদের এই ভুল ধারণা হয় যে তিনি তখন বাড়িতেই আছেন। তাঁর রচনাবলীর ১১তম খণ্ডের প্রথমেই সেরকম একটি চিঠি আছে, তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী, এবং জেলে অন্তরিন হরিবিষ্ণু কামাথকে লেখা। তাঁর পলায়নের চিহ্ন গোপন রাখবার জন্য চিঠিতে লেখা হয়েছিল, "খুব শীঘ্র আমাকে জেলে ফিরে আসতে হবে, কারণ আমার বিরুদ্ধে এখন দু'-দুটো মামলা চলছে।" দু' বছর পরে ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ইউরোপ থেকে এশিয়ায় তাঁর বিপদসংকুল ডুবোজাহাজ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুকে বাংলায় একটি মর্মস্পর্শী পত্র লিখেছিলেন, এই খণ্ডের সেটিই সর্বশেষ রচনা। "আজ আবার আমি এক বিপদসংকুল যাত্রা করছি। তবে আজ যাচ্ছি দেশের দিকে। এই পথের শেষ হয়তো আমি দেখতে পাব না, যদি আমি কোনও বিপদে পড়ি, এ-জীবনে তোমাকে আমি আর কোনও খবর পাঠাতে পারব না। সেই জন্যেই আমি এখানে আমার খবর রেখে যাচ্ছি, যথাসময়ে এটি তোমার কাছে পৌঁছবে। এখানে আমি বিবাহ করেছি এবং আমার একটি কন্যা আছে। আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রী এবং কন্যাকে সেই স্নেহ দিও, যা সারাজীবন আমাকে দিয়ে এসেছ।"

এই দুটি যাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে এসেছিল ভারতের সর্বাগ্রগণ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবীর জীবনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পর্যায়। এই সময়কার রচনা ও বেতারভাষণ বহু বিষয়ের ওপর প্রসারিত। তার মধ্যে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও ঘটনাক্রম, বিশ্বযুদ্ধের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা, ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ওপর সর্বশেষ সশস্ত্র আঘাত হানার পরিকল্পনা, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মানির আক্রমণে মর্মবেদনা ও সমালোচনা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন ধারণাসমূহের ভণ্ডামি, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানের ভূমিকা, ক্রিপস প্রস্তাব বাতিল করার কারণ, বছরের পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সমর্থন এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। ইউরোপে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'-এর দ্বিমাসিক মুখপত্র 'আজাদ হিন্দ'-এ এর কয়েকটি মুদ্রিত হয়েছিল। এখন পত্রিকাটি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।[১]

---

১. জার্মান এবং ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত কে. এ. ভট্ট এবং এতে কয়েকজন প্রতিভাশালী যুবকের চমৎকার প্রবন্ধ ছিল যাদের নেতাজি নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও নেতাজির নিজের বিবৃতি ও বেতারে ভাষণ তো ছিলই। নেতাজির বেতার ভাষণ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের আধিকারিকেরা রেকর্ড করে তার অনুলিপি করে রেখেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু মোহাম্মেদ জিয়াউদ্দিন নামক এক জীবনবিমা এজেন্ট, যিনি ব্যবসাসূত্রে ভ্রমণ করতেন, তাঁর ছদ্মবেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। তিনি গোমো থেকে দিল্লি যান দিল্লি-কালকা মেলে এবং সেখান থেকে ফ্রন্টিয়ার মেলে পেশোয়ার। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন মিঞা আকবর শাহ। ১৯৪১-র ২৬ জানুয়ারি, ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে উপজাতিদের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।[২] সহগামী ও রক্ষী হিসাবে ভগতরাম তলওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কখনও পায়ে হেঁটে এবং কখনও কারও গাড়িতে জায়গা করে নিয়ে একজন বোবা-কালা তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে দূরূহ এবং বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে কাবুল পৌঁছলেন ৩১ জানুয়ারি ১৯৪১। সেখানে দেড় মাসের বেশি তিনি স্থিত থাকলেন, যতদিন না ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে তিনি ওরল্যান্ডো মাৎসোটা ছদ্মনামে মস্কো হয়ে বার্লিন পৌঁছতে পারেন।

ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ ১৯৪১-এ কাবুলে সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষার সময়ে তিনি একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সন্দর্ভ রচনা করেন, 'কাবুল থিসিস' বলে প্রায়ই যার উল্লেখ করা হয়। হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতাবাদের বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাহায্যে তিনি যুক্তি দেখান যে ইতিহাসের প্রত্যেকটি পর্বে একটি দক্ষিণপন্থী তত্ত্বের বিপক্ষে একটি বামপন্থী বিপরীত তত্ত্ব প্রয়োজন, উচ্চতর বিশ্লেষণ মাধ্যমে সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য। লক্ষ করার বিষয়, তিনি বলেন, গান্ধী ১৯২০-২-এ তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পর্বে নরমপন্থী সাংবিধানিকতাবাদের দক্ষিণপন্থী থিসিসের বিরুদ্ধে বামপন্থী বিপরীত তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে প্রকৃত বামপন্থী মতবাদের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য তিনি দুটি মাপকাঠির পুনরুল্লেখ করেন— বর্তমান পর্বে আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, এবং এর পরবর্তী পর্বের জন্য সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চাপ সৃষ্টির জন্য গোষ্ঠীর প্রাথমিকতা পরিত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণের জন্য তাঁর আশা, "ইতিহাস চাল থেকে ভুষি অর্থাৎ প্রকৃত বামপন্থী থেকে মেকি বামপন্থীকে আলাদা করে দেবে।" তিনি দাবি করেন 'তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসকে গতিহীনতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে', 'কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে তা যতই কম হোক আবার ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে।' 'কংগ্রেসের বুদ্ধিবৃত্তি ও আদর্শবাদকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে।' তিনি জোর দিয়ে বললেন, "সময় হলে ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসে বামপন্থীদের উত্থান প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, যাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের অগ্রগতি বিনাবাধায় চলতে পারে।" ২২ মার্চ ১৯৪১ তারিখে এই হস্তলিখিত তত্ত্ব ভগতরাম তলওয়ার শরৎচন্দ্র বসু এবং শিশিরকুমার বসুর হাতে কলকাতার উডবার্ন পার্কে তাঁদের বাড়িতে তুলে দেন। এখন এটি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর হেফাজতে রক্ষিত আছে।

কেউ একজন, যাঁর এই অনুলিপি হাতে পাবার অধিকার ছিল, কয়েকটি বেতারভাষণ সংকলন করে 'অরুণ' ছদ্মনামে ১৯৪৬ সালে Testament of Subhas Bose এই নামে প্রকাশ করেছিল। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর গ্রন্থালয়ে সেটি সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সেইসব পাণ্ডুলিপি ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় প্রতিরক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত ফাইলগুলিতে পাওয়া যাবে। একই বেতার ভাষণের 'আজাদ হিন্দ'-এর ভাষ্য এবং সেই ভাষণের ব্রিটিশ সরকারের অনুলিপির মধ্যে অসংগতি দেখা গেলে, আমরা 'আজাদ হিন্দ' ভাষ্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছি।

নেতাজি "The Indian Struggle" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেছিলেন, যাতে, ১৯৩৫-৪২, এই সময়কালের বিবরণ আছে। এটি প্রকাশিত হয়েছে শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু সম্পাদিত Netaji Collected Works Volume 2. The Indian Struggle 1920-1942, (Calcutta: Netaji Research Bureau এবং Delhi: Oxford University Press, 1997) গ্রন্থে।

২. সম্পূর্ণ কাহিনির জন্য দেখুন: "The Great Escape" (Calcutta: Netaji Research Bureau, 3rd Edition, 2000)

"আমার এই চিঠি পড়ে তুমি অবাক হবে," ৩ এপ্রিল ১৯৪১ তিনি এমিলি শেঙ্কলকে লেখেন, "এবং আরও অবাক হবে জেনে, যে, এই চিঠি আমি বার্লিন থেকে লিখছি।"[৩] আগের দিন বিকালে তিনি মস্কো থেকে উড়ানে জার্মান রাজধানী বার্লিনে এসেছিলেন। সুভাষ ১৯৪১ সালে ইউরোপে এসেছিলেন প্রধানত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। তাঁরা জার্মানি ও ইতালির হাতে যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিনি অনেক দিন থেকেই বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় সৈনিকদের আনুগত্য উচ্ছেদ করে তার জায়গায় ভারতীয় জাতির প্রতি নতুন আনুগত্য স্থাপন করা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক অত্যন্ত জরুরি অংশ হতে হবে। যেটা অনেকেরই জানা নেই, তা হল, সেই সময়ে তাঁর ইউরোপ যেতে চাওয়ার একটি গুরুতর ব্যক্তিগত কারণও ছিল। ২১ জুন ১৯৩৯ তারিখে তিনি এমিলিকে লিখেছেন, "তুমি আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করো, সম্ভবত আমি তখন গ্যাসটেইনে (ব্যাড গ্যাসটেইন তাঁদের জনপ্রিয় অস্ট্রীয় ভ্রমণকেন্দ্র) যাব।" আবার ৬ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে তিনি লেখেন, "আমাকে অন্তত এক মাসের ছুটি নিতে হবে, কিন্তু আমি জানি না সে ছুটি আগস্টের মাঝামাঝি আরম্ভ হবে, না সেপ্টেম্বরের শুরুতে।" সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সেসব পরিকল্পনার দফা-রফা হয়ে গেল। কিন্তু এখন, যুদ্ধ যখন চলছে, সুভাষ এবং এমিলি বার্লিনের কাছে শালটেনবার্গে সাত নম্বর সোফেইনস্ট্রাসে স্বল্পকাল গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে পারলেন। অবশ্য দেশের কাজে ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার সুভাষচন্দ্র করেই চললেন।

ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে সুভাষ আগেই আলবার্তো কুয়ারোনিকে বলে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন কাবুলে ইতালির রাষ্ট্রদূত, সুভাষের ইউরোপ যাত্রার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। ৯ এপ্রিল ১৯৪১ জার্মান গভর্নমেন্টের কাছে সুভাষ একটি বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করেন। তাতে ছিল ইউরোপ, আফগানিস্তান, উপজাতীয় অঞ্চল এবং ভারতে কী কী করতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন, "ব্রিটিশ শক্তির শেষ অবস্থায় ভারত থেকে তাকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে বস্তুত সুদূর প্রাচ্যে জাপানের বৈদেশিক নীতি অত্যন্ত সহায়তা করতে পারে।" নিজের দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, "সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌবহরের পরাজয়— সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ঘাঁটির ধ্বংস সহ— স্বাভাবিকভাবেই ভারতে ব্রিটেনের সামরিক শক্তি ও মর্যাদা দুর্বল করে দেবে।" তবে, তাঁর মনে হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানের মধ্যে একটি অগ্রিম বোঝাপড়া হলে চিনের সঙ্গে তাতে মিটমাটের পথ প্রশস্ত হবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানকে আত্মবিশ্বাস সহকারে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার পথ সহজ করে দেবে। ৩ মে ১৯৪১-এ আরেকটি অতিরিক্ত স্মারকপত্রে তিনি অক্ষশক্তিকে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন ভারত ও আরব দেশগুলির স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁদের নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। তা ছাড়াও তিনি আলোচনা করেন ভারত এবং জার্মানির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চারটি সম্ভাব্য পথ নিয়ে, যার মধ্যে তাঁর একটি পছন্দের পথ রাশিয়া এবং আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে গেছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্রচলিত ধারা অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একটি সশস্ত্র অভিযান ভারতের নিরস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপুলভাবে সহায়তা করবে। দেশে কমরেডদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন কাবুল এবং কলকাতাস্থিত জাপানি

---

৩. এমিলি শেঙ্কলকে সুভাষচন্দ্র বসু, ৩ এপ্রিল ১৯৪১, (Netaji Collected Works Volumn 7, to Emili-Schenkl 1934-1942, Calcutta Netaji Research Bureau and Delhi Oxford University Press 1994, p. 216. এই সময়ে এমিলি শেঙ্কলকে পত্র এই খণ্ডে দেওয়া হয়নি। কারণ বিশেষ খণ্ড Vol vii-এ সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

দূতাবাসের মারফত বার্তা প্রেরণ করে। তাঁরা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

নিজের কোনও পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার আগে সুভাষচন্দ্র বসু তিন অক্ষশক্তির (জার্মানি, ইতালি, জাপান) কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দাবি করেন। মে ১৯৪১-এর শেষ পর্বে তিনি নিজেই সেরকম একটি ঘোষণার খসড়া করেন, যাতে জার্মানির ও ইতালির গভর্নমেন্ট সেটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রায় এক বছর পরে ৫ মে ১৯৪২, সুভাষ ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে মুসোলিনিকে সেরকম ত্রি-পাক্ষিক ঘোষণায় সম্মত করতে সক্ষম হন। কিন্তু জার্মানরা নানা অজুহাতে সে বিষয়ে বিলম্ব করতে থাকে,[৪] জার্মানি ২২ জুন ১৯৪১ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন সুভাষচন্দ্র ইতালিতে তাঁর প্রথম দিকের একটি যাত্রায় গিয়েছিলেন। ঘটনার এইরকম দিক পরিবর্তনে সুভাষচন্দ্র যারপরনাই মর্মাহত হন, কারণ এতে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় জাতির নিশ্চিত বিশ্বাস, "জার্মানিই আক্রমণকারী"। ১৫ আগস্ট ১৯৪১-এ জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop)-কে একটি চিঠিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে একটি ঘোষণা ব্যতিরেকে জার্মানির সৈন্যবাহিনী যত ভারতের দিকে অগ্রসর হবে, ভারতের মানুষ তত জার্মানির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। রিবেনট্রপকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেন, *"পূর্ব দিকে জার্মান বাহিনী অগ্রসর হলে মনে করা হবে বন্ধু নয়, শত্রুরাই এগিয়ে আসছে।"*

তা হলেও প্রতিকূল অবস্থায় হতোদ্যম না হওয়ার গুণ সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণমাত্রায় ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাসিত ভারতীয়দের, যাঁদের মধ্যে অনেক ছাত্র ছিলেন, তাদের সাহায্যে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার এবং ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে থেকে তিনি ইন্ডিয়ান লিজন গঠন করেন। বিভিন্ন আদর্শবাদে বিশ্বাসী প্রতিভাসম্পন্ন ভারতীয়, যাঁরা সকলেই ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ গঠনের ব্রতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, এ. সি. এন নাম্বিয়ার, আবিদ হাসান, এন. জি. স্বামী, এন. জি. গানপুলে, এম. আর. ব্যাস, পি. বি. শর্মা, প্রমোদ সেনগুপ্ত, জে. কে. ব্যানার্জি, এ. এম. সুলতান, হবিবুর রহমান এবং গিরিজা মুখার্জি। ভারতের জাতীয় অভিবাদন "জয় হিন্দ" এই সময়ে প্রচলিত হয়। সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়কে অভিন্ন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার বিশেষ প্রচেষ্টা তখন আরম্ভ হয়।

যুদ্ধে জাপানের প্রবেশ এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তার দ্রুত অগ্রগতি নেতাজির জন্য নতুন রণকৌশলের সম্ভাবনা খুলে দেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সিঙ্গাপুরের পতন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু ওরল্যান্ডো ম্যাজোটা এই পরিচয় ত্যাগ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ ভারতের উদ্দেশে খোলাখুলি তাঁর প্রথম ভাষণ বেতার যোগে প্রচার করেন। প্রায় এক বছর পরে তাঁর স্বদেশবাসী তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে: "আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ রেডিয়োতে আপনাদের উদ্দেশে কথা বলছি।" তিনি ঘোষণা করেন, "সিঙ্গাপুরের পতনের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া, যে অন্যায় রাজত্বের শৌর্য প্রতীক তার অবসান, এবং ভারতের ইতিহাসে এক নতুন প্রভাতের উদয়।... ভারতের বন্ধন মোচনের মধ্য দিয়ে এশিয়া এবং পৃথিবী আরও বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে

---

৪. দেখুন লেনার্ড এ গর্ডন-এর "Brothers against the Raj", A Biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose (New York, Columbia University Press 1990), p. 483

যাবে মানবের মুক্তির অভিমুখে।" জাপানি সামরিক বাহিনী যখন ব্রিটিশদের কাছ থেকে রেঙ্গুন অধিকার করল, তিনি বর্মার স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে স্বাগত জানালেন। ব্রিটিশদের যে প্রচার ভারত শত্রু আক্রমণের সম্মুখীন, এবং তার সীমান্ত সুয়েজে এবং হংকং-এ ভারতীয় সৈন্যদের যাকে রক্ষা করতে হবে, সেই প্রচারকে বিদ্রূপ করে তিনি বললেন, 'ভারতের কোনও কাল্পনিক ওয়েভেলীয় সীমান্ত নেই', আছে 'একমাত্র ভৌগোলিক সীমারেখা, যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঈশ্বর এবং প্রকৃতি।' ১৯৩৯ সালে ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে এসে এখন ব্রিটিশরা চাইছে 'যুদ্ধটাই ভারতের মধ্যে নিয়ে আসতে।'

১৯৪২-এর মার্চে ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা খবর দেয় যে সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সেই খবর সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডন করলেন নেতাজি নিজেই ২৫ মার্চ ১৯৪২ একটি বেতার ভাষণে, যাতে তিনি বললেন, 'আমার মৃত্যুসংবাদ সম্ভবত ইচ্ছা প্রসূত।' তিনি ভারতবাসীদের সাবধান করে দেন, যেন তাঁরা ব্রিটেনের বিভেদ নীতি সম্পর্কে সতর্ক থাকেন, যে বিভেদ নীতি ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ড এবং প্যালেস্টাইনে প্রয়োগ করেছিল। ১৯৪২-এর বসন্তকালে পর পর কয়েকটি বেতারভাষণে তিনি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কঠোর সমালোচনা করে বলেন তিনি সাম্রাজ্যবাদের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করেছেন এবং ভারতবাসীকে ও তাদের নেতাদের বলেন, তাঁরা যেন যুদ্ধের পর ব্রিটেন প্রস্তাবিত ডমিনিয়ন স্বীকৃতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর দেওয়া "ভারতবাসীর জন্য ভারত" প্রতিশ্রুতিকেই তিনি স্বাগত জানান। জাপান সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি আজাদ হিন্দ বেতারের প্রচার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রচারগুলি সাধারণত এই কথাগুলি দিয়ে শুরু হত— "অস্ত্র ধরো অস্ত্র ধরো, আকাশ ভরো তূর্য ধ্বনি, স্বাধীনতার যুদ্ধে" এবং প্রচার শেষ হত এই কথা দিয়ে, "আমাদের লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত।" ১ মে ১৯৪২ একটি খোলাখুলি ভাষণে তিনি বলেন, "ত্রিদলীয় শক্তির তিনি ওকালতি করেন না এবং তারা অতীতে যা করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে তার সাফাই গাওয়া তাঁর কাজ নয়।" ব্রিটেনের বেতন-ভোগী প্রচারকদের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিজের রণকৌশল সঠিক বলে ব্যাখ্যা করেন:

> *আমি আমার স্বদেশবাসীর উদ্দেশে যখন কথা বলি তখন আমার কোনও শংসাপত্র দরকার হয় না।* আমার সমগ্র জীবন, যে-জীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাস, তাই হল আমার সদুদ্দেশ্যের নিশ্চয়তা।... ব্রিটিশরা, যারা কূটনীতিতে এবং রাজনৈতিক ছলাকলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী তারাই যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমাকে প্রলুব্ধ করতে, চরিত্রভ্রষ্ট করতে, পথভ্রান্ত করতে না পেরে থাকে, পৃথিবীতে আর কোনও শক্তির ক্ষমতা নেই সে-কাজ করবার। *আমি সারাজীবন ভারতের সেবক এবং জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত আমি তাই থাকব। আমার আনুগত্য চিরকাল ভারতের প্রতি আছে এবং একমাত্র ভারতের প্রতিই থাকবে, আমি যখন পৃথিবীর যেখানেই থাকি।*

পৃথিবীর ইতিহাসে সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর ভূমিকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। "এখন সময় এসেছে", ভন রিবেনট্রপকে তিনি ২২ মে ১৯৪২ তারিখ লিখলেন, "যখন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য শেষ চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আবার প্রাচ্যে আমার অবস্থান অপরিহার্য। যখন আমি সেখানে থাকব, একমাত্র তখনই বিপ্লবকে আমি ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারব।"

২৯ মে ১৯৪২, হিটলারের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাক্ষাৎকারে 'প্রাচ্যে যাত্রার বিষয়টি' তিনি উত্থাপন করেন, তিনি চাইছিলেন ভারতের যত কাছে সম্ভব থাকতে, যেখান থেকে ভারতের বিপ্লব পরিচালিত করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে জার্মানির ফ্যুয়েরার এই প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং সাবমেরিনে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় যাত্রার জন্য সুভাষকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। সুভাষচন্দ্র অন্যান্য বিষয়ও উত্থাপন করেন, যার মধ্যে ছিল 'Mein Kampf' গ্রন্থে হিটলারের ভারত-বিরোধী বিবিধ মন্তব্য। হিটলার বিষয়টি এড়িয়ে যান এই কথা বলে যে 'রাইখে ভারতীয় ধরনের অহিংস প্রতিরোধ' তিনি চাননি। একথা পরিষ্কার যে মুখোমুখি বসা লোকটির জাতিবিদ্বেষ প্রসূত নারকীয় খুনে প্রবৃত্তির রাক্ষুসে ভাব সম্পর্কে সুভাষ অবহিত ছিলেন না।

অক্ষশক্তিসমূহের সঙ্গে নিজের আদর্শবাদী দূরত্বের গুরুত্ব বিষয়ে নেতাজি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বারে বারে বলতেন, একবার স্বাধীনতা পেলে ভারতীয়দের কর্তব্য হবে তারা কীরকম সরকার চায় এবং ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কার নেতৃত্বাধীন থাকবে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। "ভারতের ইতিহাসের এই সংকটকালে" তিনি ১৭ জুন ১৯৪২-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেতারভাষণে বলেছিলেন, "কেবলমাত্র মতবাদের জোয়ারে ভেসে গেলে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। জার্মানি কিংবা ইতালির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, সেসব ওই দুটি দেশের লোকের চিন্তার বিষয়।" তিনি চেয়েছিলেন, ভারতীয়রা যেন 'স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য করেন।' "ত্রিশক্তির সঙ্গে বৈদেশিক ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা আমরা চাইব, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের নিজস্ব বিষয়ে আমি চাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, আমি কখনও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিতে কোনও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না।"

আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা বলতে গেলে তাঁর মতামত 'যখন [তিনি] দেশে ছিলাম তখন যা ছিল এখনও অবিকল তাই— এবং কেউ যেন ভুল করে মনে না করে বহির্বিষয়ক ক্ষেত্রে ত্রি-পাক্ষিক শক্তিসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ [ভারতের] অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের আধিপত্য, এমনকী তাদের মতাদর্শও গ্রহণ করা।' একবার ভারতকে স্বাধীন করার কাজ সম্পন্ন হলে, তিনি আবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন— ১৯৪০-এ জুন মাসে বিদায় নেবার সময়ে তিনি যেমন বলেছিলেন।

১৯৪২-এর বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মে মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজি যুদ্ধ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের লক্ষ্য এবং রণকৌশলের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। গান্ধীজি যেমন যেমন "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন আরম্ভ করার দিকে এসেছিলেন, নেতাজি তাঁকে অকুণ্ঠ এবং সাগ্রহ সমর্থন দিতে থাকেন। বিদ্রোহীদের প্রতি বেতারযোগে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়, অভ্যুত্থান কীভাবে চালিয়ে যেতে হবে, এবং তাকে কী করে অধিকতর কার্যকর করা হবে। ১৯২১ থেকে কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দরুন, সুভাষচন্দ্র যে ১৯৪২-এ দেশে দেশবাসীর সঙ্গে থাকতে পারলেন না, তাতে তিনি হতাশ বোধ করছিলেন। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, আবার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে তাঁর 'বিলম্ব হবে না।' ১৭ আগস্ট ১৯৪২ তিনি সঠিকভাবেই লিখে রাখেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগের ওপর ভিত্তি করেই কাজ করতে বাধ্য হল:

> "সারা পৃথিবী এখন দেখতে পাচ্ছে, সাধারণত যে মেষচর্মে ব্রিটেনের হিংস্র নেকড়েটি আবৃত থাকে, সেটি নগ্ন নির্লজ্জ পশুবলে ভারত শাসন করছে। গ্যাসের ঘন আবরণের আড়াল,

পুলিশ ব্যাটনের প্রহারে, বুলেটের নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজের মধ্যে, মৃত এবং মরণোন্মুখের ক্রুদ্ধ অগ্রাহ্যের মধ্যে, ভারতের আত্মা জিজ্ঞাসা করছে, 'স্বাধীনতা কোথায় গেল?' সারা পৃথিবীর সাত সাগরের সাত পারে ওই ক'টি শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওয়াশিংটন নিরুত্তর। একটু থেমে ভারতাত্মা আবার প্রশ্ন করছে— 'সেই অ্যাটলান্টীয় সনদ কোথায় গেল, যাতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রের নিশ্চিত আশ্বাস আছে?' এর বেলায় ডাউনিং স্ট্রিট এবং হোয়াইট হাউস একযোগে উত্তর দেয়, 'সে সনদ ভারতের জন্য নয়।' ''

কিন্তু তিনি সম্ভবত জানতেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১৯৪২-এর আন্দোলন সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এবং আঞ্চলিক অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তাই তিনি মুসলিম লিগের প্রগতিবাদী অংশকে, মজলিশ-ই আহরার, জমিয়ত-উল-উলমা, আজাদ মুসলিম লিগ, অকালি দলকে এবং সবশেষে বলা হলেও যাঁরা তুচ্ছ নন সেই বঙ্গদেশের কৃষকপ্রজা দলকে, ব্যাপক ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক মোর্চা গঠন করতে আহ্বান করেন। তা ছাড়া ভারতে যে অহিংস গেরিলা যুদ্ধ চলছিল তাতে কৃষক সমাজের গুরুত্বের ওপরও জোর দিলেন।

যুদ্ধের মধ্যেও নেতাজি স্বাধীন ভারতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করে যেতেন, সে-বিষয়ে লিখেও যেতেন। "স্বাধীন ভারত এবং তার সমস্যাবলী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "ভবিষ্যতের ভারত রাষ্ট্রের বিষয়ে যুক্তি-তর্কের পরোয়া না করে কোনও মতামত স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ভাবে ব্যক্ত করা উচিত হবে না।" তবে তিনি বলেছিলেন শুরুতে একটি 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার' থাকতে হবে, এবং প্রয়োজন হবে 'একটি সুগঠিত সুশৃঙ্খল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল।' রাষ্ট্র 'ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেবে।' নতুন শাসন সুস্থিত হলে, রাষ্ট্রযন্ত্র মসৃণভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে, শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অধিক দায়িত্ব দেওয়া হবে।' উপযুক্ত উপলক্ষ উপস্থিত হলে, যেমন হয়েছিল হামবুর্গে ১৯৪২-এর ১১ সেপ্টেম্বর, ইন্দো-জার্মান সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিন সুভাষচন্দ্র বসু শুধুমাত্র রাজনীতির কথা না বলে, কবিতা এবং দর্শনের গভীর সম্পর্কের কথা বলেন। তিনি কি আশ্রয় খুঁজতেন গ্যেটে, শপেনহাওয়ার, রুকার্ট, শ্লেগেল, ম্যাক্সমুলার, দ্যুসেন প্রমুখের মধ্যে— যাঁরা ছিলেন অত্যাচারী নাৎসি জার্মানি থেকে বহু দূরে?

১৯৪২-এর ১৫ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ভারতে সম্প্রচারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বেতারভাষণ দিয়েছিলেন। "আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি আমেরিকানদের একটি বৃহৎ অংশ ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজেদের সরকারের ওপর তাঁদের কোনও প্রভাব নেই। ভারত বিষয়ে আমেরিকার সরকারি নীতি ব্রিটেনের মতোই সাম্রাজ্যবাদী।" নভেম্বরের প্রথমে নেতাজি রোমে গেলেন কারণ সেখানে তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে নেতাজির বিমানযোগে এশিয়া যাত্রা বাতিল হয় কোনও যান্ত্রিক কারণে নয়তো তার কথা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়। সুভাষ এবং এমিলির কন্যা অনিতার জন্ম হয় ভিয়েনায় ১৯৪২-এর ২৯ নভেম্বর। স্ত্রী এবং সদ্যোজাত কন্যাকে দেখবার জন্য নেতাজি আবার একবার ডিসেম্বর মাসে ভিয়েনা যান। তাঁর এশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনাটি যদি বাস্তবে পরিণত হত, ব্যক্তিগত জীবনে এক আনন্দদায়ক ঘটনা থেকে এই বিপ্লবী বঞ্চিত হতেন।

"আমার দেশ আমাকে ডাকছে— আমার কর্তব্য আমাকে ডাকছে," সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৬-এর মার্চে লিখেছিলেন এমিলি শেঙ্কেলকে। "আমায় তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে,

যেতে হবে আমার প্রথম প্রেমিকা আমার দেশের কাছে।”[৫] এখন আবার তাই হল তবে এবার অনেক বেশি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের মধ্যে। তাঁর মেয়ের জন্মের ঠিক এক সপ্তাহ পরে, ১৯৪২-এর ৫ ডিসেম্বর ভন রিবেনট্রপকে তিনি লিখলেন, “আমার দেশের জন্য আমি অনেক বেশি কাজ করতে পারতাম, যদি ভারতের কাছাকাছি থাকতে পারতাম।” তারপর লিখলেন, “আমার বিশ্বাস যানবাহনের ব্যবস্থা করে জার্মান সরকারের পক্ষে আমাকে সুদূর প্রাচ্যে যাওয়ায় সাহায্য করা সম্ভব, বিমানযোগে, সাবমেরিনে, কিংবা জাহাজে। সেরকম যাত্রায় একটা বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু সে তো যে-কোনও রকম উদ্যোগেই থাকে। সেই বিপদ আমি সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় বরণ করব। আবার আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি, আমি জানি প্রচেষ্টা সফল হবে।”

জানুয়ারি ১৯৪৩-এর মাঝামাঝির মধ্যে ডুবোজাহাজে তাঁর এশিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। এমিলি ২০ জানুয়ারি বার্লিনে এলেন, তাঁদের শেষ ক'দিন এক সঙ্গে কাটানোর জন্য। ভ্রমণকালে প্রচারের জন্য তাঁর বেতার ভাষণ রেকর্ড করার ব্যবস্থা হল। একটি ভাষণ, যেটি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪৩-এর ১ মার্চ, ভাল করে রেকর্ড করা হয়নি, কেননা তার মধ্যে আগেকার একটি ভাষণের একটি দীর্ঘ অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আরেকটি ভাষণ ছিল অমৃতসরের ১৩ এপ্রিলের নৃশংস গণহত্যাকাণ্ডের স্মরণে এবং যুদ্ধের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি যাই হোক, সেটি প্রচার করা চলত।

নেতাজি বার্লিনে জনগণের সামনে প্রথম উপস্থিত হন ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৩-এ স্বাধীনতা দিবসের এক বৃহৎ উৎসবে। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার শপথ তখন পাঠ করে শোনানো হয়। ছয়শো অতিথির উপস্থিতিতে সেই অত্যন্ত বর্ণাঢ্য এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি এবং ইরাকের রাশিদ আলি। নেতাজি কালো শেরওয়ানি পরে লাল টিউলিপ এবং সাদা লাইলাক সজ্জিত সেই সভাকক্ষে এসে প্রবেশ করলেন এবং ভাষণ দিলেন জার্মান ভাষায়। তাঁর ভাষণের একটি ইংরেজি রেকর্ড একই সঙ্গে প্রচারিত হল ভারতে। নানা বিষয়ে পরিব্যাপ্ত সেই বক্তৃতায় দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করে তিনি বললেন:

> “আমাদের কাছে জীবন এক অন্তহীন তরঙ্গ। এ হল সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ। এ হল ‘লীলা’, নানা শক্তির চিরন্তন ক্রীড়া। নানা শক্তির পরস্পরের সঙ্গে ক্রীড়ার এই মহাজাগতিক প্রকাশের মধ্যে শুধু সূর্যকিরণই নেই, অন্ধকারও আছে। শুধু উত্থানই নেই, পতনও আছে। শুধু আনন্দ নেই, দুঃখও আছে। নিজেদের ওপর নিজেদের দৈবী সত্তার ওপর, যদি আমরা বিশ্বাস না হারাই— অন্ধকার, দুঃখ এবং অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সূর্যালোকের, আনন্দের প্রগতির দিকে।”

“মেজদা” শরৎচন্দ্র বসুর জন্য একটি পত্র তাঁর স্ত্রী এমিলি শেঙ্কলের হাতে দিয়ে ১৯৪৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বস্ত সহায়ক আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে কিয়েল বন্দরে সাবমেরিনে রওনা হলেন সেই সমুদ্রযাত্রায়, তাঁর, তাঁর দেশের নিয়তির পরিপূর্ণতার অভিমুখে।

সুগত বসু

---

৫. এমিলি শেঙ্কলকে সুভাষচন্দ্র বোস ৫ মার্চ ১৯৩৬ (“The Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose” Sisir K. Bose এবং Sugata Bose সম্পাদিত “Calcutta Netaji Research Bureau, and Delhi Oxford University Press 1997, p. 160)

সূচি

লেখা ও বক্তৃতা

১. ভবিষ্যতের তারিখে লেখা একটি পত্র
হরিবিষ্ণু কামাথের প্রতি ৩

২. ফরওয়ার্ড ব্লক: তার যৌক্তিকতা, কাবুল তত্ত্ব, ২২ মার্চ ১৯৪১ ৪

৩. ভারতীয় বিপ্লবের পরিকল্পনা: একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২০

৪. জার্মান গভর্নমেন্টকে প্রেরিত গোপন স্মারকপত্র: বার্লিন, ৯ এপ্রিল ১৯৪১ ২৪

৫. জার্মান গভর্নমেন্টের প্রতি অতিরিক্ত স্মারকলিপি: বার্লিন, ৩ মে ১৯৪১ ৩৩

৬. ভারতের কমরেডদের উদ্দেশে গোপন বার্তা: মে ১৯৪১ ৩৬

৭. স্বাধীন ভারতের ঘোষণার খসড়া: "Mazzota", মে ১৯৪১ ৩৯

৮. এক নিরানন্দ পরিস্থিতি: জার্মান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের Dr. Woermann-এর প্রতি পত্র, ৫ জুলাই ১৯৪১ ৪০

৯. রুশ-জার্মান যুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ১৭ জুলাই ১৯৪১-এর জার্মান বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ ৪১

১০. এক শত্রুর পক্ষ থেকে প্রস্তাব, জার্মানির বিদেশমন্ত্রীকে প্রেরিত পত্র: ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop), ১৫ আগস্ট ১৯৪১ ৪৩

১১. আমাকে O. Mazzotta নামে সম্বোধন করবেন: নাওমি ভেটার-কে লেখা পত্র, শরৎকাল ১৯৪১ ৪৫

১২. সিঙ্গাপুরের পতন: প্রথম বেতার ভাষণ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ ৪৬

১৩. এই সুযোগ বৃথা হারাবেন না: বেতার ভাষণ, ১১ মার্চ ১৯৪২ ৪৮

১৪. ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা: বেতার প্রচার, ১৩ মার্চ ১৯৪২ ৪৯

১৫. নিজের দেশের সীমানার বাইরে ভারতের কোনও শত্রু নেই: বেতার প্রচার, ১৯ মার্চ ১৯৪২ ৫২

১৬. আমার মৃত্যু সম্ভবত আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত: বেতার প্রচার, ২৫ মার্চ ১৯৪২ ৫৫

১৭. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠানো খোলা চিঠি: বেতারে প্রচারিত, ৩১ মার্চ ১৯৪২ ৫৮

১৮. ভারত ভারতীয়দের জন্য: বেতার ভাষণ, ৬ এপ্রিল ১৯৪২ ৬১

১৯. আপসের জন্য হাতড়ে বেড়ানো আর যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার একই কথা: বেতার ভাষণ, ১৩ এপ্রিল ১৯৪২ ৬৩

২০. আমার আনুগত্য: বেতার প্রচার, ১ মে ১৯৪২ ৬৭

২১. আমার প্রাচ্যে থাকা উচিত: জার্মান বিদেশমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop)-এর প্রতি পত্র, ২২ মে ১৯৪২ ৭১

২২. জার্মানির ফ্যুরের-এর মুখোমুখি: হিটলার এবং বসু-র সাক্ষাৎকার বিবরণী, ২৯ মে ১৯৪২ ৭৩

২৩. বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহকে প্রদত্ত বিবৃতি: জুন ১৯৪২ ৭৮

২৪. আজাদ হিন্দ ফৌজের শপথ: ইউরোপে ইন্ডিয়ান লিজন-এর প্রতি ভাষণ, জুন ১১৪২, বেতারযোগে প্রচারিত ৮১

২৫. সারা বিশ্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন: ব্যাংককে সম্মেলনের উদ্দেশে বার্তা, ১৫ জুন ১৯৪২ ৮৩

২৬. অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করুন: বেতার প্রচার, ১৭ জুন ১৯৪২ ৮৫

২৭. গান্ধীকে সম্পূর্ণ সমর্থন: আগস্টের প্রথম দিক, ১৯৪২ ৮৯

২৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বেতার প্রচার, ১৭ আগস্ট ১৯৪২ ৯৭

২৯. ভারতের মহারণে যোগ দিন: বেতার প্রচার, ৩১ আগস্ট ১০৩

৩০. স্বাধীন ভারত ও তার নানা সমস্যা: আগস্ট ১৯৪২ ১০৯

৩১. ভারত ও জার্মানি: ভাষণ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ১১৬

৩২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ভারত: বেতার প্রচার, ১৫ অক্টোবর ১৯৪২ ১২০

৩৩. ভারতের নিকটে কোথাও: জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop)-এর প্রতি পত্র, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪২ ১২৭

৩৪. ইউরোপের পরিস্থিতি: বেতার প্রচার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ ১২৯

৩৫. দেশপ্রেমী ভারতীয়দের কর্তব্য: বেতারে প্রচার, ১ জানুয়ারি ১৯৪৩ ১৩৪

৩৬. স্বাধীনতা দিবস: ভাষণ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৩ ১৩৬

৩৭. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাঁওতা এবং হামবড়াই করপোরেশন: ১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষভাগে/ ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে প্রদত্ত ভাষণ ১৪৪

৩৮. অমৃতসরের রক্তস্নানের চব্বিশতম বার্ষিকী: ভাষণ, জানুয়ারির শেষভাগ—ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভ ১৯৪৩ ১৪৯

৩৯. বিপদের পথে: শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি পত্র, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ ১৫২

নির্দেশিকা ১৫৩

লেখা ও বক্তৃতা

১৯৪১-১৯৪৩

১

ভবিষ্যতের তারিখে লেখা একটি পত্র[১]

হরিবিষ্ণু কামাথের প্রতি

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা ১৮.১.৪১

প্রিয় কামাথ,

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তোমার চিঠি পেয়ে এবং তুমি ভাল আছ ও তোমার মনোবল অক্ষুণ্ণ আছে জেনে অতিশয় আনন্দিত হলাম।

মুক্তিলাভের পর আমার স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু উন্নতির গতি ধীর, কারণ আমার জীবনশক্তি হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। কিছু সময় লাগবে।

ওখানে তোমার সঙ্গে কারা আছেন আমি জানি না, যদি কেউ থাকেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানিও।

আমি অতি শীঘ্র জেলে ফিরে যাব। কারণ আমার বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা জারি আছে।

ভালবাসা, আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা নিও।

তোমার
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত এইচ. ভি. কামাথ

---

১. ১৬-১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে তাঁর পলায়নের পর ডাকে দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ভবিষ্যতের তারিখ দিয়ে লেখা কয়েকটি পত্র রেখে যান। ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ রাত্রি ১-৩৫ মিনিটে তিনি ৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতায় তাঁর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যান। তাঁর ভাইপো শিশিরকুমার বসু তাঁকে গাড়ি চালিয়ে বিহারে গোমো রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেন। তিনি তখনও বাড়িতে আছেন— ব্রিটিশদের এই ভুল ধারণা দেওয়ার জন্য কয়েকটি চিঠি রাজনৈতিক সহযোগী কামাথকে লেখা, যিনি তখন জেলে ছিলেন।

২

ফরওয়ার্ড ব্লক: তার যৌক্তিকতা

কাবুল তত্ত্ব, ২২ মার্চ ১৯৪১[১]

একটি আন্দোলনের বিকাশ একটি গাছের মতো। আন্দোলন ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, বড় হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটি পর্বে তার নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা গজায়। যখন আর নতুন নতুন শাখা গজিয়ে উঠছে না, ধরে নিতে হবে আন্দোলনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

প্রত্যেকটি আন্দোলন যেমন, যে-মাটিতে তার জন্ম সেখান থেকে খাদ্য আহরণ করে, তেমনি আবার বাইরে থেকেও পুষ্টি লাভ করে। বাতাস থেকে, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি থেকে। একটি জীবন্ত আন্দোলনে অভ্যন্তর থেকে খাদ্য এবং বাইরে থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি, দুটোই প্রয়োজন।

যখন কোনও আন্দোলনের মূল প্রবাহটি গতিহীন হয়ে পড়ে, অথচ সমগ্রভাবে সেই আন্দোলনে তখনও প্রাণশক্তি থাকে, অনিবার্যভাবে একটি বামপন্থী শাখার উদ্রেক হয়। বামশাখার প্রধান কাজ, যখন প্রগতি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয় তাকে পুনরুজ্জীবিত করা। বামশাখার অভ্যুদয়ের পর তার সঙ্গে প্রধান প্রবাহের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যেটি দক্ষিণপন্থী শাখা হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্ব একটি ক্ষণস্থায়ী পর্ব, এবং তার মধ্য দিয়ে একটি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা যায়, যার দ্বারা দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে। সমাধান আসে কোনও প্রকার বোঝাপড়া কিংবা সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা, যার ফলে বামশাখা সমগ্র আন্দোলনের ওপর আধিপত্য লাভ করে। এই ভাবে, বামশাখা, কালক্রমে আন্দোলনের প্রধান প্রবাহের রূপ ধারণ করে।

বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে দর্শনের ভাষায় বলা যায়, তত্ত্বই বিপরীত তত্ত্বের জন্ম দেয় এবং এই দুইটির সংঘর্ষের নিরসন হয় সংশ্লেষের মধ্যে, এই সংশ্লেষই বিবর্তনের পরবর্তী পর্বের তত্ত্ব হয়ে ওঠে।

বিবর্তনের এই প্রক্রিয়া, যাকে বলা হয়েছে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, ঠিকভাবে তাকে বোঝালে বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যা ঘটে চলেছে, তাকে, সেটি নতুন অর্থ ও তাৎপর্য দান করে। এখানে আমরা গান্ধী আন্দোলনকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করব।

এইখানে এসে আমাদের লক্ষ করতে হবে যে একটি আন্দোলনের অভ্যন্তরে সংঘাত যে-কোনও পরিস্থিতিতে অস্বাস্থ্যকর অথবা অবাঞ্ছিত মনে করলে ভুল করা হবে। বরং বলতে

---

১. এই তত্ত্বটি ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র বসু রচনা করেছিলেন। মূল পাণ্ডুলিপিটি তিনি ভগতরাম তলওয়ারের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বসু ও শিশিরকুমার বসুর কাছে পাঠান কলকাতায় ৩১ মার্চ, ১৯৪১-এ। এই তত্ত্বটিকে অনেকেই 'কাবুল-তত্ত্ব' বলে জানেন।

হয়, ইতিহাসের নিজস্ব কার্যকারণ পরম্পরা থেকে যে সংঘর্ষের উদ্ভব হয়, প্রগতির জন্য তা অপরিহার্য, তা সে চিন্তার ক্ষেত্রেই হোক আর কাজের ক্ষেত্রেই হোক।

কোনও আন্দোলনের, কিংবা তার বিশেষ একটি পর্ব কখন তার গতি হারাবে, স্থাণু হয়ে পড়বে, তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যত দিন আন্দোলন বাইরে থেকে কিছু আত্মস্থ করতে সক্ষম, এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম, অবক্ষয় আরম্ভ হতে পারে না।

এখানে গান্ধী আন্দোলনের আলোচনায় আসি। ১৯১৯-এর মধ্যে, বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর, ভারতে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল, এবং তার সঙ্গে এল নতুন সমস্যা। স্বীকৃত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারল না, কারণ তার এগিয়ে চলার শক্তি সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, এবং একটি বামশাখা স্পষ্টতই জরুরি হয়ে পড়ল, যদি কংগ্রেস এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়তে, মৃত্যুবরণ করতে না চায়। এই রকম সময়ে একটি বামশাখা দেখা দিল গান্ধী আন্দোলনের রূপে। কিছুদিন সংঘাত চলল, এবং প্রবীণ নেতারা বহিষ্কৃত হলেন কিংবা স্বেচ্ছায় চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত একটি সংশ্লেষ ঘটল। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নীতিসমূহ গ্রহণ করল এবং বামশাখা হল স্বীকৃত কংগ্রেস।

১৯২০ সালে গান্ধীবাদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিকার করল এবং দুই দশক তাদের অধিকার বজায় থাকল। তা সম্ভব হল শুধু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, অন্য চিন্তা, অন্য নীতি গ্রহণ করবার ক্ষমতার জন্যও, শেষোক্ত ক্ষমতা যদি তাঁর না থাকত, অনেক দিন আগেই কংগ্রেসের ওপর গান্ধীবাদের আধিপত্যের অবসান হত। কংগ্রেসের বিশ বৎসরের আধিপত্যের সময়ে, যখনই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, গান্ধী আন্দোলন তাদের বিভিন্ন ধারণা ও নীতি নিজেরাই গ্রহণ করে তাদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। কেবলমাত্র সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে তারা অক্ষম হচ্ছে। যেমন, ১৯২৩ সালে যখন স্বরাজ্য পার্টির জন্ম হল, তার ফলে উদ্ভূত সংঘাত কিছুদিন চলল এবং ১৯২৫-এ কানপুর কংগ্রেসে স্বরাজপন্থীদের নীতি আইন পরিষদের মধ্যে অসহযোগিতাকে নিয়ে যাওয়া গান্ধীবাদীরা গ্রহণ করলেন, এবং তার ফলে সমগ্রভাবে কংগ্রেসও গ্রহণ করল।

আবার, ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রশ্নে ইনডিপেন্ডেন্স লিগ গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলল। মহাত্মা গান্ধী তখন ডমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষ সমর্থন করলেন এবং স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাকে পরাস্ত করলেন। কিন্তু এক বছর পরে, লাহোর কংগ্রেসে তিনি নিজেই, এরপর থেকে স্বাধীনতাই হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য, এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করলেন।

এইভাবে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়ার দ্বারা গান্ধী আন্দোলন নিজের প্রগতিবাদী চরিত্র বজায় রাখতে এবং কোনও বড় বামপন্থী শক্তির গড়ে ওঠা নিবারণ করতে সক্ষম হল। ১৯৩১ এর মার্চে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর একটু সাময়িক ধাক্কা এসেছিল, কিন্তু ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে তিনি হারানো জমি পুনরুদ্ধার করলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং ১৯৩৩-এর মে মাসে তার পরিত্যক্ত হওয়া একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করল, যার ফলে এল আবার এক বিদ্রোহ, এবার দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে। আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ, গান্ধীবাদীদের একটি বড় অংশ চাইলেন সংসদীয় পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন, যা ১৯৩০ সালে, গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভের আগে

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে তাঁরা বর্জন করেছিলেন। এই দাবির কাছে ১৯৩৪ সালে গান্ধীজি আত্মসমর্পণ করলেন, কারণ তাঁর কাছে কংগ্রেসের জন্য অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না, এই ঘটনায় বোঝা গেল গান্ধী আন্দোলন একটা বদ্ধ জলাশয়ের রূপ ধারণ করেছে, এবং এই অবস্থা আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মাধ্যমে, যার উদ্বোধন হল ১৯৩৪ সালে সংসদবাদের দিকে কংগ্রেসের ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে।

গান্ধী আন্দোলন একদিনে তার স্থিতিস্থাপকতা ও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের এবং অন্য বামপন্থীদের প্রতি গান্ধীবাদীদের মনোভাব ১৯৩৪ সালে ও তার পরে মোটের ওপর অনুকূলই ছিল। বস্তুত ১৯৩৬, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান দিতে চাওয়া হয়েছিল (১৯৩৮ সালে তাঁরা প্রস্তাব গ্রহণ করেননি)। জানুয়ারি ১৯৩৮-এ গান্ধীবাদীরা, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর কথায়, কংগ্রেসের সভাপতি পদে আমার প্রার্থী হওয়া সমর্থন করেছিলেন। এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ হরিপুরা কংগ্রেসে, আমার যখন সেই বছরের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করার কথা, গান্ধীজি পরিষ্কার তাঁর এই মত জানালেন যে ওয়ার্কিং কমিটিতে সোশ্যালিস্টদের থাকাতে কোনও আপত্তি করা উচিত নয়।

একটা পরিষ্কার, এবং এখন পর্যন্ত যা দুর্বোধ্যই থেকে গেছে, স্পষ্ট পরিবর্তন এল মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ দিল্লিতে অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির একটা বৈঠকের পর। একটা বিতর্কিত প্রশ্নে বামপন্থীরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখনই গান্ধীজিকে বলতে শোনা গেল, কংগ্রেসের কাজকর্ম চালনার ব্যাপারে বামপন্থীদের সঙ্গে কোনও রকম আপস করা চলবে না। কয়েক মাস পরে জানুয়ারি ১৯৩৯-এ তিনি সেই একই মনোভাবের প্রমাণ দিয়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করলেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর পর থেকে গান্ধীবাদের একটা প্রবণতা দেখা গেছে ক্রমশ অধিকতর গতিহীন এবং পশ্চাৎমুখী হওয়ার। ওই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরা কংগ্রেসে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং আগামী যুদ্ধের প্রশ্নে। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রস্তাবটি যদিও ছিল আপসহীন বিরোধিতার, সে বছর, সারা বছর ধরে প্রবল গুজব শোনা যেতে লাগল, লোকচক্ষুর আড়ালে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আপসের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়ে আমার আপসহীন মনোভাব ছিল আমার কংগ্রেস সভাপতির পদ পাওয়ার বিরুদ্ধে, গান্ধীবাদের অভিযোগপত্রের প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি ছিল, গান্ধীবাদীরা যেটাকে মনে করতেন বামপন্থীদের প্রতি আমার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব। তৃতীয় অভিযোগ, আমি জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদের উদ্বোধন করেছি। তাঁদের মতে সেই পরিষদ বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহিত করবে এবং গ্রামীণ শিল্পকে তার দ্বারা বলি দেওয়া হবে, গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচিতে যে গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার বিরুদ্ধে তার পরের অভিযোগ ছিল আমি চাই, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যেন অবিলম্বে আরম্ভ করা হয়, ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়ার পর।

সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর মধ্যে যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝলেন, গান্ধীবাদী এবং বামপন্থীদের মধ্যে সম্পর্ক আর হৃদ্যতাপূর্ণ থাকবে না। আগেই যা বলেছি তা থেকে বোঝা যায়, গান্ধীজি নিজেই মনোভাবের এই পরিবর্তনের প্রকাশে কোনও রাখ-ঢাক করেননি। উপরন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা ভিতরকার খবর রাখেন তাঁদের কাছে মিউনিক চুক্তির সময়ে পরিষ্কার

হয়ে গিয়েছিল যে ভবিষ্যতে যদি ভারতের ওপর যুদ্ধকালীন সংকট এসে পড়ে, গান্ধীবাদী এবং বামপন্থীদের মধ্যে, খোলাখুলি একটা বিভেদ অনিবার্য হয়ে পড়বে। একথা ঠিক, ১৯২৭ (মাদ্রাজ কংগ্রেস) থেকে ১৯৩৮ কংগ্রেসের যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি কংগ্রেসের একের পর এক বার্ষিক অধিবেশনে পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হয় এবং সাধারণ অবস্থায় যুদ্ধ বিষয়ে কারও কোনও ভিন্নমত থাকবে বলে আশা করতে পারবেন না, বিভেদের কথা তো ছেড়েই দিন। তা হলেও মিউনিক চুক্তির আগেকার আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যেসব আলাপ-আলোচনা চলছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকেনি যে তার আগেকার বিভিন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে যুদ্ধ সংক্রান্ত গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের তেমন কোনও সাগ্রহ সমর্থন ছিল না, এবং প্রয়োজন হলে, কিংবা সুবিধা হলে, সে-সব প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে যেতে তাঁরা ইতস্তত করবেন না। এখন, যে দুটি বিষয়ে বামপন্থীরা নিরতিশয় আগ্রহী ছিলেন, এবং যা নিয়ে তাঁরা কোনও আপস বরদাস্ত করলেন না, সে দুটি হল যুক্তরাষ্ট্র এবং আসন্ন যুদ্ধ। তার ফলে, ওই দুটি বিষয়ে গান্ধীবাদীদের দোলাচলচিত্ততা ও আপসের মনোভাব সূচিত করল যে আগামী দিনে তাদের এবং বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ আসবে।

মিউনিক চুক্তির ফলে যদিও তখনকার মতো যুদ্ধ এড়ানো গেল, আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনুসারীরা মনে না করে পারলেন না, যে তা সত্ত্বেও যুদ্ধ অনিবার্য এবং আসন্ন। তার পরে আমার মনে এই বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করল যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুন ভারতীয়দের দিয়ে জোর করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গিলিয়ে নেওয়ার চিন্তা ব্রিটিশেরা ত্যাগ করবেন। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন যেহেতু তখন আর তত প্রাসঙ্গিক রইল না, নিজেদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হল। যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে বৃহদাকারের যুদ্ধ যেহেতু আসন্ন বলে মনে হল না, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ তারা কোন পথে চালিয়ে যাবে?

নভেম্বর ১৯৩৮-এ উত্তর ভারত সফর করবার সময়ে আমি সে সমস্যার একটি সমাধানের প্রস্তাব করলাম। আমি বোঝাতে চাইলাম, সরকার কবে ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু, অন্তত এখনকার মতো নিষ্প্রাণ এবং আমাদের সামনে, অদূর ভবিষ্যতে, যখন যুদ্ধ হতে চলেছে, সময় এসেছে কংগ্রেসেরই উদ্যোগ গ্রহণের, তার সঠিক পন্থা হবে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি চরমপত্র পাঠানো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা দাবি করা এবং জাতীয় সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে আরম্ভ করা। এই চিন্তা আমরা নভেম্বর থেকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করলাম, এবং মার্চ ১৯৩৯-এ ত্রিপুরী কংগ্রেসে একটি প্রস্তাবের আকারে এটিকে স্থাপন করলাম— কিন্তু গান্ধীবাদীদের পরামর্শে প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে গেল। অন্য কথা ছাড়াও প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল, চরমপত্র প্রেরণের পরে ছ' মাস সময় দেওয়া হবে, যার মধ্যে উত্তর দিতে হবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে, যখন ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধল, তখন এমনকী গান্ধীবাদীরাও আমাদের প্রস্তাবের বিচক্ষণতা স্বীকার করলেন, যাঁরা ত্রিপুরীতে আমাদের অত বিরোধিতা করেছিলেন।

ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার অল্প দিনের মধ্যেই, মহাত্মা গান্ধী, যিনি তখন ছিলেন কংগ্রেসের অলিখিত একনায়ক, একটি প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ব্রিটেনের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব করলেন। কংগ্রেস যে সমস্ত প্রস্তাব এগারো বছর ধরে বারে

বারে গ্রহণ করে এসেছে সুবিধাজনকভাবে তার সবই তিনি ভুলে গেলেন। (যুদ্ধ বাধবার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব সরকার মুলতুবি করে দিল)

১৯৩৮-এর পর থেকে যে-সব বিষয়ে বামপন্থীরা গান্ধীবাদীদের সঙ্গে প্রবল বিরোধিতায় আছেন এবং যা নিয়ে কোনও আপস সম্ভব হয়নি, তা হল স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম আবার আরম্ভ করা, এবং ভারতবাসীদের জন্য সঠিক যুদ্ধনীতি। লক্ষ করবার বিষয় নভেম্বর ১৯৪০ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে এবং একান্তে একভাবে ঘোষণা করে এসেছিলেন যে, কোনও সত্যাগ্রহ কিংবা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রশ্নই ওঠে না এবং সেরকম আন্দোলন যে কেউ আরম্ভ করুন, তিনি নিজের দেশের ক্ষতি করবেন। এ-কথা সত্য, ১৯৪০-এর নভেম্বরে তাঁর ছত্রছায়ায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। কিন্তু গান্ধীজি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন এবং আমরাও ভাল করেই জানি, সেটা স্বাধীনতা লাভের জন্য গণ-আন্দোলন নয়। এবং ভারতে ও ইংল্যান্ডে দায়িত্বশীল ব্রিটিশ অফিসারেরা যা ইতিমধ্যেই বলেছেন যে, এই আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ সরকারকে তেমন কিছু বিব্রত করতে পারেনি। গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে জিতুক, নিজের এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহাত্মা গান্ধী সরকারের বিব্রত হওয়ার কারণ হতে পারে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থেকেছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য গণ-আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই তা হতে পারত।

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ মহাত্মা গান্ধী চাইলেন যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতা, কিন্তু নভেম্বর ১৯৪০-এ তিনি দাবি করলেন যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা। ১৯৩৮ থেকে তিনি একভাবে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভের বিরোধিতা করে এসেছেন, কিন্তু নভেম্বর ১৯৪০-এ তিনি সেই মত পরিবর্তন করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এ প্রশ্ন কি করা চলে না, এই পরিবর্তন, যতই তা ক্ষুদ্র হোক, তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে? এবং এ-কথা বলা কি ভুল হবে যে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে বামপন্থীদের চাপের কারণে ঘটল?

গান্ধীজি যে এই বয়সেও, অনেক দিন ধরে যে মতের সপক্ষে কথা বলে এসেছেন তার পরিবর্তন করতে পারলেন, যদিও সে পরিবর্তন করেছেন চাপে পড়ে, এবং তাও আংশিকভাবে, এটা কি তাঁর নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার, গতিশীলতার প্রমাণ নয়? তা হলেও এটা সময়ের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয় আমরা এখন বেঁচে আছি ইতিহাসের 'ব্লিজক্রিগ' কালে অর্থাৎ অতিদ্রুত পরিবর্তনের সময়ে এবং সময়ের সঙ্গে যদি আমরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে না যাই, আমরা তলিয়ে যাব। এতদিন পর্যন্ত নিজের কাজ দিয়ে গান্ধীজি প্রমাণ করতে পারেননি যে তিনি কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন, নিজের জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং এতে আমাদের ধারণারই সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, গান্ধী আন্দোলন স্থাণু এবং গতিহীন হয়ে পড়ছে।

নতুন, প্রথাবিরোধী চিন্তা সম্পর্কে যে কঠোর, আপসহীন মনোভাব গান্ধীবাদীদের মধ্যে ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং তাঁদের গতিশীল এবং বিপ্লবী মনোভাবাপন্নদের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার জন্য ক্রমবর্ধমান ইচ্ছা শুধু এইটাই প্রমাণ করে না যে তাঁরা তাঁদের গতিশক্তি এবং পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁরা একটা দূষিত চক্রের মধ্যে পড়েছেন যার ফলে অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণ স্থাণু হয়ে পড়েছেন। যেসব অরাজনৈতিক সংগঠন গান্ধীজি স্থাপন করেছেন গান্ধীবাদীদের জন্য (যেমন অল ইন্ডিয়া স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশন, গান্ধী সেবা সংঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ, অল ইন্ডিয়া ভিলেজ ইন্ডাসট্রিস অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দু প্রচার সমিতি প্রভৃতি), ভবিষ্যতে সেগুলি

শুধু অ-রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করে(ইতিমধ্যেই তারা যা করেছে) গান্ধী আন্দোলনের গতিশীলতাকেই খর্ব করবে। এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিকতর পরিমাণে, শান্তিপূর্ণ সংসদীয় জীবন এবং মন্ত্রিত্ব আগেও যেমন ছিল, তেমনি এখন থাকবে এবং গান্ধীবাদের রাজনৈতিক কবরে পরিণত হবে।

যা-কিছু বৈপ্লবিক উদ্দীপনা গান্ধী আন্দোলনের ছিল সেটুকুও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে আর কিছুতেই ততটা নয়, যতটা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, এই একটি পদক্ষেপের প্রভাবে বহু সংখ্যক কংগ্রেসি নিশ্চিতভাবে বিপ্লবের কন্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে সংবিধানবাদের কুসুমাস্তীর্ণ পথে প্রবেশ করেছেন। প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং নয়া-সংবিধান ১৯৩৮ সালে বিপজ্জনকভাবে কংগ্রেসের ভিতরে মাথা তোলে। তারপর থেকে বামপন্থীদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেসের নিজের সৃষ্ট এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করা। কী করে সংবিধানবাদের দিকে এই সরে যাওয়া বন্ধ করা যায়, নয়া সংবিধানবাদী মনোভাবের বদলে নতুন করে বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি করা যায়, যুদ্ধকালীন সংকটের মোকাবিলা সাহসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে করা যায়, কংগ্রেসকে আবার কী করে আপসহীন জাতীয় সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনা যায়, এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার আধিপত্য কী করে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ১৯৩৮-এর পর থেকে এই সবই হয়েছে বামপন্থীদের প্রধান সমস্যা।

গান্ধীবাদ আজ শুধু সংবিধানবাদের নয়, কর্তৃত্ববাদেরও কবলে পড়েছে। কিছু পরিমাণ কর্তৃত্ববাদ একটি সংগ্রামী সংগঠনের মধ্যে চলতে পারে, এবং তা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আজকের দিনে যে মাত্রাতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণতা দেখা যাচ্ছে, তার উৎপত্তি সেই একই কারণ থেকে, যেখান থেকে এসেছে সংবিধানবাদ। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর থেকে গান্ধীবাদীরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন এবং তাঁরা চাইছেন ভবিষ্যতে শুধুমাত্র তাঁরাই যেন সেই একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেন। সম্প্রতি কংগ্রেসের মধ্যে যা চলেছে তা হল "ক্ষমতার রাজনীতি", যদিও সে ক্ষমতা মেকি। এই ক্ষমতায় রাজনীতির উৎস হল ওয়ার্ধা, এই ক্ষমতার রাজনীতির লক্ষ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমস্ত বিরোধীদের দমিয়ে রাখা, যাতে গান্ধীবাদীরা চিরকাল আরামে সেই ক্ষমতা ভোগ করে চলেন। কিন্তু এই খেলা সফল হবে না। প্রকৃত ক্ষমতা এখনও আসেনি এবং সে ক্ষমতা কখনই আসবে না, আমরা যদি সংবিধানবাদের সহজ রাস্তা ধরেই চলি। গান্ধীবাদীরা অবশ্যই কংগ্রেস থেকে সমস্ত ভিন্নমতাবলম্বীদের বের করে দিতে পারবেন, যাতে কংগ্রেসের ওপর তাঁদের একচ্ছত্র অধিকার সুনিশ্চিত থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারবেন। এবং প্রকৃত ক্ষমতা ছাড়া ক্ষমতার রাজনীতি সম্ভব নয়। কাজেই আমরা এখন যা দেখছি তা হল মেকি "ক্ষমতার রাজনীতি"।

গান্ধীবাদীরা যদি নিজেদের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা পেতে চান, কিংবা কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণ করেন, তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও আপত্তি থাকত না, যদি তাঁরা একটি বৈপ্লবিক শক্তি হতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, গান্ধীবাদ এখন আর বৈপ্লবিক নয়, তাঁরা জাতিকে তার লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারবেন, তার কোনও আশা নেই। তার ফলে আমাদের গান্ধীবাদী বন্ধুরা যত তাঁদের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবেন, তত তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে গতিহীনতা নিয়ে আসবেন। শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা মুক্তহস্ত হলে কংগ্রেস এখনকার চেয়ে বেশি সমভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তার ফলে দলের বাইরে তার শত্রুর সংখ্যা

বৃদ্ধি পাবে, এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের গণভিত্তির ওপর আঘাত আসবে, এবং সাধারণভাবে দেশের ওপর কংগ্রেসের যে প্রভাব তার ক্ষতি হবে।

গান্ধীবাদীরা যে নিজেদের শক্তি ও সংহতি বাড়িয়ে তুলতে চাইছেন এটা কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এ জিনিস অলক্ষ্যে, অনেক দিন ধরে ধীর গতিতে চলেছে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে সেটা আরও জোরদার হওয়া পর্যন্ত। এই বিপদ যখন চোখে পড়ল এবং বামপন্থীরা আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত হতে আরম্ভ করলেন, গান্ধীবাদীদের মহলে একটা হইচই শুরু হয়ে গেল। তাঁদের চোখে, তাঁদের নিজেদের, অর্থাৎ দক্ষিণপন্থীদের সংহতিবৃদ্ধি সঠিক কাজ, স্বাভাবিক, কিন্তু বামসংহতি সাধন একটা অপরাধ।

যে দিন থেকে গান্ধীবাদ গতিশক্তি হারাতে আরম্ভ করেছে, এবং তার বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ বামপন্থী শক্তি জন্মলাভ করেছে, গান্ধীবাদীরা হয়েছেন দক্ষিণপন্থী এবং গান্ধীবাদী সংহতি হয়ে উঠেছে দক্ষিণপন্থী সংহতি।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে, দক্ষিণপন্থী সংহতি হল thesis, যার বিপরীত একটি অবশ্যম্ভাবী anti-thesis বামপন্থী সংহতির। এই anti-thesis, এবং যে সংঘাত তার পরে আসে এছাড়া আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। যাঁরা প্রগতিতে বিশ্বাস করেন ও প্রগতি চান, তাদের সকলকেই এই বামসংহতিসাধনের কাজে হাত লাগাতে হবে, এবং তার ফলে যে সংঘাত আসবে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বামপন্থী সংহতি সাধনের জন্য মে ১৯৩৯-এ ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হয়, অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কলকাতায় ঐতিহাসিক অধিবেশনের কিছু দিনের মধ্যেই, যে অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আমি আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করি।

বামপন্থী সংহতি সাধন নিম্নলিখিত পদ্ধতির যে কোনও একটি দ্বারা হতে পারত।

(১) একটি দল সংগঠিত করে এবং সেই দলের মধ্যে বামপন্থী সকলকে একত্রে নিয়ে এসে। তবে, এ সম্ভব হল না কারণ কয়েকটি দল, যারা বামপন্থী বলে দাবি করে, আগে থেকেই ছিল, এবং তারা একটি দলের মধ্যে নিজেদের লুপ্ত করে দিতে প্রস্তুত ছিল না।

(২) একটি নতুন ব্লক সংগঠিত করে যাতে সব বামপন্থীরা এবং বর্তমানের সমস্ত বামপন্থী দল যোগ দেবে, চাইলে সব দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে।

এইটাই ছিল প্রতিষ্ঠার সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগ। সে দল তখনকার বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করতে চায়নি। তাদের ক্ষতিও করতে চায়নি। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাব যদি গৃহীত হত এবং সমস্ত বামপন্থী দল তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে, ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যোগ দিত, বাম সংহতি সহজে এবং দ্রুত সাধিত হত এবং দক্ষিণপন্থীদের সামনে একটি শক্তিশালী বামপন্থী প্রতিপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াত। কিন্তু বামপন্থীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেটাও সম্ভব হল না, কারণ বর্তমান বামপন্থী দলগুলির মধ্যে কয়েকটি তাদের সদস্যদের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিতে নিষেধ করে দিল। কোনও দুর্বোধ্য কারণে সেই সব দল তা করল তা নিয়ে এখানে আলোচনার দরকার নেই।

৩) উপরোক্ত কারণে আবার নতুন করে বাম সংহতির জন্য চেষ্টা করা হল এইভাবে, বর্তমানের বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে ঠিক করল তারা একটি নতুন কমিটি তৈরি করবে। যার নাম হবে লেফ্ট-কনসোলিডেশন কমিটি। সমিতিটি কাজ করবে সমগ্র বামপন্থীদের হয়ে, কিন্তু একমাত্র সমিতির সকলের মধ্যে মতৈক্য স্থাপিত হলে।

সমিতিটি গঠিত হয়েছিল বোম্বাইয়ে ১৯৩৯-এর জুন মাসে, এবং তার ফল হল তৎক্ষণাৎ এবং চমকপ্রদ। সেইসময়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক চলছিল সেখানে সর্বপ্রথম বামপন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত ফ্রন্ট হিসাবে উপস্থিত হল। সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হলেও বামপন্থীরা সেখানে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে এমন কয়েকটি সংশোধন রোধ করতে সক্ষম হলেন, যেগুলোর বিষয়ে দক্ষিণপন্থীরা অত্যন্ত আগ্রহী বলে আমাদের জানা ছিল। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সেই অধিবেশন ছিল বামপন্থীদের নৈতিক জয়। এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হল বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে বলেই তাতে ইঙ্গিত ছিল।

কিন্তু ৯ জুলাই ১৯৩৯-এ বামপন্থী সংহতি সমিতির ওপর প্রথম আঘাত এসে পড়ল এবং সে আঘাত এল এম. এন. রায়ের কাছ থেকে। কমিটি মনস্থ করেছিল, ৯ জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন করবে, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি তার বোম্বাইয়ের অধিবেশনে যে-দুটি প্রস্তাব বামপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বামপন্থীদের সারা ভারত দিবস পালনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বললেন, শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখিয়ে। এই হুমকির ফলে এম. এন. রায় শেষ মুহূর্তে একটি ঘোষণা করলেন এই মর্মে যে, তাঁর দল, র‍্যাডিক্যাল পার্টি, সারা-ভারত দিবস পালনে যোগ দেবে না। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে একটি তারবার্তাও পাঠালেন, এই অনুরোধ করে, যেন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ওপর তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের সারা-ভারত দিবস পালন করা থেকে বিরত করেন। যেহেতু মি. এম. এন. রায়কে মনে করা হত একজন বামপন্থী নেতা এবং তাঁর র‍্যাডিক্যাল লিগ ছিল বাম সংহতি সমিতির অন্তর্ভুক্ত, তিনি যা করলেন সেটা বামপন্থীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। দক্ষিণপন্থীরা উচ্চকণ্ঠে তার প্রশংসা করলেন।

র‍্যাডিক্যাল লিগ তাদের ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে তাদের খানিকটা শক্তিক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও কমিটি তার কাজ যথারীতি চালিয়ে গেল এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবার জন্য তাদের সংকল্প আরও জোর পেল যখন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ওপর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এসে পড়ল। কিন্তু অক্টোবরে একটা নতুন সঙ্কট দেখা দিল, যখন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি লক্ষ্ণৌয়ে ঘোষণা করল, ভবিষ্যতে তাদের দল স্বাধীনভাবে কাজ করবে, বাম-সংহতি সমিতির নির্দেশ অনুসরণ করবে না। তা হলেও তাদের এবং কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে পরামর্শ কিছুদিন চলেছিল।

বাম সংহতি সমিতির ওপর পরের আঘাতটি এল ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ, যখন ফরওয়ার্ড ব্লক এবং জাতীয় ফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ ঘটল। ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্টোবর মাসে, ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস কর্ম সমিতির অধিবেশনের প্রাক্কালে, যখন নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন হয়েছিল, ফরওয়ার্ড

ব্লক, কিষাণ সভা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে জাতীয় ফ্রন্ট খুব উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিয়েছিল, যদিও মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের বাইরে অন্য প্রদেশের কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যোগ দেয়নি এবং পরে অক্টোবর মাসে লক্ষ্মৌতে বামপন্থী সংহতি সমিতি থেকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর ফরওয়ার্ড ব্লক এবং ন্যাশনাল ফ্রন্ট পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখল। তবে, ফরওয়ার্ড ব্লকের নজরে এটা আনা হল যে, জাতীয় ফ্রন্ট পূর্বোক্তদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে গেল, যদিও বাহ্যত তারা বামসংহতি কমিটিতে সহযোগিতা করছিল। শুধু তাই নয়, শোনা গেল জাতীয় ফ্রন্টের সরকারি পত্রিকায় একটি সরকারি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, ফরওয়ার্ড ব্লককে বিস্ময়-বিরোধী বলে চিত্রিত করে এবং তার অনেক কাজকর্মের বিরূপ সমালোচনা করে। কলকাতায় ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে ব্লক এবং জাতীয় ফ্রন্টের নেতাদের একটি বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল। জাতীয় ফ্রন্ট উপরোক্ত প্রবন্ধটির দায়িত্ব অস্বীকার করেনি, সেটি প্রত্যাহারও করেনি। তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা তাঁদের বলেন, বামসংহতি কমিটিতে একটি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জাতীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না।

জাতীয় ফ্রন্টের নেতাদের ভাবগতিক দেখে বোঝা গেল তাঁরা এল.সি.সি.-র মঞ্চ ব্যবহার করতে চান, তাঁদের নিজেদের সংগঠনকে জনপ্রিয় করবার জন্য এবং একই সঙ্গে প্রকাশ্যে এবং গোপনে কমিটির অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক প্রচার চালাতে চান।

১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় যখন এই বিভেদ ঘটল তখন জাতীয় ফ্রন্ট খোলাখুলি ফরওয়ার্ড ব্লককে জানিয়ে দিল যে, ফরওয়ার্ড ব্লক যদি কংগ্রেসের ওপর নির্ভর না করে জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করে, জাতীয় ফ্রন্ট খোলাখুলি সে কাজ সম্পর্কে দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তার বিরোধিতা করবে।

এই বিভেদ আরও দৃঢ় হল অন্য কয়েকটি প্রশ্নে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং জাতীয় ফ্রন্টের মধ্যে সংঘাতের ফলে।

বাম সংহতি কমিটি গঠিত হওয়ার আগেই বঙ্গদেশে এল. সি. সি.-র মতো একটা সংগঠন কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বামপন্থীরা ছিল বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেই বামপন্থী মোর্চার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার পরে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বামসংহতি কমিটি গঠিত হলে বামপন্থী মোর্চার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

৯ জুলাই ১৯৩৯-এর পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির ওপর অর্থাৎ আমার ওপর কংগ্রেস কর্মসমিতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল, সর্বভারতীয় দিবস পালন করার জন্য। বিপিসিসি-র সব বামপন্থীরা (জাতীয় ফ্রন্ট সমেত) তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাঁরা একযোগে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। একটা জিনিস অবিলম্বে পরিষ্কার হয়ে গেল, কমিটির তরফে বহু সংখ্যক অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার সেটি ছিল প্রথম। বিপিসিসি-র বামপন্থী সদস্যরা সবাই তখন সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, কর্মসমিতির কাছে নিরীহভাবে আত্মসমর্পণ করবেন না, প্রতিবাদ জারি রাখবেন। কয়েক মাস পরে দেখা গেল, কর্মসমিতি যতদূর প্রয়োজন যেতে এমনকী বৈধ বিপিসিসিকে সাসপেন্ড করে তার জায়গায় একটি 'অ্যাড হক কমিটি' নিয়োগ করতেও প্রস্তুত। এই অবস্থায় বিপিসিসি-র জাতীয় ফ্রন্টবাদীদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। দেখা গেল, কর্মসমিতির

কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব বজায় রাখতে তাঁদের অনিচ্ছা। অন্যান্য বামপন্থীদের চোখে এটা মনে হল এক কঠিন সংগ্রামের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। মনে হল শাস্তির ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছেন কিন্তু জাতীয় ফ্রন্ট তাঁদের উদ্দেশ্যটা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল এবং আসল কথাটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলেছিল, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কর্মসমিতির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে একটি বামপন্থী সংস্থা হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের উচিত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম আরম্ভ করা। অন্য বামপন্থীরা সেই কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্মসমিতির বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সংগ্রামও তারা চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত কিছুদিন পরস্পরের মধ্যে একটা মন কষাকষির পর, জানুয়ারি ১৯৪০-এ জাতীয় ফ্রন্ট এবং অন্যসব বামপন্থীদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছানো গেল, যাতে ঠিক হল, বিপিসিসি নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম আরম্ভ করবে এবং জাতীয় ফ্রন্ট অন্য সব বামপন্থীদের সঙ্গে একত্রে কর্মসমিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে। জানুয়ারি ১৯৪০-এর শেষের দিকে বিপিসিসি সেই বোঝাপড়া অনুযায়ী, আন্দোলন আরম্ভ করল এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জনসভা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল, যখন জাতীয় ফ্রন্ট কোনও জনসভা করত তখন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে করত। জুলাই ১৯৪০-এ যখন বিপিসিসি হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ শুরু করল জাতীয় ফ্রন্ট যে শুধু তাতে যোগ দিল না, তাই নয়, ফ্রন্টের মধ্যে কয়েকজন বাস্তবত তার বিরোধিতাই করেছিলেন। উপরন্তু মার্চ ১৯৪০-এ রামগড়ে সারা ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলনে যখন ফরওয়ার্ড ব্লক জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ ঘোষণা করল, জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থকেরা সেই আন্দোলনও প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন।

সংগ্রামে আমাদের যোগদানের কথা এই পর্যন্ত। কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রসঙ্গে বলি জাতীয় ফ্রন্ট বোঝাপড়া অনুযায়ী তার যা করবার ছিল তা করল না এবং সমর্থকেরা একে একে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেন। কর্মসমিতি যখন অযৌক্তিক এবং আইন বহির্ভূতভাবে বৈধ বিপিসিসি-কে সাসপেন্ড করল, যে বিপিসিসিতে বামপন্থীদের আধিপত্য ছিল এবং তার জায়গায় একটি অ্যাড হক কমিটিকে বসিয়ে দিল, জাতীয় ফ্রন্টওয়ালারা কোনও হইচই না করে অন্য বামপন্থীদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল। শেষোক্তরা হাই কমান্ড-এর হুকুম অগ্রাহ্য করবে বলে ঠিক করল এবং বৈধ বিপিসিসি কাজ করে চলল। জাতীয় ফ্রন্ট-ভুক্তরা প্রথমে নিরপেক্ষতার ভাব দেখিয়ে ঘোষণা করলেন তাঁরা কোনও পক্ষেই যোগ দেবেন না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু তাঁরা অ্যাড হক কমিটির কাছে তাঁদেরকে সদস্য বলে মেনে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে আরম্ভ করলেন। এখন তাঁরা লজ্জা-শরম ত্যাগ করে খোলাখুলি জানিয়েছেন, কংগ্রেস কর্মসমিতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা ছিন্ন করতে পারবেন না।

বঙ্গদেশে ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্যদের এবং অন্যান্য বামপন্থীদের প্রতি জাতীয় ফ্রন্ট সদস্যদের ব্যবহার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, এবং ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ কলকাতায় দুটি সংগঠনের মধ্যে যে-বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল সর্বভারতীয় নানা প্রশ্নে সেই বিভেদ বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে।

ডিসেম্বর ১৯৩৯-এর ঘটনাবলির পর বামসংহতি সমিতির অবশিষ্ট থাকল কেবলমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কিষাণসভা। যতদিন গেল তাদের মধ্যে সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হতে থাকল, তাদের সহযোগিতা এবং উদ্যমের জন্যই ১৯৪০-এর মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক

অধিবেশনের পাশাপাশি সারা ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এবং অত সফল হল।

প্রশ্ন উঠতে পারে অবশ্যই, ফরওয়ার্ড ব্লক আদৌ স্থাপিত হল কেন এবং বর্তমানের যেসব বামপন্থী দল, তাদেরই ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল না কেন, বামসংহতি সাধনের জন্য। বস্তুত সে-পরীক্ষাও করা হয়েছিল কিন্তু তা বিফল হল। তখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল তাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা অবশ্যকরণীয় বলে দাঁড়াল, বামপন্থীদের যদি একই পতাকার তলে নিয়ে আসতে হত এবং দক্ষিণপন্থীদের একজোট হওয়ার বিপক্ষে পালটা কিছু যদি করতে হত।

১৯৩৪-এ এবং তার পরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, র‍্যাডিক্যাল লিগ এবং ওই রকম আরও সব সংগঠন স্থাপনের এবং জাতীয় ফ্রন্টের কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যা এবং প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-কথা চলল ১৯৩৭ পর্যন্ত, কিন্তু ১৯৩৮-এ এই বৃদ্ধি থমকে যায় এবং হরিপুরা কংগ্রেসে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ তা রীতিমতো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। হরিপুরার পর বিভিন্ন দলের বামপন্থীরা এক সঙ্গে বসে চিন্তা করতে লাগলেন বামপন্থীদের শক্তি কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়। সে-প্রচেষ্টা চলল ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত। তখন প্রস্তাব করা হল, একটি বাম-ব্লক গঠিত হোক এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও জাতীয় ফ্রন্টকে অনুরোধ করা হল এই বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে। এইসব প্রচেষ্টায় আমি সক্রিয়ভাবে যোগ দিলাম এবং আমার মতো অনেকে, যাঁরা তখন পর্যন্ত কোনও দলে যোগ দেননি, বামপন্থী ব্লককে সমর্থন দেবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। প্রথম কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং জাতীয় ফ্রন্ট বামপন্থী ব্লকের চিন্তার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সেই চিন্তা ত্যাগ করল। কেন তারা সে কাজ করল সেটা এখন পর্যন্ত আমার কাছে একটা রহস্য। হয়তো তারা ভাবল বাম ব্লক স্থাপিত হলে এবং উন্নতি করতে আরম্ভ করলে তাদের নিজের নিজের দলের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। সে যাই হোক, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বাম ব্লক যদি যথাসময়ে স্থাপিত হত, সেই ব্লক ফরওয়ার্ড ব্লকের জায়গা নিতে পারত। বাম ব্লক স্থাপনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং জাতীয় ফ্রন্ট।

এখন, বর্তমান দলগুলি বামপন্থী লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে কেন ব্যর্থ হল, একটি নতুন সংগঠনের কেন প্রয়োজন হল? এ প্রশ্নের উত্তর যেটা সহজেই বোঝা যায়, তা হল কোনও কারণে বামপন্থীদের দলভুক্ত যাঁদের করা যেতে পারত, তাঁরা তাঁদেরকে একত্র করতে পারলেন না। হয়তো তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, যেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখনই যেটা করবার কাজ সেটা ছিল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টকে প্রমাণিত এবং শক্তিশালী করা এবং সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর করা। কংগ্রেসিদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলস্বরূপ যে দক্ষিণপন্থীদের সংহতি বৃদ্ধি এবং সংবিধানবাদের দিকে সরে যাওয়া তা দেখে তাঁরা আশাহত ও হতোদ্যম হলেন। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের প্রভাবে এবং শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁদের যতটা আগ্রহ ছিল ততটা অন্য কিছুতে নয়। এইসব লোকদের সাহায্যেই আমরা কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ ঠেকাতে এবং বামপন্থীদের উত্থান প্রতিষ্ঠিত করবার আশা করতে পারতাম। অতএব ঠিক কথা হল, বামফ্রন্টের কর্মসূচি হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ন্যূনতম কর্মসূচি, যার ভিত্তিতে আমরা আশা করতে পারতাম, সমস্ত প্রকৃত সাম্রাজ্য-বিরোধীদের একটি পতাকার নীচে একত্র করে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়তে পারব।

ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করবার সময়েও আমাদের সেইটাই উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের তখনই কর্তব্য ছিল সংবিধানবাদের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, কংগ্রেসকে একটি বিপ্লবী সংগঠনে রূপান্তরিত করা, তাকে জাতীয় সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনা এবং দেশকে আগামী যুদ্ধকালীন সংকটের জন্য প্রস্তুত করা।

জন্মের পর থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে, ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে এক মঞ্চে সে নিয়ে আসতে পারেনি। যদিও তাই তার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে। তার অর্থ কি এই যে বামপন্থী সংহতির কোনও আশা নেই? না। তার অর্থ শুধু এই যে বাম-সংহতি অন্য কোনও পথে সাধিত হবে।

বামপন্থী মতবাদ বলতে ঠিক কী বোঝায় এখানে সে-বিষয়ে দু'-একটি কথা বলা দরকার। যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন বামপন্থী বলে দাবি করে, আমরা কী করে ঠিক করব কে প্রকৃত বামপন্থী আর কে নয়?

ভারতীয় জীবনের বর্তমান রাজনৈতিক পর্যায়ে বামপন্থার অর্থ সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধিতা। প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সেই যে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে নির্ভেজাল স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে (মহাত্মা গান্ধী কথিত স্বাধীনতা নামক বস্তু নয়) এবং আপসহীন জাতীয় সংগ্রাম হবে তা লাভ করবার পথ। স্বাধীনতা লাভের পর বামপন্থার অর্থ হবে সমাজতন্ত্রবাদ এবং জাতির সামনে কর্তব্য থাকবে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন। রাজনৈতিক দাসত্বমোচনের আগে সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্পূর্ণ অসময়োপযোগী।

প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের সর্বদা দুটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হয়। ভারতেও তেমনি এক দিকে তাদের লড়াই করতে হবে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ভারতীয় সহযোগীদের সঙ্গে, এবং আরেক দিকে আমাদের জোলো জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কারবার করতে প্রস্তুত। অতএব প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরা যেন প্রস্তুত থাকেন। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে যারা কাজ করে বলে আমরা জানি শুধু তাদের হাতে নিপীড়নের জন্য নয়, তাদের যারা দক্ষিণপন্থী বন্ধু তাদের হাতেও নিগ্রহের জন্য এবং কখনও কখনও বলা কঠিন হতে পারে, কোন নিপীড়ন এবং নিগ্রহ অধিকতর অসহনীয়। এখনকার ভারতে দক্ষিণপন্থীরা নির্মমতায় যত দূর প্রয়োজন যেতে পারেন, কারণ তাঁরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন এবং সমস্ত বিরোধিতা নির্মূল করে ভবিষ্যতে সে ক্ষমতা যাতে নিজেদের হাতে থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একই সঙ্গে দুটো ফ্রন্টে লড়াই করা, এবং তার সঙ্গে দু'রকমের নিপীড়ন নিগ্রহের সম্মুখীন হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। কেউ কেউ এক রকমের নিগ্রহ সহ্য করতে পারেন কিন্তু দু'রকমের এক সঙ্গে হলে পারেন না। আবার অন্যেরা হয়তো বিদেশি গভর্নমেন্টের হাতে নিগ্রহ হজম করতে পারেন কিন্তু তাঁদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে লড়াই করবার প্রশ্ন এলে পিছিয়ে যান। কিন্তু আমরা যদি প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হই এবং সেইভাবেই কাজ করতে চাই, একসঙ্গে দুটো ফ্রন্টে লড়াই করবার এবং যত নিপীড়ন আসুক তা সহ্য করবার সাহস আমাদের মনে আনতে হবে।

ভারতে প্রায়ই আমরা এমন লোক দেখি যাঁরা বামপন্থীর ভান করেন এবং বড় বড় কথা বলেন— তার মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথাও থাকে। কিন্তু সামনে সংগ্রাম এলে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন, এবং নিজেদের সমর্থনে সুচতুর যুক্তি প্রয়োগ করেন। যেমন, আমরা

ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক দেখি যাঁরা শুধুমাত্র কাপুরুষতার কারণে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম এড়িয়ে যান এবং নিজেদের পক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখান। মি. উইনস্টন চার্চিল (যাঁকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী-শিরোমণি বলে জানি), এখনকার সবচেয়ে বড় বিপ্লবী। এই সব ছদ্ম-বামপন্থীদের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বিপ্লবী শক্তি বলে অভিহিত করা যেহেতু তারা নাৎসি এবং ফাসিস্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কিন্তু সুবিধেমতো তাঁরা ভুলে যান ব্রিটেনের যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং ভুলে যান যে, জগতের বৃহত্তম বিপ্লবী শক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি জার্মানির সঙ্গে একটি সমুন্নত (solemn) চুক্তি সম্পাদন করেছে।

যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংঘাতে ভীত, তাঁরা অন্য একটি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা ঐক্যের যুক্তি দিয়ে আড়াল করেন। কিন্তু এ যুক্তি অসার এবং এর থেকে প্রায়ই আসে আত্মপ্রবঞ্চনা। একরকম ঐক্য এবং আরেক রকমের ঐক্যের মধ্যে সব সময়ে পার্থক্য করতে হয়— কিছু করার ঐক্য এবং কিছু না করার ঐক্যের মধ্যে এবং এ-কথা কখনওই ভোলা উচিত নয়, যাঁরা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী এবং যাঁরা তা নন, তাঁদের মধ্যে ঐক্যের কথা বলা অলীক, অবান্তর। যে-কোনও অবস্থাতে ঐক্যই যদি চরম প্রাপ্তি হয়, তা হলে কংগ্রেসীদের সঙ্গে যাঁরা কংগ্রেসের বাইরে আছেন কিংবা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁরা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবেন না? ঐক্যের যুক্তি খানিক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি নয়। ঐক্য অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু একমাত্র নীতি এবং পদ্ধতি নিয়ে সহমত থাকলে নিজের নীতি এবং বিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে যে ঐক্য তার কোনও দাম নেই, তার ফলে আসে কর্মহীনতা আর প্রকৃত ঐক্য সব সময়েই শক্তির উৎস। তাতে কাজে উৎসাহ আসে। ঐক্যের অজুহাতে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংঘাত পরিহার করে চলা, এ দুর্বলতা এবং ভীরুতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ওইসব কথা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যায় কারা প্রকৃত বামপন্থী আর কারা নন, এবং ফরওয়ার্ড ব্লক তার কর্ম এবং আচরণের দ্বারা নিজেকে প্রকৃত বামপন্থী সংগঠন বলে প্রমাণ করেছে কিনা।

এখন প্রশ্ন, বাম-সংহতি শেষ পর্যন্ত কীভাবে সাধিত হবে? আমরা দেখেছি, বাম-সংহতি সাধনের তিনটি সম্ভাব্য পথের সবকটিই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এও জানি, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং দল নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেছে। তা হলে ভবিষ্যতে বামপন্থী আন্দোলন কীভাবে বৃদ্ধি পাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর, ইতিহাসের যুক্তিধারা ঠিক করে দেবে কারা যথার্থ বামপন্থী; ইতিহাস ভুষি আর দানা, মেকি বামপন্থী আর প্রকৃত বামপন্থী আলাদা করে দেবে। এইভাবে যা মেকি তাকে বাদ দিয়ে দিলে সব প্রকৃত বামপন্থীরা একজোট হবেন ও যথার্থ ঐক্য সম্পন্ন হবে।

এই স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বাম-সংহতি সাধিত হবে তার জন্য দ্বৈত রণাঙ্গনে সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষা দরকার। সেই অগ্নিপরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই হবেন প্রকৃত বামপন্থী এবং কালক্রমে তাঁরা একসঙ্গে মিশে যাবেন।

ভারতীয়রা যেহেতু একটি জীবন্ত জাতি, তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মৃত্যু হতে পারে না। এবং যেহেতু গতিহীনতা দক্ষিণপন্থীদের গ্রাস করেছে, ইতিহাসের যুক্তি দাবি করে এক বৃহৎ বাম-আন্দোলন, যাতে প্রগতি অব্যাহত থাকে। এরপরে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তা সাময়িক। শেষ পর্যন্ত বামপন্থা এদেশের সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে।

জন্ম থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতে বাম আন্দোলনে পুরোগামী। তাকেই হাতিয়ার হিসাবে পেয়ে যত বামপন্থী শক্তি দিনের পর দিন নিজেদের শক্তি ও প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে, তার সঙ্গী কিষাণ সভার সঙ্গে। ভবিষ্যতে বাম-সংহতি সাধনে দায়িত্ব হবে তারই। দ্বৈত রণাঙ্গনে নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়ে এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং ভারতীয় দক্ষিণপন্থীদের হাতে নির্যাতনকে স্বাগত জানিয়ে, প্রকৃত বামপন্থী সংগঠন হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লক একটি যথার্থ বামপন্থী সংগঠন হিসাবে তার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব অন্য সব দল যেখানে ব্যর্থ, ফরওয়ার্ড ব্লক সেখানে সফল।

দক্ষিণপন্থী আন্দোলনে গান্ধীজি যা, বামপন্থী আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লক তাই। দর্শনের দিক থেকে বলতে গেলে, ফরওয়ার্ড ব্লককে বলা যায় প্রথমোক্তর anti-thesis। যদিও ফরওয়ার্ড ব্লক বরাবর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রণাঙ্গনে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতে চেয়েছে, তবুও তাদের মধ্যে পার্থক্য গভীর ও মৌলিক। গান্ধীবাদ শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা চিন্তা করে, কারণ সত্যাগ্রহ (অথবা আইন অমান্য) আপসের মধ্যেই শেষ হতে বাধ্য। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতে চায় না। সামাজিকভাবে গান্ধীবাদ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 'haves'-দের অর্থাৎ যাদের আছে তাদের সঙ্গে অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে। 'Have not's' অর্থাৎ যাদের নেই, তারা যত সচেতন হয়ে উঠছে (যা অবশ্যম্ভাবী), তাদের এবং গান্ধীবাদীদের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিশ বছর আগে অবস্থা যে-রকম ছিল না, কৃষিজীবী এবং কারখানায় শ্রমজীবীদের বহুসংখ্যকের কাছে গান্ধীবাদের আজ আর কোনও আবেদন নেই, মধ্যবিত্ত এবং ছাত্রসমাজের কাছেও নেই, যাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল। সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে ভবিষ্যতের গান্ধীবাদী চিন্তা, অংশত যা মধ্যযুগীয় এবং অংশত সমাজতন্ত্র-বিরোধী, সেসব চিন্তাধারা ফরওয়ার্ড ব্লকের চিন্তার বিপরীত। ফরওয়ার্ড ব্লকের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দাবিদার।

১৯৩৯ সালের মে মাসে উদ্বোধনের পর ফরওয়ার্ড ব্লক তার নিজের মতাদর্শ এবং কর্মসূচিকে পূর্ণতর রূপ দিয়ে চলেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মৌলিক বিষয়ে কোনও পরিবর্তন হয়নি, একমাত্র এই একটি বিষয় ছাড়া। নাগপুরে জুন ১৯৪০-এ দ্বিতীয় সর্বভারতীয় অধিবেশনে একে পার্টি বলে ঘোষণা করা হয়। গতকাল যেমন ছিল, আজও তেমনি ফরওয়ার্ড ব্লক সংগ্রাম করে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর সংগ্রাম করবে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য।

প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আজ পর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক কী কী সাফল্য লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তার কী কী সম্ভাবনা। অতিশয়োক্তি না করে, আত্মপ্রশংসা না করে, আমরা নিম্নলিখিত দাবি করতে পারি।

১) একটি বামপন্থী শক্তি গড়ে তুলে ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসকে গতিহীনতা ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

২) সংবিধানবাদের দিকে সরে আসা বন্ধ করার কাজ করেছে, জনসাধারণের মনে এক নতুন বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টির কাজ করেছে এবং কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনার কাজ করেছে, সে কাজ যতই প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়ে থাক।

আজ কেউই অস্বীকার করবেন না যে রামগড়ে ১৯৪০-এর মার্চ মাসে আপস-বিরোধী সম্মেলন, এবং তার আগেকার প্রচার কার্য এবং তার পরবর্তী সক্রিয়তা ছাড়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করতে তিনি বাধ্য, এ-কথা মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন না।

৩) যুদ্ধ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস ফরওয়ার্ড ব্লক করেছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪) সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ যুদ্ধ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর যে মনোভাব ছিল, তা পরিত্যাগ করে তিনি সেই যুদ্ধনীতিতে ফিরে আসেন যে যুদ্ধনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। আর এসব সম্ভব হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচার এবং কাজকর্মের জন্য।

৫) বাম আন্দোলন গড়ে তুলে ফরওয়ার্ড ব্লক সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বিষয়ে বা প্রশ্নে বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীরা ভিন্নমত এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে ও মতাদর্শগত ভাবে কংগ্রেসের অগ্রগতিকে উৎসাহিত করেছে।

৬) কোনও ব্যক্তি অথবা দলের পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে বিশেষত যুদ্ধকালীন সংকট এবং জাতীয় সংকট সংক্রান্ত কোনও বড় বড় প্রশ্নে কংগ্রেসকে এবং দেশকে ফরওয়ার্ড ব্লক সতর্ক করে দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা যায়:

১) সময় এলে ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসে বামপন্থীদের উত্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যার ফলে কংগ্রেসের অগ্রগতি বাধাহীন হবে।

২) প্রমাণ হবে ফরওয়ার্ড ব্লক ভবিষ্যতের পার্টি, যে-দল জাতীয় আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তাকে সফল করে তুলবে এবং তারপরে পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেবে। ইতিহাসের নিয়মে ভারতের মাটি থেকে জন্ম নিয়ে এবং একই সঙ্গে আবহাওয়াতে এবং বহির্বিশ্বে যা কিছু স্বাস্থ্যকর এবং সুফলদায়ী তা আত্মসাৎ করে, ফরওয়ার্ড ব্লক দ্বৈত ভূমিকা পালন করে জাতীয় সংগ্রামকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাবে এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির ওপর এক নতুন ভারত গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

৩) সেই দল তার সঠিক ভূমিকা পালন করে ভারতকে বিশ্বের দরবারে তার উপযুক্ত স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।

৪) তার ফলে সেই দল ভারতকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবার ক্ষমতা প্রদান করবে, যাতে মানবের অগ্রগতি আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, তার চেয়ে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের মনে যেসব চিন্তা সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করছি।

ফরওয়ার্ড ব্লক যার জন্য সংগ্রাম করতে চায়, তা হল:

১) সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং তার জন্য আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম।

২) একটি সম্পূর্ণ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৩) দেশের অর্থনৈতিক পুনর্জন্মের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ আকারের শিল্প।

৪) উৎপাদন এবং বিতরণ, উভয়েরই রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ।

৫) ধর্মীয় পূজা-অর্চনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

৬) প্রত্যেক ব্যক্তির সমান-অধিকার।

৭) প্রত্যেক ভারতীয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বনিয়ন্ত্রণ।

৮) ভারতে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির প্রয়োগ।

ফরওয়ার্ড ব্লক একটি বৈপ্লবিক ও গতিশীল সংগঠন। তাই কোনও বাঁধাধরা নিয়মকানুন, অথবা পুঁথিগত রাজনীতি অথবা অর্থনীতি-বিদ্যার দোহাই ওঁরা দেন না। এই দল আন্তরিকভাবে আগ্রহী বহির্বিশ্ব যত জ্ঞান দেয়, সবই আত্মস্থ করতে, এবং প্রগতিশীল জাতিসমূহের অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভবান হতে। এই দল মনে করে প্রগতি এবং বিবর্তন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং তাতে ভারতের কিছু দেবার আছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যতের সম্পর্কে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে ইতিহাসের যুক্তিতে অবশ্যম্ভাবী এ-দলের মৃত্যু হবে না। তার যদি ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা থাকে, সে জীবিত থাকবে এবং এ-দল যদি ভারতের, মানবতার এবং মানুষের অগ্রগতির প্রয়োজন মেটাতে পারে, এ দল বেঁচে থাকবে এবং পৃথিবীর কোনও শক্তি একে ধ্বংস করতে পারবে না।

অতএব আমার দেশবাসী, এগিয়ে চলো, সদা এগিয়ে চলো!

৩

ভারতীয় বিপ্লবের পরিকল্পনা

একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ[১]

কাবুল, ২ এপ্রিল ১৯৪১

বিষয়: সুভাষচন্দ্র বসু, ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব
(আমার টেলিগ্রাম, এন ১২৪ সংখ্যক-এর অনুবৃত্তিতে আমি এখানে ভারত সম্পর্কে বসুর কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ দিলাম)

তিনি মনে করেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এটিই সুবিধাজনক হবে যে একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করা যার নামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে। (যে-রকমভাবে বিভিন্ন স্বাধীন সরকার লন্ডনে গঠন করা হয়েছে)।

ইতালি, জার্মানি এবং জাপানের উচিত উক্ত গর্ভনমেন্টকে স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া।

সে-রকম প্রতিশ্রুতি হাতে পেলে, স্বাধীন ভারতের সরকার তার নিজের বিশেষ বেতার প্রচার আরম্ভ করবে দুটি মূল বিষয়ে:

১) অক্ষ-শক্তি সমূহের জয়লাভ নিশ্চিত (১৯৩৯ সালে জার্মানি, ইতালি এবং জাপান অক্ষ-শক্তি নামে অভিহিত হয়। পরে অন্যান্য শক্তিকেও এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়: অনুবাদক)

২) ইংল্যান্ডের কাছ থেকে কিছু লাভের আশা নেই। তার এই চরম বিপদের সময়ে সে এখনও আমাদের ডমিনিয়ন স্টেটাস দিতে অস্বীকার করছে, যখন অক্ষ-শক্তিগুলি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিচ্ছে।

একই সঙ্গে, এই বেতার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সরকার সক্রিয়ভাবে ভারতে বিপ্লবের জন্য কাজ করবে এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সকলের যুদ্ধে সেইটাই হবে তার অবদান। তার জন্য, স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। সেই সাহায্য অক্ষশক্তিসমূহ দেবে ঋণ হিসাবে। ভারত সেই ঋণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শোধ করবে।

---

১. কাবুলে ইতালির রাষ্ট্রদূত Mr. Alberto Quaroni মার্চ ১৯৪১-এ নেতাজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ তাঁর গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ভারত থেকে নিষ্ক্রমণের পর আফগানিস্তানে তাঁর গোপন অবস্থানের সময়ে কাবুলে ইতালীয় দূতাবাসে সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল।

বসুর মতে ভারত নৈতিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত। তার যেটার অভাব সেটা হল প্রথম পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় সাহস। তার প্রধান বাধা, নিজের ক্ষমতায় আস্থার অভাব এবং আরেকদিকে ব্রিটেনের মাত্রাতিরিক্ত শক্তি সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস। তিনি বলেন, যদি ৫০,০০০ ইতালিয়ান, জার্মান ও জাপানি ভারতের সীমান্তে পৌঁছোয়, জনসাধারণ ব্রিটিশদের পরিত্যাগ করে চলে যাবে, গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে এবং অতি অল্প সময়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো যাবে।

বসুর মত অনুযায়ী অন্য এক অর্থেও ভারতীয়দের জনমতের বিবর্তন হয়েছে গভীরভাবে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক মহল আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত ইতালি, জার্মানি ও জাপান মানবজাতির শত্রু। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এবং ইংল্যান্ডের রাজনীতির ওপর ভিত্তি করা তাদের আশা ধূলিসাৎ হওয়ার পর অনেক ভারতীয় বুঝতে আরম্ভ করেছে এই বিষয়ে ইংল্যান্ড তাদের প্রবঞ্চনা করেছে।

আগেই বলেছি এবং এই বিষয়ে আমি বসুর সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না যে, ভারতে বিপ্লবের সম্ভাবনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ইংল্যান্ডের সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীতি এবং ভীতির চেয়েও বেশি, এই বিশ্বাস যে, ইংল্যান্ডের যা শক্তি এবং তার যে-রকম অদৃষ্টের জোর, তাতে এই সংকটও শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠবে। আফ্রিকায় এবং গ্রিসে আমাদের সাম্প্রতিক পরাজয় এবং আমেরিকানদের মনোভাব, এই রকম মতকে আরও জোরদার করেছে, এমনকী যারা গত গ্রীষ্মকালে এ বিষয়ে সন্দিহান হতে আরম্ভ করেছিল তাদেরও। আমি বলেছি, এ-কথা ঠিক। আফগানিস্তানে সর্বত্র আমার সামনে এইরকম মানসিকতা দেখছি। সেই দেশে ভারতের চেয়ে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে দৃষ্টি বেশি সংকীর্ণ। ইংল্যান্ডের পরাজয় এখানে কাঙ্ক্ষিত এবং বাঞ্ছিত, কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে এখানে সবাই ভয় পায়।

অতএব মূল সমস্যা, বসুর মতে, তথ্য এবং প্রচারের সাহায্যে ভারতীয়দের মনে বিশ্বাস জন্মে দেওয়া যে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করা যায় এবং পরাজিত করা হবে। তা যখন করা হবে, শতকরা ৭০ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হবে।

বসু বলেছেন, আজ ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁর কথার ওজন সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেছেন, ত্রিপুরী কংগ্রেসে যেখানে তিনি কংগ্রেসকে একটা সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা রচনা করতে বলেন, "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে ইউরোপের যুদ্ধ ছ'মাসের মধ্যে বাধবে। সেই সময়ে আমি সে-কথা বলেছিলাম কতকটা প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্য" তিনি বলেছিলেন "কিন্তু ঘটনাক্রমে যুদ্ধ ঠিক ছ'মাসের মধ্যেই শুরু হল। তার ফলে আমার খ্যাতি অনেক উঁচুতে উঠে গেল, অন্য সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ঘটনা আমি বেশি পরিষ্কার দেখতে পাই এই ধারণা সৃষ্টি হওয়ার দরুন।" সেই কারণে তিনি বলেন, "যেদিন আমি বেতারে বলতে পারব, 'ভারতের বন্ধুগণ, আমি ইউরোপে এসেছি, আমি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি অক্ষশক্তিসমূহ জয়লাভ করবে,' আমার কথা সবাই বিশ্বাস করবে অন্য কারও কথার চেয়ে বেশি।"

প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিনি আমাকে বলেছেন, রেডিয়োতে প্রচারের আগে তাঁর নিজের বিশ্বাস হওয়া চাই।

ইতালিতে কিংবা জার্মানিতে কিংবা দু'দেশেই স্বাধীন ভারতের বেতার প্রচারের জন্য তিনি সুযোগ চাইবেন।

আপনাদের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি প্রস্তাব করেছেন, কাবুল সেন্ট্রাল-এর মাধ্যমে

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য (আজকের তারিখের আমার রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) এবং সেইভাবে, প্রয়োজনমতো, দরকারি নির্দেশ পাঠানোর জন্য।

তিনি আরও চান, সৈন্যবাহিনী থেকে দলত্যাগের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রচার, অনিয়মিতভাবে দু'-একজন করে দলত্যাগ নয়, সমগ্র ডিভিশনের দলত্যাগ। স্বাভাবিকভাবেই, তা হলে ভালই হবে। আমি আরও জিজ্ঞাসা করেছিলাম সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার বিষয়ে। উনি উত্তর দিয়েছেন, বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে সে-ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব আছে কিন্তু সন্ত্রাসবাদের উপযোগিতায় তার বেশি বিশ্বাস নেই। উক্ত সংগঠনগুলির কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত নাশকতায় পরিবর্তন করার কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি। ধারণাটি তাঁর অতিশয় পছন্দ, এবং তাঁর সচিবের মাধ্যমে তিনি বঙ্গদেশের প্রধান সংগঠনের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এই ধরনের কাজ করতে। বসু বলেছেন সেই সংগঠন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছে। আমি তাঁকে বলেছি, বার্লিনে এবং রোমে, কাজকর্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে তিনি সমস্ত কার্যকরী পরামর্শ পাবেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য সামরিক সরবরাহে ভারত যখন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তখন বৃহৎ আকারে নাশকতা যদি সংগঠিত করা যায়, সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে না।

বসুর কাজকর্ম থেকে আমরা জেনেছি, তিনি বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ, তাঁর অন্তর গভীর আবেগ ও অনুভূতিপূর্ণ এবং ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী, সম্ভবত একমাত্র বাস্তববাদী।

ভারত এমন বৃহৎ ও জটিল একটি সমস্যা যে, এখানে কাবুলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তাঁর সম্পর্কে বসু যা করতে চান তার বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে মত ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন।

আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি, বসু ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলেছেন তার সঙ্গে, সেনসর করা ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ থেকে যা বোঝা যায় তার মিল আছে। তাতে বুঝতে পারা যায় তাঁর বিবৃতিগুলি অতিরিক্ত আশাবাদী, এই বলে তাদের ওপর দোষারোপ করা যায় না। এটা বসুর সপক্ষে যায়।

ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার ধারণা, যা আমি পেয়েছি বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং সবশেষে বসুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ থেকে, তা এইরূপ:

জুন ১৯৪০-এ, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের পরাজয় যখন নিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল, বসু যার প্রস্তাব করেছেন সেরকম একটি সংগঠন যদি আমাদের প্রস্তুত থাকত ভারতকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারত এবং তা সম্ভবত সফল হতে পারত।

রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি ভিত্তিপ্রস্তর।

গত বছরের সুযোগটি এখন চলে গেছে কিন্তু এ বছরও সেরকম একটি সুযোগ আসতে পারে। তাকে কাজে লাগানো উচিত।

এই সংগঠনটি গড়ে তুলতে অর্থের প্রয়োজন হবে এবং সম্ভবত কম টাকায় সে কাজ হবে না।

অতীতে আমরা অনেক অর্থ ব্যয় করেছি। উদাহরণস্বরূপ, দুইটি আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রচারে। আজ তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা আরও অনেক গূঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারি। যে চেষ্টা করা হচ্ছে, যদি তা আংশিকভাবেও সফল

হয়, সম্ভবত কয়েক মাসের যুদ্ধ, মানুষের জীবন, কোটি কোটি পরিমাণ অর্থব্যয় নিবারিত হবে।

আমাদের যারা শত্রু, তারা তাদের সমস্ত যুদ্ধে, এই বর্তমান যুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বিপ্লবের অস্ত্র ব্যবহার করে সফল হয়েছে। আমরা শত্রুর কাছ থেকে কেন শিক্ষা নেব না? বিপ্লব সংগঠিত করতে দুটি জিনিসের প্রয়োজন, মানুষ এবং অর্থ। ভারতে বিপ্লব আরম্ভ করবার মতো লোকবল আমাদের নেই। কিন্তু ভাগ্য আমাদের হাতে মানুষ এনে দিয়েছে। জার্মানির এবং আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, এই আন্দোলনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার অভাব অবশ্যই নেই।

একমাত্র প্রয়োজন বিপ্লবের সপক্ষে এবং বিপক্ষে কারণগুলির বিচার এবং ঝুঁকি কতটা থাকবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এ. কুয়ারোনি

জার্মান গভর্নমেন্টকে প্রেরিত গোপন স্মারকপত্র

বার্লিন, ৯ এপ্রিল ১৯৪১

অক্ষশক্তিসমূহ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার পরিকল্পনা

১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মতো বর্তমান যুদ্ধেও ব্রিটেন তার যুদ্ধের জন্য ভারতকে শোষণ করছে। যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে জার্মানির হাতে অনেকবার হারের পরেও গ্রেট ব্রিটেন ভারতের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুষ্টি আলগা করেনি। অতএব ভারতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যত ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে থাকবে, গ্রেট ব্রিটেন চেষ্টা করবে ভারতকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে এবং একেবারে শেষপর্যন্ত তাই করে যাবে। ভারতে ব্রিটেনের নীতি থেকে আরেকটা জিনিসও স্পষ্ট হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি কোনও রকমে যুদ্ধের পরে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতেও পারে, গ্রেট ব্রিটেন চেষ্টা করবে ভারতের সম্পদ শোষণ করে নিজের শক্তি পুনরুদ্ধার করবার যাতে কয়েক বছর নতুন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই ভারত চায় এই যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন সম্পূর্ণ পরাজিত হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক, যাতে ভারত তার জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শুধু ভারতের স্বাধীনতার পথে নয়, মানবজাতির অগ্রগতির পথেও সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

এই যুদ্ধে ভারতবাসীরা যেহেতু ব্রিটিশদের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুভাবাপন্ন, তারা গ্রেট ব্রিটেনের পতনে রীতিমতো সাহায্য করতে পারে। ভারতের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে, যদি ভারতবাসীদের আশ্বস্ত করা হয় যে অক্ষশক্তিগুলির জয়ের অর্থ হবে স্বাধীন ভারত।

গ্রেট ব্রিটেনের পরাজয়, যেটা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য, তার জন্য অক্ষশক্তিসমূহ ও ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন করবার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তার জন্য কাজ করার প্রয়োজন হবে ইউরোপে, আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপজাতীয়দের অঞ্চলে। এবং এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ভারতে।

১. ইউরোপে করণীয় কাজ

১) একটি স্বাধীন ভারত সরকার ইউরোপে (বার্লিনে হলেই ভাল হয়) স্থাপন করা উচিত।

২) অক্ষশক্তিসমূহের এবং স্বাধীন ভারত সরকারের মধ্যে বিশেষ চুক্তি সম্পাদিত

করতে হবে, যাতে থাকবে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, অক্ষশক্তিদের জয়লাভ হলে ভারতের স্বাধীনতার ব্যবস্থা। স্বাধীন সরকার স্থাপিত হলে ভারতে অক্ষশক্তিদের জন্য বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হবে।

৩) যেখানেই সম্ভব, স্বাধীন ভারত সরকারের দূতাবাস বন্ধু দেশগুলিতে স্থাপন করতে হবে।

(পু. উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ভারতীয়দের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবে যে অক্ষশক্তিসমূহের জয়লাভের ফলে তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হচ্ছে।)

৪) অতঃপর, বিশেষত বেতারের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ করতে হবে। তাতে ভারতীয়দের ডাক দেওয়া হবে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। বেতার-প্রচার হবে স্বাধীন ভারত বেতার-কেন্দ্রের নামে।

৫) আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে, বিপ্লবে সহায়তার জন্য।

কী সাহায্য ভারতের প্রয়োজন হবে, নীচে তার উল্লেখ করা হচ্ছে।

২. আফগানিস্তানে করণীয় কাজ (কাবুল)

১) একদিকে ইউরোপ এবং আরেক দিকে ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য কাবুলে একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। বর্তমানের বিভিন্ন দূতাবাসের আকার বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে সে-কাজ তারা করতে পারে, অথবা বিশেষভাবে এই কাজের জন্য বিভিন্ন নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।

২) ইউরোপ এবং ভারতের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য সেই কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম থাকতে হবে, যেমন গাড়ি, লরি, সংবাদ-বাহক ইত্যাদি।

৩. উপজাতীয় অঞ্চলে করণীয় কাজ

১) আমাদের কর্মীরা এর মধ্যেই আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত স্বাধীন উপজাতীয় অঞ্চলে কাজ করছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর বড় আকারের আক্রমণের পরিকল্পনা করতে হবে। ইপি-র ফকিরের মতো ব্রিটিশ-বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন আক্রমণকে সেই বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

২) ইউরোপ থেকে কিছু সামরিক উপদেষ্টাকে উপজাতীয় অঞ্চলে পাঠাতে হবে।

৩) উপজাতীয় অঞ্চলে একটি শক্তিশালী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) উপজাতীয় অঞ্চলে একটি বেতার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৫) ভারতের সীমান্ত প্রদেশ, যেটি উপজাতীয় অঞ্চলের সংলগ্ন, সেখান থেকে সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উপজাতীয় অঞ্চল থেকে কর্মী নিযুক্ত করতে হবে।

৪. ভারতে করণীয় কাজ

১) ভারতের জন্য বেতার-প্রচার বৃহৎ আকারে হওয়া চাই। প্রথমে সেই প্রচার ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এবং পরবর্তী কালে উপজাতীয় অঞ্চল থেকেও করতে হবে।

২) উপজাতীয় অঞ্চলের মুদ্রণ-কেন্দ্রের ওপরে ভারতে প্রচারের দায়িত্ব থাকবে।

৩) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের কর্মী এবং আমাদের দলের সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হবে, তাঁরা যেন ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে যতদূর সম্ভব অসুবিধায় ফেলেন। তাঁদের কাজের মধ্যে থাকবে:

ক) তীব্র প্রচার যাতে ভারতবাসীদের বলা হবে, একটি টাকা এবং একটি সৈনিকও ব্রিটিশ সরকারকে না দেওয়া।

খ) অসামরিক কর্তৃপক্ষকে অমান্য করে কর না দেওয়ার জন্য, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আদেশ পালন না করার জন্য, আইন না মানার জন্য প্রচার করা।

গ) সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়দের মধ্যে গোপনে কাজ করা, যাতে তারা বিদ্রোহ করে।

ঘ) যে-সব কারখানা ব্রিটেনকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করে, সেখানে ধর্মঘট সংগঠিত করা।

ঙ) সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে-সেতু, কল-কারখানা প্রভৃতিতে অন্তর্ঘাত চালানো। (সে-কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারতে পাঠাতে হবে।)

চ) সাধারণ গণ-বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভ্যুত্থান সংগঠিত করা।

৫. আর্থিক প্রশ্ন

উপরোক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অক্ষশক্তিদের জোগাতে হবে। সে সাহায্য হবে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের সরকারের প্রতি ঋণ।

ইউরোপে ব্যয়নির্বাহের জন্য স্বভাবতই অর্থ দিতে হবে মার্ক-এ। আফগানিস্তানে খরচের জন্য মার্ককে আফগানিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে। ভারতে খরচের জন্য আফগানিকে টাকায় বদল করা যেতে পারে, যদিও সেটা এখন একটু কঠিন হয়ে পড়ছে। দশ টাকার নোট ইউরোপে ছাপিয়ে আফগানিস্তান দিয়ে ভারতে পাঠানো যায়।

স্মারক : ব্যাখ্যা

১) ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা।

২) আমাদের বিবেচনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

৩) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের গুরুত্ব।

৪) বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ কূটনীতির কয়েকটি দিক।

৫) ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতীয়দের মনোভাব।

৬) আজ ভারতের সামরিক অবস্থা।
৭) সুদূর প্রাচ্যে জাপানি নীতির ভারতের পক্ষে গুরুত্ব।

১. ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষা

মানবজাতির পক্ষে ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধে কয়েকটি শিক্ষার বিষয় আছে। কিন্তু বর্তমান মন্তব্যের জন্য আমি কেবলমাত্র একটির উল্লেখ করব। সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে রচনা করবার সময় এল, মিত্রশক্তিবর্গ এবং বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কেন্দ্রীয় শক্তিসমূহকে এমনভাবে চূর্ণ করে দিতে চাইল যাতে তারা আর কখনও মাথা তুলতে না পারে।

ভার্সাইয়ের চুক্তির মধ্যে অনেক অন্যায় আছে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তা সত্ত্বেও জার্মান রাইখ-এর মৌলিক অখণ্ডতা ও ঐক্যকে বিচলিত করতে পারল না। পক্ষান্তরে, দুটি সাম্রাজ্য, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় ও অটোমান সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল এবং আজ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সেই ভেঙে পড়ার ফল কী হয়েছে। জার্মান রাইখ না থাকলে এখন ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসি জোটকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো কোনও শক্তি থাকত না।

বিগত কয়েক বছরের, বিশেষ করে গত কয়েক মাসের ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, এক নতুন ইউরোপ ও নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বহু উপাদানে গঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এবং গ্রেট ব্রিটেন যদি বর্তমান যুদ্ধে পরাস্তও হয় তার পরেও সে প্রগতি ও বিবর্তনের দুর্মর শত্রু হয়ে থেকে যাবে। তার ফলে এই যুদ্ধের পরে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, কয়েক বছর পরে সে আবার নিজের শক্তি পুনরুদ্ধার করবে এবং নতুন ব্যবস্থার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। নতুন ব্যবস্থাকে যদি টিকে থাকতে হয় তা হলে চিরকালের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অক্ষম করে দিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ কত হতে পারে, তার হিসাব করা যায় না, এবং ভারত এখনও সেই সাম্রাজ্যের মাথার মণি। পরাজিত ব্রিটেনকে যদি সেই সব সম্পদ বাড়িয়ে তুলবার সময় ও সুযোগ দেওয়া যায় তা হলে তার আবার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হবে। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর পর থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি এবং প্রশাসন থেকে বুঝতে পারা যায় যে ইউরোপে সে যত ভেঙে পড়ছে, ভারতের ওপর তার মুষ্টিকে সে তত দৃঢ় করবার এবং সে দেশের সম্পদ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতেও ব্রিটেন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং ভারতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুদ্ধের পরেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা যদি বজায় থাকে তা হলে পরাজিত গ্রেট ব্রিটেন দু'-এক দশক পরে আবার বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলবে।

অক্ষশক্তিদের এখন ভেবে দেখতে হবে, ১৯১৮-১৯ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় এবং অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি তারা যা করেছিল গ্রেট ব্রিটেনকে এখন তাই করবে কি না। গ্রেট ব্রিটেনকে যদি তার কাজের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হয় তা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে হবে এবং যে সব দেশ এখন ব্রিটিশের অধীন তাদেরকে স্বাধীন করে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যদি শুধু ভারতকেই ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়

আর তার সাম্রাজ্যের অন্য সব অংশকে তার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, ভারতের যত সম্পদ এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি, তার সাহায্যে ব্রিটেন কয়েক বছর নতুন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে।

এই যুদ্ধের পর ইউরোপে ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজন একটি নতুন ব্যবস্থা। শুধু ইউরোপ এবং এশিয়া নয়, সারা বিশ্বে। এবং এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ: আমাদের যা মনে হয়

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ভারতে আমাদের নিশ্চিত মত ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবক্ষয় আরম্ভ হয়েছে। এই ধারণা, মানবজাতির ইতিহাস যে-নিয়ম অনুযায়ী চলে তার সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক চিন্তা থেকে আসেনি, বিতর্কিত তথ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করায় পরে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি। সাম্রাজ্য ব্রিটিশ জনসাধারণকে অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও সম্পদ দান করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে তাদেরকে দিয়েছে আরাম, বিলাস, তার ফলে আত্মতৃপ্তি ও উগ্র আত্মগৌরব। এসেছে চরিত্রের ও নৈতিকতার অবনতি। এই অবনতির একটি দিক কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনা। যে ব্রিটেনকে আজ আমরা ভারতে ও গ্রেট ব্রিটেনে দেখছি, সেটা পঞ্চাশ বছর আগেকার ব্রিটেন নয়।

একদিকে যেমন ব্রিটিশ জনসাধারণের বিগত কয়েক দশক ধরে অবনতি হয়েছে, সাম্রাজ্যের অবদমিত জাতিগুলির বিশেষ করে ভারতের মধ্যে এসেছে অভূতপূর্ব জনজাগরণ। সেই অবনতি ত্বরান্বিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ, যথা আয়ারল্যান্ড (Eire), দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, ভারত ইত্যাদি সর্বত্র জনজাগরণের দরুন, আগত চাপের দরুন।

বর্তমান যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল পৃথিবীর সামনে এই সত্যটি উদ্ঘাটিত করে দিতে যে যতটা মনে হয় ব্রিটিশ সিংহ তত শক্তিশালী নয়। প্রকৃতপক্ষে সে হীনবল। সাম্রাজ্যের জন্ম এবং দীর্ঘজীবনের কারণ ছিল সামরিক শক্তি যার মধ্যে ছিল নৌবহর এবং ছিল উচ্চ মর্যাদা। যখন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় আরম্ভ হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞান, শিল্প, যুদ্ধের কলা-কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে, গ্রেট ব্রিটেন তাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পর্যবেক্ষক পরিষ্কার দেখতে পায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়তি হল ধ্বংস এবং তার দ্রুত পতনের জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু একটি আন্তর্জাতিক সংঘাত। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ এই সংঘাত পর্যন্ত অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল এবং তার অতীতের মানমর্যাদার সাহায্যে বাইরের চাকচিক্য ধরে রেখেছিল। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তার একের পর এক বিপর্যয়কর পরাজয় শুধু তার প্রকৃত সামরিক অবস্থাটাই অনাবৃত করে দেয়নি, গ্রেট ব্রিটেনে বিভিন্ন উপনিবেশসহ সারা পৃথিবীতে তার মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। এই লেখায় আমি দেখাব তার মানমর্যাদা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এবং পৃথিবীর চোখে তার সামরিক অবস্থা এখন সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব আজ একটি তাসের ঘর।

ভারতে আমাদের মত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়বে, তখন নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি

হইবার সম্ভাবনা: কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে সরে যাবে; আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, প্যালেস্টাইন, মিশর, ইরাক প্রভৃতি ব্রিটিশ-অধীনতা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন উপনিবেশগুলিকে অন্যান্য শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে। ব্রিটেন থেকে যাবে ইউরোপে একটি তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসাবে, ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে তার কোনও প্রভাব থাকবে না।

এখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো, তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া অক্ষশক্তিসমূহের সাধ্যের মধ্যে এবং ভারতের পক্ষে সে কাজে সাহায্য করা সম্ভব। এ-কথা বলার দরকার করে না যে, ভারত দেখতে চায় সাম্রাজ্যের খণ্ডীকরণ, কেননা আমরা মনে করি আধুনিক ইতিহাসের এটি সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

৩. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের গুরুত্ব

ভারত তার বিশাল জনসংখ্যা, অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তার এমন সব সম্পদ যার সন্ধান এখনও হয়তো পাওয়া যায়নি, এই সবের কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাথার মণি এবং অতীতে ভারতকে শোষণ করেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তা হলেও একথা বলতেই হয় যে, এখনও পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানব সম্পদের এক ভগ্নাংশ মাত্র ব্যবহার করতে পেরেছে। সম্পূর্ণরূপে তার ব্যবহার করতে হলে লোককে অধিকতর শিক্ষিত করা এবং দেশকে অধিকতর শিল্পসমৃদ্ধ করা দরকার হত, যা এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করতে পারেনি। বর্তমান যুদ্ধে আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সাম্রাজ্যের যে সব অংশ যথা আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যতখানি নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তা করেছে এবং যত দিন যাচ্ছে তারা নিজেদের স্বার্থে ভারতকে ক্রমশই আরও বেশি শোষণ করতে চেষ্টা করছে। কোনও কোনও ভারতবাসী একটা সময়ে ভুল করে মনে করেছিলেন, ইউরোপে যত তাদের অবস্থা খারাপ হবে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতের ওপর তাদের মুষ্টি তত শিথিল করবে এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের দাবি পূরণ করবে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটেছে। এখন আমরা দেখছি স্বাধীনতার জন্য ভারতের দাবির সম্পর্কে ব্রিটিশদের মনোভাব যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আরও কঠোর হয়েছে। উপরন্তু ব্রিটিশ শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে সে দেশকে শোষণ করবার জন্য এবং জামসেদপুরের টাটা ইস্পাত কারখানা, মহীশূরের ইস্পাত কারখানা, সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানি প্রভৃতির মতো বিশাল বিশাল কোম্পানি যাঁরা চালান, সেইসব ব্রিটিশদের প্রতি অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন শিল্পপতিদেরও অর্থনৈতিক শোষণের নতুন পরিকল্পনায় অংশীদার করা হয়নি। অতএব আজ ভারতে ব্রিটিশনীতির দিকে যদি আমরা তাকাই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, ব্রিটেন ভারতকে নিজের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং ভারতীয়দের তাদের স্বাধীনতা কিংবা তাদের দেশকে শিল্পে বিকশিত করতে দেবে না।

কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে গ্রেট ব্রিটেন যদি কোনও উপায়ে, বর্তমান যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও তার সাম্রাজ্যের ভেঙে যাওয়া আটকাতে পারে, তা হলে সে নিশ্বাস ফেলবার

সময় পাবে ও ভারতের বিপুল সম্পদের ব্যবহার করে আবার চেষ্টা করবে যুদ্ধের পর যে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে, তাকে বিনষ্ট করার।

ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটেনের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো অসম্ভব করবে, এবং ভারত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে প্রভূত সাহায্য করতে পারে গ্রেট ব্রিটেনের পতনে।

৪. বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ কূটনীতির কয়েকটি দিক

ব্রিটিশ কূটনীতির একটি বিশেষ নীতি, যখন যে কর্তৃপক্ষ তার নিজের স্বার্থের জন্যেই যুদ্ধ করছে, তখন এমন একটা ভাব দেখায় যেন তার সে-কাজের পিছনে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। বিশ্বযুদ্ধে আমরা দেখেছি, গ্রেট ব্রিটেন যেন ছোট ছোট জাতির রক্ষাকর্তা। আবার এখন সেই একই জিনিস দেখছি। বর্তমানে ছোট জাতিগুলোর সহায়কের ভূমিকা পালনের জন্য সে উদার হস্তে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ইত্যাদি থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। এইসব শরণার্থীরা, যেমন বেনেস সিকোসি, নরওয়ের রাজা, হল্যান্ডের রানি, ফ্রান্সের দ্য গল প্রভৃতিকে স্বাধীন গভর্নমেন্ট নামে লন্ডনে তাদের নিজেদের গভর্নমেন্ট স্থাপন করতে দেওয়া হচ্ছে। সেইসব গভর্নমেন্টকে বিশেষ আইন পাশ করে স্বাধীন গভর্নমেন্টের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের সকলকে যদি নাও হয়, অধিকাংশকে ব্রিটিশদের অর্থে চালানো হচ্ছে। এই চাতুরীর দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীকে দেখাবার চেষ্টা করছে যে, তারা বাস্তবিকই ছোট ছোট জাতির সহায়।

অক্ষশক্তিসমূহও একই নীতি অবলম্বন করে ইংল্যান্ডকে তার নিজের অস্ত্রেই ঘায়েল করবার চেষ্টা কেন করবে না? অনেক জাতি আছে যারা ব্রিটেনের অধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি এবং সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম করছে। ইউরোপের অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে সেইসব পরাধীন দেশের প্রতিনিধিরা অনায়াসে তাঁদের গভর্নমেন্ট স্থাপন করতে পারেন। যে ভাবে তাঁরা একদিকে ব্রিটিশ প্রচারের জবাব দিতে পারেন, আরেক দিকে নিজের নিজের দেশে বিপ্লবে সহায়তা করতে পারেন। অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে এ কাজ সহজেই করা যায়।

৫. ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধে ভারতীয়দের মনোভাবের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধে তাদের মনোভাব

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রচার অত্যন্ত সফল হয়েছিল; সে দেশে জার্মানির প্রচারের অতি সামান্য অংশই পৌঁছত। সেই কারণে দেশবাসীর প্রকৃত ইচ্ছা যদিও ছিল ইংল্যান্ড যুদ্ধে পরাজিত হোক, তবুও এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে মিত্রশক্তি অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং নিঃসন্দেহে জয়লাভ করবে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতে প্রবীণ নেতাদের অনেকে ব্রিটেনের যুদ্ধে তাকে নৈতিক সমর্থন দিতে সম্মত হয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন ভারতে পনেরো লক্ষ সৈনিক সংগ্রহ করতে পেয়েছিল এবং যুদ্ধে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন লাভ করেছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ১৯১৪-১৮-র পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে তাদের প্রচার ব্যর্থ হয়েছে, এবং এইবার ব্রিটেন জয়ী হতে পারে, কেউ কল্পনাও করতে পারছে না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কয়েক বছর ধরে নিয়মিত যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে



সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে পৌঁছনোর পর, এপ্রিল ১৯৪১।

different individuals and
organisations claim to be
Leftist, how are we to decide
who are — and who are not —
genuine Leftists?

In the present political
phase of Indian life,
Leftism means Anti-Imperi-
alism. A genuine anti-
imperialist is one who
believes in undiluted Independence
(not Mahatma Gandhi's substance of
Independence) as the political
objective and in uncompromising
national struggle as the means
for attaining it. After the attain-
ment of political independence,
Leftism will mean Socialism and
the task before the people will
then be the reconstruction of
national life on a socialist
basis. Socialism or socialist

কাবুল প্রস্তাব-এর একটি পৃষ্ঠা।



সুভাষচন্দ্র বসু 'অরল্যান্ডো মাৎসোটা' ছদ্মনামে নিজের টেবিলে কর্মরত।



ইউরোপে ইন্ডিয়ান লিজন-এর প্রথম অফিসারদের কর্পস-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু।



সুভাষচন্দ্র বসু, বার্লিন ১৯৪২



নিজের ডেস্কে সুভাষচন্দ্র বসু, বার্লিন ১৯৪২



১৯৪২-এ হাজরেট ইলো-জার্মান ফেডারিশন মোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মুভাষচন্দ্র বসু তাষণ দিচ্ছেন।



বার্লিনে নিজের বাড়ির বাগানে।



সুভাষচন্দ্র বসু আবিদ হাসানের সঙ্গে সাবমেরিনে।

যাচ্ছে, যার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই। তার ওপরে বেতারযোগে জার্মান প্রচার ভারতে পৌঁছোচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর যোগফল হল, এবার ভারতের মতো দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে সমস্ত আর্থিক প্রলোভন সত্ত্বেও এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের লেগেছে পনেরো মাস। এমনকী তারাও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি অনুগত থাকবে না! এবার ভারত থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে সেটা ১৯১৪-১৮ সালে যা পেয়েছিল তার এক ভগ্নাংশ মাত্র। এবং সেই অর্থও দান করেছেন প্রধানত ভারতের ব্রিটিশ শিল্পপতি এবং মহারাজরা। জনসাধারণের দান প্রায় কিছুই নয়। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে জুন ১৯৪০-এর মধ্যে আমি দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রায় এক হাজার বক্তৃতা দিয়েছি। সেইসব সভায় আমি সরাসরি জনগণকে জিজ্ঞাসা করেছি, এবার তারা ব্রিটিশের পরাজয় চায় কি না। প্রত্যেকটি সভায় তারা সাগ্রহে ঘোষণা করেছে যে, তারা দেখতে চায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন, যাতে ভারত স্বাধীন হতে পারে।

৬. আজ ভারতে সামরিক অবস্থা

গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি ভারতীয়রা যুদ্ধের শুরু থেকেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। তাদের মনোভাব আরও বিষাক্ত হয়েছে প্রত্যেক প্রদেশে অধিকাংশ নেতা ও তাদের হাজার হাজার অনুগামীদের গ্রেপ্তারের ফলে। ভারতে ব্রিটেনের নীতির যুদ্ধ চলাকালে কোনও পরিবর্তনের আশা না থাকায়, নিঃসন্দেহে যতদিন যাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতবাসীদের ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ব্রিটেন এখন ভারতকে তরোয়ালের আগায় ধরে রেখেছে। কিন্তু সামরিক দিক থেকেও, বাইরে থেকে দেখলে যতটা মনে হয়, ব্রিটিশদের অবস্থা ততটা দৃঢ় নয়, সজোরে একটি আঘাত বাইরে থেকে এলেই ভারতে তাদের ঘরটি ভেঙে পড়বে।

ভারতে সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা, সশস্ত্র পুলিশ এবং টেরিটোরিয়ানদের তার সঙ্গে ধরলে আনুমানিক ২৫০,০০০। যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে বিদেশে কাজ করবার জন্য ১০০,০০০ মানুষকে নিকট প্রাচ্যে, মধ্য প্রাচ্যে এবং দূর প্রাচ্যে পাঠানো হয়েছে। তাদের অভাব পূরণ করবার জন্য আরও ১০০,০০০ সৈন্যকে নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁদের সংগ্রহ করতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের লেগেছে পনেরো মাস। এখন গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা, যুদ্ধের সময়ে কাজের জন্য আরও ৫০০,০০০ সৈন্য নিযুক্ত করা। কিন্তু সেই সংখ্যার একটি ভগ্নাংশও গভর্নমেন্ট সংগ্রহ করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

এই ২৫০,০০০-র মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা আধা সৈনিকদের ধরলে ৭০,০০০, ভারতীয় সৈনিকদের সংখ্যা আনুমানিক ১,৮০,০০০ কিন্তু তাদের অফিসারেরা ব্রিটিশ। ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ভারতীয় অফিসারের শতকরা সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যেমন বিমান, ট্যাঙ্ক, আরমার্ড কার, মোটর কার, যান্ত্রিক পরিবহণ, ভারী কামান ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত যদিও তার সংখ্যা অল্প। এখনও পর্যন্ত দেশকে দমিয়ে রাখতে সেই সংখ্যা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি আধুনিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে সেটা যথেষ্ট হবে না।

রাইফেল, ক্ষুদ্র গুলিগোলা, বিস্ফোরক এখন ভারতেই প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, যথা বিমান, ট্যাঙ্ক, আরমার্ড কার, মোটর কার, লরি, ভারী কামান ইত্যাদি সব

আমদানি করা হয়। বিগত কয়েক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে বোমা ইত্যাদি মজুত করবার জন্য ভূগর্ভস্থ বড় বড় আশ্রয় নির্মাণ করছে।

ভারতে সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অংশ যার সংখ্যা ৭০,০০০-এর বেশি নয়, সেটাই ভারতে একমাত্র অনুগত বাহিনী যার ওপরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে। সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আছে যারা ব্রিটিশ- বিরোধী এবং একমাত্র যে গোষ্ঠীটি অনুগত থাকবে তারা হল পঞ্জাবি মুসলিম। পঞ্জাবি শিখ, যারা ভারতীয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বর্তমানে তারা সবচেয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী। যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে পঞ্জাবি শিখের অনেক রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের কোর্টমার্শাল করা হয়েছে।

সে-কথা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কেন না যাদের গুলি করে মারা হয়নি, তাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে। ১৯৪০-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর আমি যে-জেলে বন্দি ছিলাম, প্রেসিডেন্সি জেল, সেখানে তারাও ছিল।

আগেই বলেছি ভারতে ব্রিটিশদের মান-সম্মান বর্তমান যুদ্ধে অনেকবার পরাজয়ের পর ভেঙে পড়েছে। বস্তুত জুন ১৯৪০-এ ফ্রান্সের পতনের পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশদের সামরিক শক্তির ওপর আস্থার অভাব ছিল। তাদের মানসিক অবস্থার দিক থেকে সেটাই ছিল বিপ্লবের সঠিক সময়। কিন্তু ভারতীয়রা তার সুযোগ নেয়নি। সে-রকম সময় আবার আসবে, যখন অক্ষশক্তিদের হাতে ব্রিটিশেরা আরেকটি প্রচণ্ড আঘাত পাবে।

আগের মতো সুযোগ এলে এবং তার সদ্ব্যবহার করা হলে সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানো যায়, বাহিনীতে ব্রিটিশ অফিসার থাকা সত্ত্বেও।

সেই বৈপ্লবিক সংকটের সময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একমাত্র ব্রিটিশ সৈনিক ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর করতে পারবে না। সেই শুভক্ষণটিতে যদি বাইরে থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় (যেমন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সহ ৫০,০০০ সৈনিকের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী), তা হলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়।

৭. ভারতের পক্ষে দূরপ্রাচ্যে জাপানি বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পতন ঘটানোয় তার শেষ পর্যায়ে এসে দূর প্রাচ্যে জাপানি বৈদেশিক নীতি বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে। জাপান যদি মনে করে দক্ষিণ দিকে নিজেদের অধিকার প্রসারিত করবে, তাতে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষ বাধবে। তখন যদি যুদ্ধ বাধে, নিশ্চিত মনে হয়, ইস্ট ইন্ডিয়া ও দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌবহর বর্তমান অবস্থায় জাপানি নৌবহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। এমনকী আমেরিকাও যদি ব্রিটিশ নৌবহরকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, আশা করা যায় জাপান তবুও জিতবে। দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ নৌবহরের পরাজয় তাদের সিঙ্গাপুরের ঘাঁটির চূর্ণ হয়ে যাওয়া সহ, স্বতঃই ভারতে ব্রিটেনের সামরিক শক্তি ও আজাদকে ক্ষুণ্ণ করবে। সেই কারণে দূর প্রাচ্যে কী ঘটে সে-বিষয়ে ভারত অতিশয় আগ্রহী এবং যেহেতু দক্ষিণদিকে জাপানের ক্ষমতার বিস্তারের জন্য প্রয়োজন সোভিয়েতের সঙ্গে জাপানের পূর্বাহ্ণেই একটা বোঝাপড়া, ভারত আন্তরিকভাবে আগ্রহী একটি চুক্তিতে, যার দ্বারা এক দিকে চিনের ব্যাপারে একটা মীমাংসা হবে, আরেক দিকে জাপান আরও অবাধে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

৫

জার্মান গভর্নমেন্টের প্রতি অতিরিক্ত স্মারকলিপি

বার্লিন, ৩ মে ১৯৪১

উত্তর আফ্রিকায়, যুগোশ্লাভিয়ায় এবং গ্রিসে জার্মানির কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ সমস্ত প্রাচ্য দেশে, এবং নিকট প্রাচ্যের মিশর, প্যালেস্টাইন এবং ইরাকের মতো দেশে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। ওই সমস্ত দেশে ব্রিটেনের মর্যাদা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবং সকলেই জানে, আজ পর্যন্ত ব্রিটেন প্রাচ্য দেশগুলিতে আধিপত্য করেছে, একটি বিশ্বশক্তি হিসাবে তার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেনের মর্যাদা হানির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রাচ্য দেশ গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী হিসাবে নিজেদের অবস্থান জোর দিয়ে ব্যক্ত করেছে।

১. এই বিরোধিতা স্পষ্ট দেখা গেছে ইরাকে।

২. ভারত থেকে প্রতিদিন নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অশান্তির খবর আসছে।

৩. মিশরে অনেকদিন চুপ করে থাকার পর ওয়াকফ পার্টি সোচ্চারে দাবি করছে যে মিশরের অধিবাসীরা জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধে যেন যোগ না দেয়।

৪. প্যালেস্টাইনের মতো অন্যান্য দেশে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটি প্রবল চোরা স্রোত বইছে যা একটি খোলাখুলি বিদ্রোহের আকার নিতে পারে।

এই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে অক্ষশক্তিরা সমগ্র প্রাচ্যের কল্পনায় স্থান করে নিতে পারে, প্রাচ্য সম্পর্কে, বিশেষ করে ভারত এবং আরব দেশগুলি সম্পর্কে, তাদের নীতি খোলাখুলি ঘোষণা করে। শেষোক্ত দেশগুলি ব্রিটেনকে ঘৃণা করে কারণ সে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং অক্ষশক্তিদের বৃত্তের মধ্যে তাদের নিয়ে আসা যায়, যদি তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় যে অক্ষশক্তিসমূহ ব্রিটিশ অধীনতা থেকে তাদের মুক্ত করার সপক্ষে দাঁড়াবে। এমনকী বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যেসব দেশে সোভিয়েত দেশের প্রতি প্রচুর বন্ধুত্বের অনুভূতি ছিল (যেমন ভারত) এখন সবাই বুঝতে পারছে অক্ষশক্তিরাই (ব্রিটেন নয়) ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাদের সংগ্রামে কার্যকর সহায়তা করতে পারে।

অতএব আমার অনুরোধ:

১) ভারত এবং আরব দেশগুলির স্বাধীনতা সম্পর্কে অবিলম্বে ঘোষণা করা হোক।

২) সেইসব দেশে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করায় কাজ যত শীঘ্র

সম্ভব শুরু করা হোক, যাতে ওই সমস্ত দেশের বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতির যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যায়।

৩) অক্ষশক্তিসমূহ এখন জোর দিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মর্মস্থলে অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ওপর আক্রমণ করার বিষয়টিতে।

৪) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ওপর আক্রমণের সুবিধার জন্য আফগানিস্তানের বর্তমান ব্রিটিশ-বন্ধু সরকারকে উৎখাত করার ব্যবস্থা করা হল।

৫) ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইরাককে সামরিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হোক।

এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হয় এবং অক্ষশক্তিসমূহ প্রস্তাবিত কাজ করে, জার্মানির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি হবে:

ক) উত্তর আফ্রিকা থেকে একেবারে দূর প্রাচ্যে জাপান পর্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন, জার্মানি-সমর্থক রাষ্ট্রের এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খল রচিত হবে।

খ) ভবিষ্যতে যদি এক দিকে জার্মানি এবং আরেকদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হলে সমস্ত প্রাচ্য দেশের সহানুভূতি জার্মানি লাভ করবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তুরস্ক অথবা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটি সংঘর্ষ ভবিষ্যতে অনিবার্য হয়ে ওঠে, জার্মানি সমস্ত প্রাচ্য দেশের সহানুভূতি হারাবে, যে সহানুভূতি সে পেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার যুদ্ধের জন্য।

নিকট প্রাচ্য এবং মধ্য প্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ শক্তি এবং প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করার প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় তার জন্য প্রয়োজন জার্মানি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ওপর আঘাত হানতে গেলে প্রয়োজন এক দিকে জার্মানি এবং আরেক দিকে আফগানিস্তানের মধ্যে কোনও যোগস্তম্ভ। তার চারটি সম্ভাব্য পথ আছে বলে মনে হয় এবং বিশেষজ্ঞদের (সামরিক ও রাজনৈতিক) ঠিক করতে হবে কোন পথটি তাঁরা সর্বাপেক্ষা কার্যোপোযোগী বলে বেছে নেবেন।

পথ ১. জার্মানি, রাশিয়া, আফগানিস্তান, ভারত।
পথ ২. বল্কান উপদ্বীপ, তুরস্ক (সিরিয়া?), ইরাক, পারস্য উপসাগর এবং ভারত।
পথ ৩. বল্কান, তুরস্ক (সিরিয়া ও ইরাক?) পারস্য, আফগানিস্তান এবং ভারত।
পথ ৪. লিবিয়া, মিশর, সুয়েজ প্রণালী এবং ভারত।

সুবিধার দিক থেকে পথ ১ই মনে হয় সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

যাই হোক, এক দিকে জার্মানি এবং আরেক দিকে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া অথবা তুরস্কে অপ্রত্যক্ষ সাহায্য প্রয়োজন।

যোগসূত্র একবার স্থাপিত হলে জার্মানির পক্ষে আফগানিস্তান ও ভারতে ব্রিটিশের শক্তি

ও প্রভাবের ওপর আঘাত হানা সহজ হবে। তখন অবসান হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের।

সুভাষচন্দ্র বসু
৩.৫.৪১

পুনশ্চ: ওপরের মন্তব্য লেখা হওয়ার পর বার্লিনের সংবাদপত্র এবং বেতার খবর দিল ইরাকে ব্রিটিশ এবং ইরাকীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। এর প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সমস্ত প্রাচ্য দেশে, বিশেষত আরবদের মধ্যে। সেই কারণে জার্মানির প্রাচ্য সম্পর্কিত নীতি বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত এখনই গ্রহণ করা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই কারণে আমার অনুরোধ, অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, যাতে বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়ার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে করা যায়।

এর সঙ্গে প্রেরিত:

৩-৫-৪১ তারিখের B. Z. am Mittag থেকে একটি কাটা অংশ।

৬

ভারতের কমরেডদের উদ্দেশে গোপন বার্তা[১]

মে ১৯৪১

আন্তর্জাতিক রাজনীতির জগতে শীঘ্রই বড় বড় ঘটনা ঘটবে, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটানোর সুবিধা হবে। অতএব সময় এসেছে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে প্রাচ্য দেশসমূহে ব্যাপক প্রচার এবং কর্মতৎপরতার। সে-কাজে ভারতীয়দের অনেক অবদান থাকতে পারে, তবে তাদের কথা বলতে হবে এবং কাজ করতে হবে স্বাধীন ভারতের নামে। আমি অক্ষশক্তিসমূহের কাছ থেকে এক পক্ষকালের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ঘোষণা আশা করছি। সেই ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রচার এবং কাজ আরম্ভ করতে চাই স্বাধীন-ভারত আন্দোলনের নামে, যার মধ্যে থাকবে বেতার প্রচার। আমার প্রত্যাশা, অক্ষশক্তিদের প্রচারে তারা বলবে, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান কী হবে, ভারতীয়রা তা ঠিক করবে।

আমার প্রচারে আমি দল-সম্পর্কিত প্রশ্ন পরিহার করব। শুধু ভারতীয়দের প্রতি আবেদন করব তারা যেন তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এবং সমস্ত বন্ধু-দেশের সহায়তা গ্রহণ করে।

আমার মতে আমার খোলাখুলি প্রচারের সুফল তার কুফলের চেয়ে বেশি হবে, যদি কুফল আদৌ কিছু হয়। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে অক্ষশক্তিসমূহের ঘোষণার পরেও যদি আমার খোলাখুলি প্রচার আরম্ভ করা সম্পর্কে আপনাদের কোনও আপত্তি থাকে, দয়া করে ভারতে ফিরে যান, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং কাবুলে ফিরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করুন। এ বিষয়ে কলকাতায় শরৎ বসুর সঙ্গে পরামর্শ করা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য যদি আপনারা মনে করেন অক্ষশক্তিসমূহের ঘোষণার পরে আমার প্রচার আরম্ভ করা উচিত, তা হলে আমাকে এখনই জানান।

ভারতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন তাঁদের নাম দয়া করে আমাকে জানান। ব্যক্তিগত চিঠিগুলো ও দীর্ঘ প্রবন্ধটি কি শরৎ বসুকে দিয়েছেন? কী কারণে আমি ভারত ত্যাগ করেছি তা জানিয়ে আমি যে বিবৃতিটি আপনার সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম, আমাদের দল কি সেটি প্রকাশ করেছে? আড্ডা সাহেবে মৌলানার সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি কি সক্রিয়ভাবে আমাদের সাহায্য করবেন? এরপর আপনি যখন ভারতে যাবেন, ব্যবস্থা করুন যেন মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে এবং বোম্বাইয়ে, আমাদের দলের সদস্যদের কাছে দূত পাঠানো হয়, যাতে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে একই লাইনে তাঁরা কাজ করেন।

---

১. এই গোপন বার্তাটি নেতাজি কাবুলে ১৯৪১-এর মে মাসে পাঠিয়েছিলেন। Mr. Quaroni, সেখানকার দূতাবাসের একজন কূটনীতিক, শরৎচন্দ্র বসুকে দিয়েছিলেন, প্যারিসে ১৯৪৮-এ তাদের যখন দেখা হয়েছিল।

শার্দূল সিং কবিশের যেন বিশ্বাস করেন, আপনি আমার এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন, সেটা অত্যন্ত জরুরি। আপনি সহজেই তাঁকে সেটা বিশ্বাস করাতে পারেন কলকাতায় আমাদের বন্ধুদের সাহায্যে কিংবা আকবর শাহের মাধ্যমে।

সর্দার শার্দূল সিং কবিশেরকে দয়া করে অনুরোধ করবেন অহরর পার্টি, জমিয়ত উলিমা এবং অকালি পার্টির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ বজায় রাখতে। আমাদের মতাদর্শগত মতভেদ থাকলেও অকালিদের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য থাকা দরকার। সর্দার সিংকে আমাদের প্রয়োজন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। শরৎ বসু তাঁকে ঠিকভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন।

একটি নেপালি গোষ্ঠী সংগঠিত করুন, ভারতে নেপালি সৈন্যদের মধ্যে কাজ করার জন্য এবং নেপালে গিয়ে সেখানে গোপন কার্যকলাপের জন্য। কলকাতার বন্ধুরা দার্জিলিং থেকে নেপালি সরবরাহ করতে পারবেন। নতুন জার্মান বাণিজ্যিক অ্যাটাশে এক সপ্তাহের মধ্যে কাবুলে পৌঁছোবেন এবং নেপাল সম্পর্কে তিনি পরামর্শ দেবেন। সেখানে তিনি অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

কলকাতার বন্ধুদের বলবেন ব্রহ্মদেশে দূত পাঠাতে, ডোবামা এবং সেখানকার অন্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাকে সঠিক তথ্য এনে দিতে।

সামরিক গোয়েন্দাগিরি সংগঠিত করুন, শুধু সীমান্ত অঞ্চলে এবং পঞ্জাবে নয়, ভারতের সমস্ত সামরিক ঘাঁটিতে। যে সব তথ্য আগেই সংগৃহীত হয়েছে, সব কাবুলে নিয়ে আসতে হবে এবং সেখানে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যায়।

সীমান্তে সৈন্যবাহিনীর ধর্ম ও প্রদেশ অনুযায়ী গঠন এবং তারা পদাতিক না অশ্বারোহী না গোলন্দাজ, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করুন।

উপজাতীয় অঞ্চলে বিমানপোতের উপযোগী জমি পাওয়া যায় কিনা আপনি কি তা খোঁজ করেছেন? যদি না করে থাকেন, এখনই করুন। আরও ভেবে দেখুন, সেখানে পেট্রল কীভাবে নিয়ে আসা যায়, এবং কোথা থেকে।

আমার উদ্দেশ্য বন্ধু-ভাবাপন্ন উপজাতীয়দের অঞ্চলে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা ভারতীয়দের বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য।

বৃহৎ আকারে ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করবার জন্য সমস্ত ব্রিটিশ- বিরোধী উপজাতি-নেতাদের নিয়ে একটা বড় জিরগা সংগঠনের কোনওদিন কি চেষ্টা করেছেন?

কাবুল ও পেশোয়ার এবং পেশোয়ার ও কলিকাতার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য বিশ্বস্ত সংবাদ-বাহকের ব্যবস্থা করুন, যাঁরা সদাসর্বদা তথ্য ও নির্দেশাবলি নিয়ে যাওয়া-আসা করবেন। প্রথম কয়েক মাস আপনি নিজেই মাসে একবার কাবুলে আসবেন। হঠাৎ যদি আপনি গ্রেপ্তার হন, সেজন্য আপনি আপনার স্থান গ্রহণের জন্য একজন সংযোগ-রক্ষাকারীর ব্যবস্থা করুন। আপনি কি কাবুলে ভারত থেকে আগত বন্ধুদের থাকবার জন্য জায়গা ঠিক করেছেন? কাবুলে এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে সেখান থেকে চোরাপথে ইউরোপীয়দের উপজাতীয় অঞ্চলে পাঠানো যায়। সেই উদ্দেশ্যে এবং অন্য কাজের জন্য কাবুলে গাড়ি ও লরির ব্যবস্থা করবেন। আমরা জুন মাস থেকে ভারতের জন্য সাহায্য পাঠাতে আরম্ভ করতে পারি। উপজাতীয় অঞ্চলের জন্য আমি রেডিয়ো ট্রান্সমিটার পাঠাবার চেষ্টা করছি। আমরা

প্রচার-ইস্তাহার ও পুস্তিকাও পাঠাতে পারি। এসব জিনিস, অন্তর্ঘাতের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং অন্যান্য জিনিসও কাবুল থেকে ভারতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

উপজাতীয় অঞ্চলের জন্য কিংবা ভারতের জন্য সাইক্লোস্টাইল করার কিংবা ডুপ্লিকেট করার মেশিন কিংবা ছোট ছাপার মেশিন কি আপনি চান?

উপজাতীয় অঞ্চলের জন্য এবং ভারতের জন্য আপনি কী অস্ত্রশস্ত্র চান? উপজাতীয় অঞ্চলে প্রস্তুত অস্ত্রশস্ত্র, যা আমরা কিনতে পারি, তার পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পর্কে কি আপনি খোঁজ-খবর করেছেন?

বার্লিন ও রোম থেকে কি পুশতু ভাষায় রেডিয়ো প্রচারের প্রয়োজন আছে?

দয়া করে ইঙ্গ-ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয়দের বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ভারত থেকে খবর আনবেন।

আপনার যদি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য লোক থাকে, তাদের কিছু সংখ্যককে ব্রিটিশরা যে সৈন্যবাহিনী ভারতে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন, যাতে তারা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে কাজ করতে পারে। তাদের নির্বাচন করতে বিশেষ যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

উত্তম চাঁদ কি ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন?

সোধি এখন কোথায় আছেন? তাঁকে উপজাতীয় অঞ্চলে কাজ করার জন্য রাখবেন। কাবুল ছাড়বার আগে উপজাতীয় অঞ্চলে এবং ভারতে আপনার সর্বশেষ সফরের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাবেন।

আমার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ ও তার বিভিন্ন সাব-কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আসবেন। আপনি সে-সব বোম্বাইয়ের অফিসে পাবেন।

দয়া করে যে কাজ আপনারা ভারতে এবং উপজাতীয় অঞ্চলে করতে চান একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে, সম্ভব হলে তার সময়-সারণি এবং তার একটি পরিকল্পনা পাঠান। সে কাজের জন্য এখান থেকে আপনারা কী সাহায্য চান? সে পরিকল্পনা যদি এখন পাঠাতে না পারেন, ভারতে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠান।

আপনি কাবুল থেকে গেলে, উপজাতীয় অঞ্চলে এবং ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাবেন এবং এক মাস পরে ফিরে আসবেন।

সঙ্গে প্রয়োজনমতো টাকা নিয়ে কাবুল যাবেন। কিন্তু খরচ করবেন হিসাব করে।

৭

স্বাধীন ভারতের ঘোষণার খসড়া

"Mazzota", মে ১৯৪১[১]

ভারত সম্পর্কে নিজেদের নীতি পরিষ্কার করে জানাতে the Government of Great Germany নিম্নলিখিত ঘোষণা করছে:

ভারত, যার সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতি প্রাচীন, যা সে আজ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছে, চিরদিন জার্মানি জাতির কল্পনাকে মুগ্ধ করে এসেছে এবং সবাই জানে জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন চিরদিনই ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবে জার্মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতার শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির জন্য ভারতের সংগ্রাম গভীর আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করবে। জার্মানি এখন আরও এগিয়ে গিয়ে বলতে পারে, ভারতীয় জাতির ভারতের ওপর স্বত্বাধিকার এবং ভারতের নিয়তির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌম ও চূড়ান্ত। সে অধিকার একটি বিদেশি শক্তি আত্মসাৎ করলেই তা লোপ পেয়ে যাবে, কখনই তা হয়নি, কখনও হতে পারে না। অতএব জার্মানি স্বীকার করে ভারতবাসীদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অ-হস্তান্তরযোগ্য অধিকার, তাদের কষ্টস্বীকারের ফল ভোগ করবার এবং জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন তা পাওয়ার অধিকার, যাতে তারা বিকশিত হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। জার্মানি ভারতবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, যে নতুন ব্যবস্থা বিশ্বে চালু করতে চলেছে তার ফলে ভারত স্বাধীন হবে।

এ বিষয়ে জার্মানি নিশ্চিত যে, ভারতীয়রা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করবে, নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবে, তখন জাতীয় জীবনে তারা সর্বতোমুখী নবজাগরণ আনবে এবং সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে অবদান জোগাতে পারবে।

বলাবাহুল্য ভারতবাসীরাই ঠিক করবে তারা স্বাধীনতা লাভ করলে কীরকম গভর্নমেন্ট তাদের হবে। তাদেরই কাজ হবে, তাদের সংবিধান রচনা করবে কোনও গণপরিষদ, জননেতাগণ না অন্য কোনও সংস্থা— সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তবে এইটাই স্বাভাবিক যে জার্মানি তার ঐতিহ্য অনুযায়ী চাইবে ভারত হোক একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি, যার প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিশ্চয়তা থাকবে খাদ্যের, কর্মের, জীবনের প্রয়োজনীয় যা কিছু তার, ধর্ম, শ্রেণী অথবা অন্য কোনও পার্থক্য-নির্বিশেষে বেড়ে ওঠার সমান অধিকার। ভারতবাসীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে জার্মানি তার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং ঘোষণা করছে, নিজের সাধ্যমতো সমস্ত প্রকার সাহায্য সে ভারতবাসীদের দেবে, যাতে স্বাধীনতার লক্ষ্যে তারা অবিলম্বে পৌঁছতে পারে। এখন জার্মানি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছে যে দিন ভারত পাবে তার নিজস্ব জাতীয় সরকার। জার্মানি সানন্দে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেবে এবং তার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে।

---

১. ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সংবলিত এই ঘোষণা সুভাষচন্দ্র বসু রচনা করেছিলেন ১৯৪১-এর মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে। সূত্র: AA-A/ Kult. R., vol. 8, England (German Foreign Office)

৮

এক নিরানন্দ পরিস্থিতি

জার্মান বিদেশ মন্ত্রণালয়ের Dr. Woermann-এর প্রতি পত্র, ৫ জুলাই ১৯৪১

প্রিয় Dr. Woermann

আপনার ২৪ জুনের পত্র, যেটি আমার হাতে পৌঁছয় ২৮ জুন, তার জন্য এবং তার বিষয়বস্তুর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

Count Ciano-র ইচ্ছানুসারে আমি ভেনিস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই কথাবার্তা আমার পক্ষে উৎসাহজনক হয়নি এবং তার অল্পদিন পরেই পূর্বদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল বলে মনে হয় এবং আমার মনে হচ্ছিল শীঘ্র বার্লিনে ফিরে গেলে বিশেষ কোনও কাজ হবে না। যতদিন না পূর্বের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সেই কারণে আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশি হলাম।

আমি বিদেশ মন্ত্রককে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাব বলে ঠিক করেছি। মঙ্গলবার ১৮ তারিখ আমি ভিয়েনা রওনা হবার ব্যবস্থা করেছি। কয়েকদিন আমি ভিয়েনার গ্র্যান্ড হোটেলে থাকব এবং বার্লিনে পৌঁছোব, খুব বেশি দেরি হলেও, সোমবার ১৪ তারিখ। আপনি যদি চান, ভিয়েনায় অতদিন না থেকে আমি সোজা বার্লিন চলে যেতে পারি। তাই দয়া করে আমাকে সেই মর্মে একটি বার্তা পাঠান গ্র্যান্ড হোটেলে কিংবা Konaorzialrat Otto Faltis, Wein I, Tuchiauben, 7a/19, Telephone: U 21-1-80, এখানে।

পূর্বে যে নতুন পরিস্থিতি, তার সম্পর্কে আপনার গভর্নমেন্টের প্রতি আমার দেশের প্রতিক্রিয়া অনুকূল নয়। যাই হোক, আমি যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং আমি পৌঁছেই সমস্ত বিষয়টি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার

O. Mazzotta

৯

রুশ-জার্মান যুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৭ জুলাই ১৯৪১-এর জার্মান বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ[১]

মি. বসু তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

প্রথমে আমি তাঁকে জানাই সেক্রেটারি অফ স্টেট কেপলার-কে কী কাজ দেওয়া হয়েছিল, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মি. বসু মি. কেপলার-এর সঙ্গে দেখা করেন।

প্রথমে মি. বসু ভারতের জনমতের ওপর রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দেন। ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়ন জনপ্রিয়, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, যাঁদের মধ্য থেকে নেতারা আসেন। ভারতে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি এবং সেই কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের বন্ধু হবে। ১৯৩৯-এর রুশ-জার্মান চুক্তি ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। সেই ঘটনার ফলে বুদ্ধিজীবী, নাৎসিদের প্রতি যাঁরা এমনিতেই আকৃষ্ট, তাঁদের পক্ষে মনে করা সম্ভব হল, জার্মান এবং ইতালিয়ানরা এমন দুই শক্তি যাঁরা সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুতাবশত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে, যদিও ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রচার অক্ষশক্তিসমূহের প্রতি শত্রুতার মনোভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধে ভারতবাসীদের সহানুভূতি স্পষ্টতই ছিল রাশিয়ার দিকে, কারণ ভারতবাসীরা সুনিশ্চিতভাবে মনে করত জার্মানি ছিল আক্রমণকারী এবং রাশিয়া ছিল ভারতের পক্ষপাতী এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির সম্পূর্ণ জয়লাভ ব্যতীত এই বিষয়ে ভারতের জনমত পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হবে।

সেই সঙ্গে বসু মনে করেন, লন্ডন থেকে প্রাপ্ত খবরে এই ধারণা সমর্থিত হয় যে, ইংল্যান্ড প্রথম ভারতে সংস্কার আনবে, যার ফলে ভারতের জনমতের একটি অংশ, যাঁরা বরাবরই আপসের পক্ষপাতী, তাঁরা ইংল্যান্ডের পক্ষেই বাজি ধরবেন। একই সঙ্গে ভারতে জার্মান আক্রমণকে এমনভাবে দেখানো হবে যেন ভারতকে স্বাধীন করা উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনের জায়গায় জার্মান শাসনকে বসানো।

বসু মনে করেন, ভারত আগেকার চেয়ে অধিকতর মাত্রায় ব্রিটেনের সামরিক শক্তির প্রসারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। বসুর মতে, এরকম সম্ভাবনা খুব বেশি যে, ইংল্যান্ড আফগানিস্তান

---

১. রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে নেতাজি রোমে ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতিতে এই বৃহৎ নীতি পরিবর্তনে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়া জার্মান বিদেশ দপ্তরকে তিনি অবিলম্বে জানিয়ে দিলেন। বার্লিনে ফিরে এলে জার্মান বিদেশ দপ্তরের একজন সেক্রেটারি অফ স্টেট Herr Woermann-এর সঙ্গে তাঁর একটি আলোচনা হয়। নেতাজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ Herr Woermann জার্মান গভর্নমেন্টকে দিয়েছিলেন, এটি তার অনুবাদ।

দিয়ে নয়, পারস্য দিয়ে অগ্রসর হবে, যার উদ্দেশ্য প্রথমত, পেট্রোলিয়াম খনিগুলি দখল করা এবং তারপর ককেশাস অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছাকাছি আসা।

বসুর কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বার্লিন থেকে দূরে থাকার দরুন তিনি রুশ-জার্মান যুদ্ধের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত। অতএব আমাদের প্রথম কাজগুলির মধ্যে একটি হল, এ-বিষয়ে তাঁকে সঠিক ধারণা প্রদান করা।

আমি বসুকে জানিয়েছি, স্বাধীন ভারত সম্পর্কে আমাদের যে লক্ষ্য তাতে আমরা অবিচল, অবশ্য তার জন্য আমাদের উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।

এইখানে বসু অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, জার্মান বিদেশমন্ত্রীকে যেন অনুরোধ করা হয়, সে-ঘোষণা যত শীঘ্র সম্ভব করতে। এক-একটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে আর ইংল্যান্ডের সুবিধা বাড়ছে, ভারতে তারা যে সংস্কার আনতে চাইছে, তার কারণে। এই ঘোষণা স্থগিত রাখার তিনি কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। তবে তিনি এ-বিষয়ে একমত হন যে, তার জন্য সঠিক সময়টি ঠিক করতে হবে সমগ্র পরিস্থিতি ভালভাবে বিবেচনা করে।

এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে আমি অন্যান্য সামরিক প্রসঙ্গ নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছি, বিশেষত প্রস্তাবিত "স্বাধীন ভারত কেন্দ্র"-র বিষয় (Free India Centre)। তবে স্পষ্ট বোঝা গেল, বসুর সে-সব বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই, যতক্ষণ না স্বাধীন ভারতের বিষয়ে ঘোষণা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন।

আমি আপনাকে ১৩ জুলাই তারিখের জার্মান দূতাবাসের রিপোর্ট-এর দিকে এবং রোমে বসুর বিভিন্ন আলোচনার বিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের রিপোর্টের দিকে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করছি। আমি মনে করি, ৪ নং প্রস্তাব, যাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যখন উপযুক্ত সময় আসবে, ততদিন পর্যন্ত বসুকে কোনও নিরপেক্ষ দেশে সংরক্ষিত করা হোক,— সেটা অবিবেচনার কাজ হবে।

জার্মান বিদেশমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনার প্রস্তাব সেক্রেটারি অফ স্টেট কেপলার এবং আমি প্রস্তুত করছি।

WOERMANN

১০

এক শত্রুর পক্ষ থেকে প্রস্তাব

জার্মানির বিদেশমন্ত্রীকে প্রেরিত পত্র

ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop), ১৫ আগস্ট ১৯৪১

মান্যবর,

আপনার উদ্দেশে পত্র লেখা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হলেও আমি এই পত্র লিখতে বাধ্য হচ্ছি কারণ ভারতের পরিস্থিতি এখন অতিশয় সংকটজনক।

এপ্রিলের প্রথম থেকে আমি এখানে আছি, এবং আমি এখানে পৌঁছোবার অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রস্তাবগুলি আপনার সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

সেই সময়ে আমার দেশের পরিস্থিতি আমার প্রস্তাবসমূহের সাফল্যের পক্ষে যারপরনাই অনুকূলে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, জার্মান গভর্নমেন্ট কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, এবং তারপর থেকে ভারতের পরিস্থিতির প্রভূত অবনতি ঘটেছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াকে ভারতে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন সেটা পররাজ্য আক্রমণ, এবং সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রচারে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। দিনের পর দিন সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রচার-যন্ত্র ভারতবাসীদের জানাচ্ছে, জার্মানি বিশ্বে একাধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছে এবং প্রাচ্য বিশ্বে তারা একাধিপত্য করতে চায়। আমি দেখে শঙ্কিত, এই প্রচার ক্রমে কত কার্যকর হয়ে উঠছে।

গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁরা সারাজীবন ইংল্যান্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যয় করেছেন, বহু বছর কারাগারে কাটিয়েছেন, তাঁরাও এই প্রচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন এবং মনে করছেন, অক্ষশক্তিদের সাহায্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির যদি কোনও আশা না থাকে, যতদূর সম্ভব অনুকূল শর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করাই শ্রেয়। এইরকম অবস্থা যদি চলতে থাকে, অবিলম্বে এমন সময় আসবে, যখন অধিকাংশ ভারতবাসী নিশ্চিতভাবে সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকানদের পক্ষ অবলম্বন করবে। ভারতকে অক্ষশক্তিসমূহের দিকে নিয়ে আসবার আশা আমরা করতে পারি না যদি অক্ষশক্তিসমূহ প্রথমে ভারতের বিষয়ে তাদের নীতি ঘোষণা না করে।

ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সামরিক ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, দশ লক্ষের একটি বাহিনী ভারতে গড়ে উঠছে, সে দেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সামরিক সম্ভারের কারখানায় উৎপন্ন অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণরূপে সজ্জিত করে। এই পরিকল্পনা যদি সফল হয়, আমাদের কোনও সন্দেহ নেই, জার্মানির ইংল্যান্ড দখলের পরেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, ভারতকে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে।

আমেরিকা এখন প্রাচ্য দেশগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়েও ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে। যেমন, চিন দেশে চিয়াং-কাই-শেক ও চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তারা একটা বোঝাপড়া স্থাপন করেছে। ভারতে একজন নতুন মার্কিন কূটনীতিক এবং সামরিক অ্যাটাশে নিযুক্ত করে আমেরিকা এখন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে এবং আমেরিকা যদি গান্ধী এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে ওইরকমের একটি আপস ঘটাতে সক্ষম হয়, তা হলে যে-দল স্বাধীনতা এবং বিপ্লব চায়, তার শক্তি কমে যাবে।

এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সময় এখনও আছে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করতে আরও যদি দেরি করা হয়, ভারতের জনগণকে অক্ষশক্তিদের দিকে নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে যারপরনাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। একবার যদি ভারতীয়দের গরিষ্ঠ-সংখ্যক নিশ্চিতভাবে সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকানদের দিকে চলে যায়, তখন আর ওই ঘোষণার কোনও মূল্য ভারতের পক্ষে থাকবে না।

উপরন্তু, ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে কোনও ঘোষণা যদি না করা হয়, জার্মান বাহিনী যত ভারতের কাছে আসবে, ভারতের জনগণ জার্মানির প্রতি তত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। *জার্মানির সৈন্যবাহিনীর ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াকে তখন আর বন্ধুত্ব নয়, শত্রুর আগমন বলে মনে হবে।*

অতএব, সে ঘোষণা যদি করতেই হয় তা করা উচিত পূর্বাভিমুখে জার্মান সৈন্যবাহিনীর আরও এগোবার আগেই। তুরস্ককে নতুন ইঙ্গ-সোভিয়েত গ্যারান্টি থেকে বোঝা যায় পারস্যের ওপর আক্রমণ আসন্ন। আফগানিস্তানের দিকে যে রাস্তাটি এত মাস খোলা ছিল, ব্রিটিশরা পারস্য অধিকার করবার পর সেটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তখন ভারত সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। পারস্য ব্রিটেনের অধিকারে গেলে, ভূমধ্যসাগর থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত একটা সমগ্র ভূখণ্ড ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তখন উপজাতীয় অঞ্চল এবং ভারতে আমাদের কাজ আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়বে।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের যে ঘোষণা, লন্ডন বেতারে তার অর্থ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের পর ভারত তার স্বাধীনতা পাবে। আমেরিকাও মনস্থ করেছে, সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তারা তাদের সকলের সমস্যা নিয়ে ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই সরাসরি কথাবার্তা বলবে। এইসব থেকে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় যে ভবিষ্যতে আমেরিকা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তার ফলে গান্ধী এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে একটা আপস অতিশয় সম্ভবপর বলে মনে হয়।

আপনাদের সমস্যার জটিলতা আমি সবই বুঝতে পারছি, এবং অবশ্যই আমি আশা করি না যে ভারতের জন্য আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে আপনাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু ভারত আজ তার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, এবং দিন দিন সেখানকার পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। কাজেই ভারতের জন্য আমরা যা করছি তা যদি ফলপ্রসূ হতে হয়, তা হলে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আমাদের আর সংশয় এবং উদ্বেগের মধ্যে রাখবেন না— অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্তে আসুন, সে সিদ্ধান্ত যাই হোক।

ধন্যবাদান্তে

সশ্রদ্ধ

সুভাষচন্দ্র বসু

আমাকে O Mazzotta নামে সম্বোধন করবেন

নাওমি ভেটার-কে (Naomi Vetter) লেখা পত্র, শরৎকাল, ১৯৪১

প্রিয় মিসেস ভেটার,

আমাদের উভয়েরই যারা বন্ধু, তাদের মাধ্যমে আমি আপনাদের খবরাখবর পাই। আমি যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি তার মধ্যে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরে আমি আপনার মর্মান্তিক শোকের সংবাদ পাই। আমার ভিয়েনা যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল বলে আমি ভেবেছিলাম আপনাকে চিঠি না লিখে, নিজে যখন ওখানে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা করব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যখন গেলাম, আপনি ওখানে ছিলেন না। আবার কখন ভিয়েনায় আসব জানি না, তাই চিঠি লিখছি। প্রথমেই আপনার মর্মান্তিক শোকে আমি আপনাকে আমার সমবেদনা জানাই। প্রেসিডেন্ট ভেটারকে আমি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম। সেই কারণে আমি আপনার ক্ষতি উপলব্ধি করতে পারছি। এই দুঃসময়ে যে সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপনি যাচ্ছেন তার জন্য ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিন।

শেষ করবার আগে আমি আপনার সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বসু

পু: খামের ওপর আমার নাম দয়া করে O. Mazzotta লিখবেন।

১২

সিঙ্গাপুরের পতন

প্রথম বেতার ভাষণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪১[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ রেডিওতে আপনাদের উদ্দেশে বলছি।

প্রায় এক বৎসর আমি চুপ করে শান্তভাবে ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা করেছি। এখন সময় এসেছে, আমি কথা বলবার জন্য এগিয়ে এসেছি।

সিঙ্গাপুরের পতনের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া, যে অন্যায় শাসনের সে ছিল প্রতীক, তার অবসান এবং ভারতের ইতিহাসে এক যুগের অবসান। ভারতীয়রা, যাঁরা বিদেশি শাসনের জোয়াল দীর্ঘকাল স্কন্ধে বহন করার লজ্জা ও অপমান সয়েছে, আত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতি সহ্য করেছে, তারা এখন সর্বশক্তিমানকে বিনম্র ধন্যবাদ জানাবে এই শুভ ঘটনার জন্য, যা তাদের কাছে জীবন এবং স্বাধীনতা বয়ে আনবে।

আধুনিক ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতার সবচেয়ে পৈশাচিক শত্রু, প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তার জন্য মানবজাতির একটি অতি বৃহৎ অংশ দাস হয়ে থেকেছে এবং এইভাবেই, মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, অন্য সব জাতির কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজকের শত্রু হতে পারে, ভারতের কাছে সে চিরশত্রু। সেই দুয়ের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা কখনও হতে পারে না এবং আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যারা শত্রু তারা স্বভাবতই ভারতের মিত্র, ঠিক যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্রেরা আমাদের স্বাভাবিক শত্রু।

বহির্বিশ্বে মাঝে মাঝে ভারত থেকে আগত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, এবং দাবি করা হচ্ছে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, কিংবা ভারতবাসীদের হয়ে তাঁরা কথা বলছেন। কিন্তু সে-সমস্ত কণ্ঠস্বর ব্রিটিশ আনছে প্রচারের মাধ্যমে, এবং কেউ যেন মারাত্মক ভুল করে মনে না করেন, যে তাঁরা স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি। যে-দেশ বিদেশি শাসনের অধীনে আছে, স্বাভাবিকভাবে সেখানে ব্রিটিশ অত্যাচারীরা ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার ফলে ভারতে আমরা এমন লোকও দেখতে পাই, যাঁরা খোলাখুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন। আবার অন্যেরা আছেন যাঁরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ব্রিটিশদের স্বার্থে কাজ করেন আর তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখবার জন্য তাঁরা চিনাদের, রাশিয়ানদের অথবা ব্রিটেনের অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেন। কিন্তু ভারতের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা আছে, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও আপস চায় না। তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, যতদিন না পূর্ণ স্বাধীনতা করায়ত্ত

---

১. এটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ আজাদ হিন্দ রেডিয়ো-তে বিশ্বের উদ্দেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম বেতার ভাষণের বয়ান।

হয়। ভারতে এখনকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দরুন স্বাধীনতাপ্রেমী ভারতীয়দের কণ্ঠস্বর দেশের সীমানার বাইরে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আমরা যারা দু' দশকের বেশি সংগ্রাম করে যাচ্ছি, তারা সঠিক জানি দেশবাসীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কী ভাবছে, কী হচ্ছে তাদের মনে।

বিশ্ব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি ভারতের এবং ভারতের বাইরের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রেমী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করছি যে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব, যতদিন না ভারত আবার তার নিজের ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়। এই সংগ্রামের সময়ে, এবং তার পরে পুনর্গঠনের সময়ে আমাদের সকলের শত্রুকে পরাজিত করতে তাদের সকলের সঙ্গে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করব। আমি নিশ্চিত, ওই পবিত্র সংগ্রামে ভারতের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাদের পাশে থাকবে।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরদের, যতই তারা উচ্চ স্থানাধিকারী হোক, যে দেশেরই তারা লোক হোক, তাদের কোনও কূটকৌশল, কোনও ষড়যন্ত্র ভারতীয়দের চোখে ধুলো দিতে পারবে না, জাতীয় কর্তব্যের পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না। ভারতের জাতীয় মুক্তির লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। এতদিন দাসত্বের যে শৃঙ্খল তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল সেই শৃঙ্খল তারা ভেঙে ফেলবে। ভারতের মুক্তির মধ্য দিয়ে এশিয়া এবং বিশ্ব মানবমুক্তির বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

১৩

এই সুযোগ বৃথা হারাবেন না

বেতার ভাষণ, ১১ মার্চ ১৯৪২[১]

বোন এবং ভাইয়েরা,

কিছুদিন যাবৎ আমি, পৃথিবীর পরিবর্তন শান্তভাবে, স্থিরভাবে লক্ষ করে যাচ্ছি। সিঙ্গাপুরের পতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করছে। একটি নতুন যুগের আরম্ভ হচ্ছে। আমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ব্রিটিশেরা আমাদের নৈতিকতা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। তিনি এমন একটি পুণ্য লগ্ন আমাদের দান করেছেন ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য। এই যুগে স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্রু ব্রিটেনের চেয়ে আর বড় কেউ নেই, এখন সময় এসেছে ঘুম থেকে আপনাদের জেগে উঠবার। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের অর্থ হবে এক অত্যাচারীর শাসনের অবসান, এবং ভারতের ইতিহাসে এক নতুন জীবনের আরম্ভ। ব্রিটিশেরা আমাদের উপর অপমান ও লজ্জার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এই পুণ্য সুযোগ আমাদের দান করার জন্য ভগবানকে আবার ধন্যবাদ দিই। আজ পৃথিবীর অনেক জাতি ব্রিটেনের শত্রু। ব্রিটেনের যারা বন্ধু তারা আমাদের শত্রু, ব্রিটেনের যারা শত্রু তারা আমাদের বন্ধু।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দাবি করেন তাঁরা জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত কার্যধারার ফলে ব্রিটিশরা তাদের পুরনো কাজকর্মই চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে-সব প্রতিশ্রুতি পালন করবার কোনও সংকল্প ছাড়াই। আমি এও জানি ভারতে এমন লোক আছেন যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। অধিকাংশ ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনও চায় না, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও চায় না। ভারতমাতাকে মুক্ত না করে আমরা সংগ্রাম থামাব না।

বিশ্বে এক নতুন যুগের উদয় হচ্ছে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলেন, তাঁর নিয়তি তাঁকেই নির্ধারণ করতে হবে। যে জাতিই আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে, তার সঙ্গেই সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত। আমি আশা করি, আমার সকল ভাই-বোনেরা ব্রিটেনের সঙ্গে সংগ্রামে আমাকে সাহায্য করবেন। তার চাতুর্য, তার গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও ব্রিটেন ভারতকে বোকা বানাতে পারবে না, স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি তার শ্রদ্ধা দূর করতে পারবে না। ভারত তার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সংকল্প করেছে। সে শুধু নিজেকেই মুক্ত করবে না, এশিয়াকে মুক্ত করবে, সমগ্র পৃথিবীকে মুক্ত করবে।

---

১. উত্তর জার্মানি ১১ মার্চ ১৯৪২ আজাদ হিন্দ রেডিয়োতে প্রচারিত।

১৪

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা

বেতার প্রচার, ১৩ মার্চ ১৯৪২[১]

বন্ধুগণ!

সিঙ্গাপুরের পতনের পরই অতি দ্রুত পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী সঙ্গীদের অন্যান্য সামরিক ঘাঁটির পতন হয়েছে। জাপানের রেঙ্গুন অধিকার ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতার আশা জাগিয়ে তুলেছে। তারা আবার স্বাধীন বাতাসে নিশ্বাস নেবে, যেমন তারা নিশ্বাস নিত, যখন ব্রহ্মদেশ স্বাধীন ছিল। জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ২৬ নভেম্বর, ১৯৪১ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্য হয়েছে। তিনি কী অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেদিন তিনি বলেছিলেন, ব্রিটেন একে একে তার সামরিক ঘাঁটিগুলো হারাবে! সর্বত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন। ব্রিটেনের গরিমার প্রদীপের শিখা নিবন্ত। তাদের দিন শেষ হয়ে এল।

যথারীতি বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে ব্রিটিশেরা মরিয়া হয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের রক্ত ঝরাতে, ব্রিটেনকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি করাতে চেষ্টা করছে, সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। সর্বত্র তারা সর্বনাশ ও লজ্জা এবং অসম্মানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয়রা ব্রিটেনকে অনুরোধ-উপরোধ করছে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি তারা যেন ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যাতে ভারতের সম্পর্কে তাদের সততা ও সদিচ্ছা বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এমনকী এ-কথাও কোনও কোনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঘোষণা করেছেন যে, ব্রিটেন যদি তাঁদের জাতীয় স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তাঁরা যুদ্ধে ব্রিটেনের সহায়তা করতে প্রস্তুত হবেন। সেই আবেদনে ব্রিটেন কর্ণপাত করেনি। প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও কোনও দ্ব্যর্থহীন উত্তর দেয়নি, যাতে ভারতীয়দের সহৃদয়তা লাভ করতে পারে। নিজেদের অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী, ব্রিটিশরা আবার একটি অস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যতদিন ভারত শাসন করেছে। ব্রিটেন ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে গেছে। সে কাজে তারা খানিকটা সফল হয়েছে, এবং ভারতবাসীদের কোনও কোনও অংশের অনৈক্যের অজুহাত দেখিয়ে তারা ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে অস্বীকার করে গেছে। ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের কোনও সীমা নেই। এখন তারা ভারতের ওপর বিদেশি আক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে বৃথা হইচই করছে। প্রায়ই বলা হয়, ভারতের সীমানা সুয়েজ খালে এবং হংকং-এ। সেই অজুহাতে ব্রিটিশেরা ভারতীয় সেনাদের লিবিয়ার মরুভূমিতে এবং ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছে এবং সেখানে রক্তপাত ঘটিয়েছে। পূর্বে হংকংয়ে এবং সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের বলির পাঁঠা করা হয়েছে, ভারতীয়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না

---

১. ১৩ মার্চ ১৯৪২ বার্লিন থেকে প্রচারিত

করে। ওয়েভেল নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে চাইবেন সেখানেই ভারতের সীমান্ত হবে না। এ শুধু ব্রিটিশদের দুরভিসন্ধির সৃষ্টি। ভারতের সীমান্ত সেখানেই, যেখানে প্রকৃতি তাকে স্থাপন করেছে। ব্রিটেন রক্ষণশীল অথবা শ্রমিক নেতা চার্চিল কিংবা ক্রিপস, যাঁর শাসনেই হোক না কেন ভারতের মানুষকে অনাহারে রেখেছে। ভারতীয়রা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে আছে। সাম্রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবার জন্য, ভারতের দাসত্বের শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করবার জন্য, ব্রিটিশেরা সহায়তা এবং স্বার্থত্যাগ দাবি করছে তাদের কাছ থেকে। তারা চায় ভারতীয়রা তাদের জন্য ক্রীতদাসের মতো অবিরাম পরিশ্রম করুক, কষ্ট করুক।

ভারতীয়রা জানে ভারতের সীমান্তের ওপারে তাদের কোনও শত্রু নেই, ব্রিটিশেরা তাদের চিরাচরিত বিষাক্ত নীতি পরিত্যাগ করেনি। ভারতীয়দের আবার দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, কারণ, বলা হচ্ছে, যুদ্ধ ভারতের দরজায় এসে গেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেবার জন্য দায়ী কে? ভারতের যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত যদি তারা নিজেদের মতো গ্রহণ না করত, ভারতের ধনসম্পদ যথেচ্ছভাবে নিজেদের কাজে নিয়োজিত না করত, তার ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ব্যবহার না করত এবং আয়ারল্যান্ডে যা করতে পারেনি, ভারতের ইচ্ছামতো কাজ করবার স্বাধীনতা কেড়ে না নিত, ভারত কখনওই বর্তমান যুদ্ধে যোগ দিত না। যত রকমের কৌশল আছে, সব প্রয়োগ করে ভারতকে তারা একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে, ভারতীয়দের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব সহায়তা আদায় করেছে।

বন্ধুগণ! ব্রিটেনের নানা কলাকৌশলের কী মূল্য, এবং তাদের চালাকির রকম-সকম আমাদের শিখে নেওয়ার সময় এসেছে। তাদের একমাত্র চিন্তা ভারত পর্যন্ত যুদ্ধ কী করে নিয়ে আসা যায়, যে ভারতকে তারা যুযুধান দেশে পরিণত করেছে। ব্রিটেনের এই চিরাচরিত কৌশলের কথা জেনে কারওরই অবাক হওয়া উচিত নয়। এই কৌশলের সাহায্যে তারা অনবরত চেষ্টা করেছে অন্যদেরকে তাদের যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনতে। অবস্থা সংকটজনক হলেই তারা তাদের সঙ্গীদের ছেড়ে পালিয়েছে। অর্থাৎ, বলতে গেলে তারা নির্মমভাবে ক্রমাগত মানবজাতির ওপরে ধ্বংস ও বিনাশ নিয়ে এসেছে। একেবারে ডানকার্ক থেকে বাটাভিয়ায় তারা বহুবিস্তৃত ধ্বংস নামিয়ে এনেছে। এখনও আপনারা, ভারতীয়রা ব্রিটিশদের স্বার্থপরতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন?

আমার ভারতীয় ভাইয়েরা, ব্রিটিশেরা যে কোনওদিন যুদ্ধকে ভারতের সীমান্তের বাইরে রাখতে আপনাদের সাহায্য করবে সে-রকম আশা করে লাভ হবে না। বরং তারা সর্বক্ষণ চেষ্টা করবে ভারতকে ধ্বংস করতে, এবং আপনাদের দেশেও 'পোড়া মাটির' নীতি প্রয়োগ করতে বিরত থাকবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল দুর্বল জাতিসমূহের কাছ থেকে নিরন্তর লুঠের ওপর। যতদিন তাদের ক্ষমতা থাকবে, তারা তাদের অধীনস্থ দেশকে শোষণ করে যাবে। ভারতীয়রা যদি চান তাঁদের দেশ বিপদের থেকে দূরে থাক, তাঁদের প্রথম কর্তব্য হবে ভারতে সমস্ত সামরিক স্তম্ভ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং ভারতের কাঁচা মাল, সম্পদ এবং যুবশক্তি ব্রিটিশদের সামরিক প্রচেষ্টায় নিয়োগ প্রতিরোধ করা।

বন্ধুগণ, এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, একমাত্র ব্রিটেনের অধঃপতনেই নিহিত আছে ভারতের স্বাধীনতার আশা। যে-সব ভারতীয় ব্রিটিশদের হাত শক্ত করবার কাজ করছেন, তাঁদের প্রত্যেকে ভারতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। তাঁরা প্রত্যেকে ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। যে কেউ ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের বিরোধিতা করেন

এবং ব্রিটিশদের পক্ষে যান, তিনি বর্তমান যুগের মীরজাফর এবং উমিচাঁদ ছাড়া কিছু নন।

ভাইয়েরা এবং বোনেরা,

আপনাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে, যে ব্রিটিশদের মৃত্যু আসন্ন, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া বিশ্বের চোখে এক হাস্যকর দায়বদ্ধতা স্বীকার করা। সম্প্রতি চার্চিল যথাশীঘ্র সম্ভব ভারতকে ডমিনিয়ন স্টেটাস প্রদানের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি ক্রিপসকে ভারতে যেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি যেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একত্র করেন এবং নির্ধারণ করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে কী পরিমাণ ক্ষমতা ভারতীয়দের দান করা উচিত। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি সর্বশেষ ব্রিটিশ প্রস্তাবে খুশি হতে পারেন না। আজ কোনও ভারতীয় যুদ্ধের পর স্বাধীনতার শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখতে পারেন না। প্রত্যেক ভারতীয় রাজনীতিক জানেন, ব্রিটিশেরা সবসময়ে ভারতে Divide and Rule নীতি চালাতে চান। যতদিন তাঁরা ভারতে থাকবেন, কখনওই নিজেদের দুষ্ট নীতি তাঁরা ছাড়বেন না। অনতিবিলম্বে চার্চিল ও তাঁর গভর্নমেন্ট বুঝতে পারবেন যে, আর তাঁরা ভারতীয়দের চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। ভাইয়েরা, বোনেরা নিজের চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন। ক্রিপস কিংবা অন্য কোনও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিক যদি ভারতে আসেন তাঁর সম্পর্কে কোনও ভারতীয় কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করবে না।

বর্তমান বিশ্ব-সংঘর্ষে একগুচ্ছ রাষ্ট্র চেষ্টা করছে ভার্সাই চুক্তির পরে তারা যে শক্তি লাভ করেছিল, সেটা নিজের হাতে রাখতে। অপর এক দল রাষ্ট্র ইস্পাতের মতো কঠিন সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করছে, পৃথিবীতে যে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে তার মূলোচ্ছেদ করে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। ভাইয়েরা এবং ভগিনীরা, এই যুদ্ধে আপনারা শুধুমাত্র একটি জিনিসই হারাতে পারেন, সেটি হল শৃঙ্খল। এখনকার পচা বিশ্ব-ব্যবস্থায় ভারতীয়রা কখনওই খুশি থাকতে পারেন না। তারা খুশি হতে পারে একমাত্র এমন একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যা তাদেরকে ধ্বংস ও দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বাধ্য যার ফলে সেই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

বিখ্যাত ত্রিদলীয় চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের জন্য। এই চুক্তির বিভিন্ন পক্ষ আমাদের কমরেড। একথা বলা হাস্যকর যে অক্ষশক্তিসমূহের এই সংযুক্তি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপদস্বরূপ। প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ অন্য। এই সমস্ত জাতিকে আমি খুব ভাল করে জানি, এবং আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে আপনাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যের সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। এ বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে, তাঁকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাম্প্রতিক বিবৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। আমি আশা করব, আমার স্বদেশবাসীরা আমাদের প্রতি তাঁদের সদিচ্ছা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ পোষণ করবেন না, ইঙ্গ-মার্কিনদের মিথ্যা প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানিরা যেসব চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করছে তাতে ভারতীয়দের আনন্দিত হওয়া উচিত। যেদিন ন্যায়-বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন আর দূরে নেই। সেই সময় যখন আসবে একমাত্র তখনই ভারতীয়রা স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের বাতাবরণের মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

১৫

নিজের দেশের সীমানার বাইরে ভারতের কোনও শত্রু নেই

বেতার প্রচার, ১৯ মার্চ ১৯৪২[১]

ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ,

সিঙ্গাপুরের দ্বীপ-দুর্গের পতনের পর সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ এবং মিত্রশক্তিদের সাম্রাজ্যগুলি দ্রুত আত্মসমর্পণ করেছে। এখন রেঙ্গুনের পতন হয়েছে এবং অবশেষে বর্মীরা সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে, আগেকার দিনের মতো, যখন তাদের দেশ সোনার প্যাগোডা এবং প্রাসাদসমূহে ঝকঝক করত আর তাদের শস্যপূর্ণ সবুজ খেত হাসত। জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ১৯৪১-এর ২৬ নভেম্বর যা বলেছিলেন সেটা যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং ব্রিটেন একের পর এক তার অধিকৃত অঞ্চলগুলি হারাচ্ছে। তার বিশাল সাম্রাজ্যের পতন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারে এমন কিছু সুদূর দিগন্তেও দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভের পর থেকে ব্রিটেন তার চিরকালের ধারা অনুযায়ী, অন্যদেরকে দিয়ে নিজেদের যুদ্ধ করিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে এবং চেষ্টা করেছে অন্যেরা যাতে তাদের যুদ্ধের রসদ জোগায়। কিন্তু সেসব কৌশলে এখন আর কাজ হচ্ছে না, এবং তার ফলে প্রত্যেকটি বড় সংঘর্ষে ব্রিটেন পরাজিত হচ্ছে, সে পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক।

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ভারতবাসীরা ক্রমাগত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আবেদন করে আসছে তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতির যথার্থতা প্রমাণ করবার জন্য ওইসব নীতি ভারতেও প্রয়োগ করতে। কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী এমন কথাও বলেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবি পূর্ণ করা হলে তাঁরা ব্রিটেনের যুদ্ধে পূর্ণ সহায়তা দান করবেন। ব্রিটেনের তরফ থেকে একমাত্র যে উত্তর পাওয়া গিয়েছে, সেটা হল, প্রত্যাখ্যান। সোজাসুজি স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান নয়, যা হলে বরং ভাল হত, তঞ্চকতাপূর্ণ ভণ্ডামিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান। ব্রিটিশরা, যাঁরা তাঁদের শাসনকালে বরাবর ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা এখন কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিভেদের কথা তুলে সেটাকেই ভারতকে স্বশাসন না দেবার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই ভণ্ডামিও যথেষ্ট নয় মনে করে *ব্রিটিশদের প্রচার ভারতীয়দের বোঝাতে চেয়েছে যে তাদের দেশ শত্রুর আক্রমণের ঘোর বিপদের সম্মুখীন, এবং সেই কারণে ভারতের সীমান্ত সুয়েজে, হংকং-এ। এই অজুহাতে ভারতীয় সেনাদের জোর করে একদম পশ্চিমে লিবিয়া ও ফ্রান্স এবং পূর্বে সিঙ্গাপুর ও হংকং পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে, ভারতীয়দের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের কোনও কাল্পনিক ওয়েভেলীয় সীমানা নেই, তার জাতীয় ভৌগোলিক সীমানা আছে, নিয়তি এবং প্রকৃতি-*

---

১. ১৯৪২-এর ১৯ মার্চ বার্লিন বেতারে প্রচারিত বক্তৃতা, "আজাদ হিন্দ" পত্রিকায়ও (সংখ্যা ২, ১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছিল।

নির্দিষ্ট। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই সীমানা আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত এবং এই সাম্রাজ্যই, তা সে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই শাসন করুক, আর শ্রমিক মন্ত্রিসভাই শাসন করুক, ভারতবাসীদের জীবন ও স্বাধীনতা, খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত করেছে। এই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের দাসত্ব যাতে অক্ষয় থাকে তা নিশ্চিত করবার জন্য, ভারতবাসীকে অপরিমিত রক্ত, অশ্রু এবং ঘাম ঝরাতে বলা হচ্ছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশের সীমানার বাইরে ভারতের কোনও শত্রুই নেই।

কিছুদিন থেকে ব্রিটেনের কৌশলের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় এবং অন্য দেশের সেনাদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে এবং সকলকে বলা হচ্ছে যে ভারতে যুদ্ধ আসছে। কিন্তু ভারতকে যুদ্ধের এলাকার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য কে ওঁদের হাতে-পায়ে ধরেছে? যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ভারতকে যুযুধান দেশ বলে ঘোষণা না করত, ভারতের ধনসম্পদ, মানবশক্তি, শিল্পের কাঁচা মাল, ন্যায়-অন্যায় সবরকমভাবে ব্রিটেনের সমরযন্ত্রে জোগান দেবার চেষ্টা না করত এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে একটি বৃহৎ সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত না করত বরং আইরিশ রাষ্ট্রের মতো ভারতকে নিরপেক্ষ থাকতে দেওয়া হত, ভারতের বর্তমান যুদ্ধের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু চূড়ান্ত চাতুর্য সহকারে ব্রিটেন ভারতকে যুদ্ধের এলাকার মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, উদ্দেশ্য, ব্রিটেনের স্বার্থপর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহায়তা লাভ। কাজেই সময় এসে গেছে, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ধিক্কারজনক খেলার আসল উদ্দেশ্যটা আমাদের বুঝতে হবে। তাঁদের মতলব *যুদ্ধটাকে ভারতের মধ্যে নিয়ে আসা,* ঠিক যেমন সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ তারা *ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।*

অবশ্য এই কৌশলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ ১৯৩৯ থেকে ব্রিটিশরা ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে অন্যদের দেশে যুদ্ধকে নিয়ে যাবার, নরওয়ে থেকে ক্রীট পর্যন্ত লিবিয়া থেকে হংকং পর্যন্ত, তারা ক্রমাগত অন্য দেশগুলিকে যুদ্ধ করবার জন্য প্ররোচিত করে আসছে এবং ঠিক সংকটের সময়টিতে নিজেরা পালিয়ে বেঁচেছে অন্যদেরকে বিপদের মুখে ফেলে, যা আমরা বারে বারে দেখেছি ডানর্কাক থেকে বাটাভিয়া পর্যন্ত। এমন আশা করা নিরর্থক যে, ব্রিটেন ভারতকে যুদ্ধের এলাকার বাইরে রাখবে, আধুনিক যুদ্ধের যে-ফল, দুঃখ-কষ্ট অভাব, তা থেকে দূরে রাখবে। সামরিক তৎপরতার সঙ্গে যে পোড়া-মাটির কৌশল জড়িত থাকে, আমাদের দেশে তার প্রয়োগ করতে তারা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না। যে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছিল লুণ্ঠন ও লোভের মধ্যে, যার বাড়-বাড়ন্ত হয় অবিচার এবং অত্যাচারের মধ্য দিয়ে, সেই সাম্রাজ্য, যতদিন তার অস্তিত্ব থাকবে, শোষণ ও সন্ত্রাস-সৃষ্টি করেই যাবে। কিন্তু ভারতবাসীরা যদি তাদের দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে রাখতে চায়, তাদের নিজেদেরই ভারত থেকে সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে ফেলতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বার্থে ব্রিটেনের ভারত শোষণের অবসান করতেই হবে।

ব্রিটেনের জয়ের অর্থ হবে আমাদের নিজেদের দাসত্ব চিরকালের জন্য কায়েম হয়ে যাওয়া এবং একমাত্র সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েই ভারতের দাসত্ব-মোচন সম্ভব। কাজেই যে কোনও ভারতীয়, যে ব্রিটেনের জন্য কাজ করে, সে তার দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করছে, এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য-অর্জনের সংগ্রামের প্রতি সে বিশ্বাসহন্তা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের শুধু তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধেই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে, আজকের মীরজাফর ও উমিচাঁদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে এবং আজ সকলের চোখেই

এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, যে-সাম্রাজ্য অচিরে বিলীন হয়ে যাবে, তার সঙ্গে আপস করা শুধু নিরর্থক নয়, হাস্যকরও বটে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মি. চার্চিল পার্লামেন্টে তাঁর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যথা শীঘ্র সম্ভব ভারতকে ডমিনিয়ান স্টেটাস প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে, ভারতবাসীদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহমত স্থাপনের জন্য এবং বর্তমানে ভারতকে কোন কোন রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসছেন। একমাত্র যে মূর্খের স্বর্গে বাস করে, সেই মনে করতে পারে, যে ভারত এখনও সাম্রাজ্যের মধ্যে ডমিনিয়ন স্টেটাসে আগ্রহী এবং এমন একজন ভারতবাসীও পাওয়া যাবে না যে ব্রিটেনের কোনও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে, যা যুদ্ধের পর পূর্ণ করা হবে। ভারতবাসীরা ভালই জানে, যে-সব তথাকথিত বিভেদ নিয়ে অত প্রচার করা হয়, তা কৃত্রিম এবং যতদিন ব্রিটিশরা ভারতে থাকবে তারা তাদের "বিভক্ত করে শাসন করো", এই জঘন্য নীতি চালিয়ে যাবে। মি. চার্চিল এবং তাঁর মন্ত্রিসভা শীঘ্রই বুঝতে পারবেন, ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে ভারতবাসীদের প্রতি ছুড়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাদেরকে ব্রিটিশদের দিকে নিয়ে আসবে না। অতীতের সব সাম্রাজ্য যে পথে গিয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও সেই পথেই যাবে এবং তার ভস্ম থেকে জন্ম নেবে স্বাধীন এবং অখণ্ড ভারত। কাজেই এই অন্তিম লগ্নে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কিংবা অন্য কোনও ব্রিটিশ রাজনীতিকের আগমন ভারতের পক্ষে গুরুত্বহীন এবং তা নিয়ে ভারতের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এই ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেও এক দিক যখন প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই পূর্বাবস্থাই বজায় রাখতে, যে অবস্থার জন্ম হয়েছিল ভার্সাই-এর চুক্তি এবং সে-রকম অন্য সব চুক্তি থেকে, অপরপক্ষ তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থাকে আহ্বান করে আনতে। এই সংঘর্ষে ভারতের হারাবার কিছুই নেই, তার শৃঙ্খল ছাড়া। ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে নয়, তাকে ধ্বংস করে। পুরনো ব্যবস্থার অর্থ ভারতবাসীদের অপমান, ক্রীতদাসত্ব এবং মৃত্যু।

আধুনিক যুগের ইতিহাস মোটের ওপর আমার বিশ্বাস, বিগত বিশ্বযুদ্ধের ফলে যেমন কয়েকটি পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল, তেমনি এই মহাযুদ্ধের পরিণতিতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে যাবে, যে সাম্রাজ্য আধুনিক রাজনীতির সর্বশেষ এমন বস্তু যা কালের প্রবাহে বাতিল হয়ে গেছে। জার্মানি, ইতালি ও জাপান, যাদের দ্বারা এই পরিবর্তন সম্পন্ন হবে, সেই কারণে আমাদের স্বাভাবিক মিত্র। ওই তিন শক্তি ভারতের বিপদের কারণও, এ এক জঘন্যতম মিথ্যা। ওই তিনটি দেশ সম্পর্কে আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকার দরুন আমি ঠিক তার বিপরীত কথাটিই বলতে পারি, ভারতের প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে সহানুভূতি এবং শুভেচ্ছা ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ যদি থেকে থাকে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘোষণার ফলে চিরকালের জন্য আমাদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত এবং ব্রিটিশ প্রচারের দ্বারা ভবিষ্যতে আর কখনও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব আসুন, আমরা আনন্দ করি কারণ ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণে আমাদের চিরশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে। আসুন আমরা আনন্দ করি কারণ দূর প্রাচ্যে জাপানি সেনাবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আসুন আমরা আনন্দ করি কারণ আগামী সূর্যোদয় ভারতের জন্য নিয়ে আসবে সুবিচার, সুখ এবং সমৃদ্ধি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

১৬

আমার মৃত্যু সম্ভবত আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত

বেতার প্রচার, ২৫ মার্চ ১৯৪২[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এখনও জীবিত, আজাদ হিন্দ বেতারে আপনাদের প্রতি ভাষণ দিচ্ছি। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলি সারা বিশ্বে খবর প্রচার করেছে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদানের জন্য টোকিও যাওয়ার পথে একটি বিশাল দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হয়েছে। আমার ভারত পরিত্যাগের পর থেকে ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমগুলি মাঝে মাঝে আমার গতিবিধি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী খবর দিয়ে আসছে এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদপত্র বিনা দ্বিধায় আমার সম্পর্কে কটূক্তি করছে। আমার মৃত্যু সম্পর্কে সর্বশেষ খবরটি সম্ভবত ইচ্ছা-ভিত্তিক চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত। আমি বুঝতে পারি, ভারতের ইতিহাসের এই সংকটকালে, ব্রিটিশ সরকার আমার মৃত্যু চাইতে পারেন, কারণ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বার্থে তারা এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভারতকে নিজেদের দলে নিয়ে আসার।

উপরোক্ত বিমান-দুর্ঘটনার সব খুঁটিনাটি আমার কাছে এখন নেই, তাই আমি বলতে পারি না দুর্ঘটনাটি আমাদের শত্রুদের অন্তর্ঘাতের ফল কিনা। যাই হোক, সেই মর্মান্তিক ঘটনায় যাঁদের প্রাণহানি হয়েছে তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁরা ভারতের জাতীয় বীর ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার আমাদের যা দিতে চেয়েছেন, এবং মায় স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বেতারে সে সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি অতিশয় যত্নসহকারে তা বিবেচনা করেছি। আমি নিশ্চিত, এটা এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে গিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে সনাতন নীতি, "বিভক্ত করো, করে শাসন করো", সেটি প্রয়োগ করে দেখতে। ভারতে অনেকে আশা করেননি, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে সেই ভূমিকা পালন করবেন, যা মি. এমারি-র মতো রক্ষণশীল রাজনীতিকের জন্য আলাদা করে রাখা ছিল। স্যার স্ট্যাফোর্ড স্বয়ং আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, তাঁর মতে, ভারতকে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে, তা সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সব সদস্য সে-সব প্রস্তাব সম্পর্কে একমত।

এতে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ভারতের প্রশ্ন এলেই, বিভিন্ন দলের মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হয়। স্যার স্ট্যাফোর্ড আমাদের জানিয়েছেন ভারত একটি উপমহাদেশ যেখানে অনেক জাতির, অনেক জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে। তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে খ্রিস্টীয় অব্দ শুরু হওয়ার কয়েক শতাব্দী আগে মহামতি অশোকের সাম্রাজ্যে ভারত এক দেশে পরিণত হয়েছিল, ইংলন্ড ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এক হাজারের বছরেরও বেশি আগে।

---

১. ২৫ মার্চ আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচারিত

ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও যেমন, আয়ারল্যান্ডে এবং প্যালেস্টাইনে ধর্মকে ব্যবহার করেছে মানুষকে বিভক্ত করবার জন্য। সে সেই একই উদ্দেশ্যে ভারতে কাজে লাগিয়েছে শুধু সেই ধর্মের প্রশ্নকেই নয়, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রকেও, যেমন, দেশীয় রাজের রাজা-মহারাজাদের, দলিত সম্প্রদায়সমূহকে, ইত্যাদি। এখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারতে এসেছেন সেই একই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধন করতে। এটাও কম লক্ষণীয় নয় যে, তিনি লেবারের একটা অংশের সঙ্গে আপসের জন্য চেষ্টা করা এবং একই সঙ্গে তার আরেকটি অংশকে দমন করার পুরনো সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছেন। সেইজন্যই একদিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড এক দল রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন, আবার সেই সঙ্গে আরেকদিকে যাঁরা আপস করেন না, সেই নির্ভীক, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জেলে বন্দি হয়ে আছেন, যাতে তাঁরা কোনও বিপদ সৃষ্টি করতে না পারেন। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই জঘন্য নীতি সম্পর্কে ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ অবহিত। আমি নিঃসন্দেহ, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দীপ্ত চিত্তশক্তি কারাপ্রাচীরসমূহ ধূলিসাৎ করে দেবে, ভারতবাসীদের অনুপ্রাণিত করবে, তারা জানবে, এ হল তাদের আত্মসম্মানবোধের অপমান।

লন্ডনের সংবাদপত্র 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' যথার্থই লিখেছে, স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবে এমন কিছু নেই যা মূলত নতুন। এর মূল কথা হল ডমিনিয়ন স্টেটাস, সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই, যে ডমিনিয়ান স্টেটাস ভারত পাবে যুদ্ধের অবসানে। কিন্তু এই প্রস্তাবের শর্তাবলি, স্যার স্ট্যাফোর্ডের বক্তৃতা, এবং 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'-এর মতো বিভিন্ন ইংরেজি সংবাদপত্রের মন্তব্য অনুযায়ী পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতকে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা, ঠিক যেমন গত যুদ্ধের পর আয়ারল্যান্ডকে ভাগ করা হয়েছিল। এরকম একটি প্রস্তাবের দিকে ভারত ফিরেও তাকাবে কিনা আমার সন্দেহ। ভারতবাসীরা প্রকৃতিগতভাবেই অতিথিপরায়ণ এবং সেই অতিথিপরায়ণতার অর্থ যদি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস মনে করেন, সে-প্রস্তাব মেনে নেওয়া, তা হলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড সাম্রাজ্যবাদী কপটতার চূড়ান্ত করে দিল্লির এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভারতীয়রা একমত হয়ে একটি সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হননি। কিন্তু ভারতীয়রা তাঁদের নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন একমাত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই ভারতে দুর্নীতি এবং উৎকোচের প্রচলনের জন্য দায়ী। অতএব ভারতীয়রা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আলোচনা, যুক্তি, তর্ক, প্রচার এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা আর তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করবার আশা করতে পারেন না, এখন তাঁদের অন্য পন্থা, যা অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী, তাই গ্রহণ করতে হবে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড আরও বলেছেন, যতদিন যুদ্ধ চলবে ভারতের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করা যাবে না, এবং সেই কারণে ডমিনিয়ন স্টেটাস-এর শুভ সূচনা হবে যুদ্ধের অবসানে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, অনেকদিন আগে, ১৯৩৯-এর অক্টোবর মাসেই ব্রিটিশ সরকারকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে একটি সাময়িক জাতীয় সরকার এখনই স্থাপন করা যেতে পারে, যার ওপরে দেশবাসীর অধিকাংশের আস্থা থাকবে। সাময়িক জাতীয় সরকার দায়ী থাকবে বর্তমান ভারতীয় বিধান পরিষদের কাছে। অর্থাৎ, সাময়িক জাতীয় সরকারকে দায়বদ্ধ করা যেতে পারে ভারতীয় বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের প্রতি। এই প্রস্তাব আমি উপস্থাপিত করেছিলাম কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পক্ষ থেকে এবং প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত এবং কার্যোপযোগী হওয়ার কারণে কংগ্রেস কমিটিও

প্রস্তাবটি তাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করে, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই মূহূর্তে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের ক্ষমতা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সংখ্যালঘুদের কথা বলে, কিংবা দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের অথবা তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ের কথা বলে যে কোনও সময়ে তারা এই অজুহাত দেখাতে পারেন যে ভারতীয়দের মধ্যে একতা নেই। স্যার স্ট্যাফোর্ড অবশ্যই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন, যদি তিনি মনে করে থাকেন, এইসব অকার্যকর প্রস্তাব দিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতার ক্ষুধা মেটাতে পারবেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সাহায্য পেয়ে ইংল্যান্ড জিতেছিল, কিন্তু ভারতের পুরস্কার ছিল অধিকতর দমন, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। সেসব ঘটনা ভারত ভুলে যায়নি, এবং সে দেখবে বর্তমান সুবর্ণ সুযোগ সে যেন না হারায়।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকে ব্রিটিশ সরকার আরেকটি সংগঠনকে ব্যবহার করছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তার দাবিসমূহ বাতিল করবার উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যে সে কাজে লাগাচ্ছে মুসলিম লিগকে, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটিশদের অনুকূল বলে মনে করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ প্রচার এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে যে মুসলিম লিগ প্রায় কংগ্রেসের মতোই প্রভাবশালী এবং তারা ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধি। কিন্তু তা সত্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে এমন বেশ কয়েকটি মুসলিম সংগঠন আছে যেগুলি পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী। উপরন্তু, ব্রিটিশ ভারতের যে ১১টি প্রদেশ, তার মধ্যে মাত্র ৪টিতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার মধ্যে মাত্র ১টি পঞ্জাবের মন্ত্রিসভাকে বলা যায় মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা। কিন্তু, এমনকী পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীও মুসলিম লিগের প্রধান কর্মসূচি, ভারত বিভাগের প্রবল বিরোধী। কাজেই, মনে হয় মুসলিম লিগ ভারতের একটি মাত্র প্রদেশে সংঘ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দাবি করতে পারে। তবু বলা হচ্ছে, মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করে না।

ভারতের প্রতিরক্ষার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যতদিন যুদ্ধ চলবে, ভারতের সামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সরাসরি ব্রিটেনের হাতে থাকবে, এমনকী ভাইসরয়ের হাতে কিংবা ভারতের প্রধান সেনাপতির হাতেও নয়। এই নীতির দ্বারা ব্রিটেন দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। একদিকে সে চায় সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য ভারতের ধনসম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে এবং আরেক দিকে ব্রিটেনের শত্রুদের দিয়ে ভারতে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটিকে আক্রমণ করাতে, যাতে ভারতবাসীরা ব্রিটেনের মিত্রপক্ষ হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করে। আমি আমার যতদূর সাধ্য জোর দিয়ে বলতে চাই, ব্রিটেনের পক্ষাবলম্বী যত ভারতীয় ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, একমাত্র তারাই দায়ী হবে যদি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ভারতে আসে। আমার দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়ে আমি আরও বলতে চাই যে, এখন ব্রিটেনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবাসীদের জোর করে যুদ্ধে নামানো। ব্রিটেনের লোকেরা অন্য জাতির লোকেদের যুদ্ধে নামিয়ে দিতে খুবই সফল হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত তারা গৌরবময় পশ্চাদপসরণ ও সফল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আসছে। সম্প্রতি তারা একটি নতুন নীতি গ্রহণ করেছে, পলায়নের পূর্বে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া। এই পোড়া মাটি নীতি যদি তারা নিজেদের দেশে প্রয়োগ করে, তাতে আমাদের কিছু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সেই পোড়া মাটি নীতি সিংহল ও ভারতেও প্রয়োগ করবে, যদি যুদ্ধ এদেশে আসে। অতএব ব্রিটেনের যুদ্ধে আমাদের যোগদানে ব্রিটেনের পরাজয় নিবারিত হবে তাই নয়, ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনও বিলম্বিত হবে।

১৭

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠানো খোলা চিঠি

বেতারে প্রচারিত, ৩১ মার্চ ১৯৪২[১]

প্রিয় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস,

বিশ্ববাসী শুনেছে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর এবং মন্ত্রিসভার তরফে আপনি ভারতে গিয়ে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা এই উদ্দেশ্যে আপনাকে ব্যবহার করবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আপনি সে কাজ করবার দায়িত্ব স্বীকার করবেন, এইটাই বুদ্ধির অগম্য। বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র আপনি ভালই জানেন। সেই মন্ত্রিসভায় শ্রমিক দলভুক্তদের অবস্থিতি তার প্রকৃত চরিত্রকে বদলে দেয়নি।

কয়েক বছর আগে শ্রমিক দলের সঙ্গ করতে বাধ্য হওয়ার দরুন আপনি বোধহয় অন্যদের চেয়ে ভাল জানেন, যে দল কত অ-প্রগতিধর্মী, বিশেষত ভারতের এবং সাম্রাজ্যের অন্য অবদমিত জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে। মি. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর জাতীয় মন্ত্রিসভা এটুকু দাবি করতে পারত যে শ্রমিক দল তাঁদের সমর্থন করে, কিন্তু বর্তমান মন্ত্রিসভার তাও নেই।

যখন আপনি ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে নিজের নীতি ও বিশ্বাসের জন্য লড়াই করতেন, অনেকে, তার মধ্যে আমিও একজন, আপনার গুণগ্রাহী ছিল। আপনি এত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন যে এমনকী রাজতন্ত্র উচ্ছেদেরও পক্ষে ছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি ভিত্তি ছিল যে রাজতন্ত্র। আপনার সেই মৌলিক মতবাদ এমনভাবে বদলে গিয়েছে যে মি. উইনস্টন চার্চিলের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন, যে চার্চিলের চেয়ে বেশি ভারত-বিরোধী কোনও ইংরেজ সারা ব্রিটেনে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আপনাকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, কিংবা যাঁরা আপনার রাজনৈতিক জীবন, সাগ্রহে অনুধাবন করেছেন, আপনার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান তাঁদের দুর্বোধ্য মনে হয়। মি. চার্চিলকে বোঝা যায়। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদী, পাশবিক শক্তি প্রয়োগের নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন, এবং সে বিষয়ে কোনও লুকোছাপা করেন না। এমনকী ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মতামতও আমরা বোধহয় বুঝতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ নেতারা রক্ষণশীলদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী, যদিও তাঁরা বেশি ভদ্রভাষায় কথা বলেন, কপট আচরণ করেন। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সরকার আমরা দেখেছি ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সালে।

ওই দু'বারই ব্রিটিশ কারাগারে আমাদের সময় কাটাতে হয়, কখনও কখনও কোনও বিচার ছাড়াই। ভারত কখনও ভুলতে পারে না, ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ একটি শ্রমিক মন্ত্রিসভা দায়ী ছিল ১০০,০০০ নারী ও পুরুষের কারাবাসের জন্য, সারা দেশে ব্যাপকভাবে নারী-

---

১. আজাদ হিন্দ রেডিয়ো-তে (জার্মানি) ৩১ মার্চ ১৯৪২-এ প্রচারিত।

পুরুষের ওপর লাঠি চার্জের জন্য, পেশোয়ারে সমবেত নিরস্ত্র মানুষদের গুলি করে হত্যা করার জন্য এবং বঙ্গদেশের গ্রামে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া ও নারীর মর্যাদাহানির জন্য। লন্ডনে, ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে, যখন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, আপনি শ্রমিক দলের কঠোরতম সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আপনি একদম অন্য মানুষ।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, আপনার কাজ ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটানো। কিন্তু আপনাদের মন্ত্রিসভা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভারতকে যা দিতে চাওয়া হয়েছে তা স্বাধীনতা নয়, সাম্রাজ্যের মধ্যে ডমিনিয়ন স্টেটাস, এবং সেই ডমিনিয়ন স্টেটাসও এখনই কার্যকর হবে না, হবে যুদ্ধের পরে। আপনি দিল্লিতে সদ্য ঘোষণা করেছেন, ভারত সম্পর্কে আপনার মনোভাব মি. চার্চিলের মনোভাবের অনুরূপ। এই অকপটতার জন্য আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত আপনি কি জানেন না? এটাও কি আপনি জানেন না, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস হল ভঙ্গ প্রতিশ্রুতি, কথা দিয়ে কথা না রাখার ইতিহাস? এবং এ-কথা যখন আপনি জানেন যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দাবি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, একি ভারতের অপমান নয় যে, এ রকম একটা প্রস্তাব পকেটে নিয়ে সে দেশে যাচ্ছেন? আরেকটি বিষয়, সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে যা আঘাত করেছে, তা হল আপনার কর্মসূচিতে আছে, সম্ভবপর সমস্ত ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তারা জনসাধারণের প্রতিনিধি হন, আর ব্যক্তি বিশেষের প্রতিনিধিই হন। অন্তত আপনার এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত যে ওই সব দলের কোনও কোনওটিকে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা ব্যবহার করেছেন কংগ্রেসের বিপরীত শক্তি হিসাবে, তার প্রভাব ও গুরুত্ব হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে। এও একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, আসন্ন পরিবর্তনে তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনি আসবেন ধরে নিয়ে রাজন্যবর্গ সম্পর্কে আপনার যা কাজ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ইতিমধ্যেই তা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন।

অতএব একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের মনে হবে, আপনার ভূমিকা হল, অতীতে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা শঠতা ও প্রবঞ্চনার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছেন, সেই রকমই।

যুদ্ধের আরম্ভের সময় ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা উচ্চকণ্ঠে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলতেন। একই সঙ্গে তাঁরা সংখ্যালঘুদের দাবিসমূহ উঁচু করে তুলে ধরতেন যাতে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ বড় করে দেখানো যায়, এবং সেইভাবে ভারতকে চিরকাল পরাধীন করে রাখা যায়। সংখ্যালঘুদের সমস্যা ভারতের একার নয়, সারা পৃথিবীতে সে সমস্যা দেখা যায়। ব্রিটিশেরা যদি প্রকৃতই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কেন ভারতে গণতান্ত্রিক সমাধান প্রয়োগ করেন না, এবং সেইভাবে ভারতের সমস্যার সমাধান করেন না? ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা এবং ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র ১৯৩৯ সাল থেকে ক্রমাগত আমাদের শুনিয়ে আসছেন যে অক্ষশক্তিসমূহ ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ এবং এখন আমাদের বলা হচ্ছে, ভারত শত্রুর আক্রমণের বিপদের সম্মুখে। কিন্তু এ কি স্রেফ প্রবঞ্চনা নয়? ভারতের সীমানার ওপারে তার কোনও শত্রু নেই। ভারতের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এবং একমাত্র যে শত্রুর হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে, তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরামহীন আক্রমণ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই ভারতবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে একটি যুযুধান শক্তি বলে ঘোষণা করেন

এবং সেই থেকে ব্রিটেনের যুদ্ধের স্বার্থে বলপ্রয়োগ করে ভারতের ধনসম্পদ ব্যবহার করে আসছে। তা ছাড়া, সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই যুদ্ধ আরম্ভের সময় থেকে ভারতে জার্মানি, ইতালি এবং জাপানি জাতীয়দের বন্দি এবং অন্তরিন করে রেখেছে। অক্ষশক্তিসমূহ এবং ভারতীয়রা জানে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নয় এবং সেই কারণে পূর্বোক্তরা তাদের দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের বন্দি করে রাখেনি এবং ভারতীয়দের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি নিশ্চিত, ভারত যদি ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ না দেয়, অক্ষশক্তিসমূহের ভারত আক্রমণের কোনও সম্ভাবনা নেই।

১৮

ভারত ভারতীয়দের জন্য

বেতার ভাষণ, ৬ এপ্রিল ১৯৪২[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ বেতারে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষণার উত্তরে আপনাদের প্রতি কথা বলছি।

মহামান্য জাপানের প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল তোজো, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতনের পর ভারতীয় সমস্যার বিষয়ে দুটি ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন। ঘোষণা দুটি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের উচিত তার প্রত্যুত্তরে জানানো, তার মনোভাব কী। ভারতে এবং বিদেশে অবস্থিত স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে, ভারতের স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ সহানুভূতির জন্য, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি যে স্লোগান ধ্বনিত করেছেন ভারতবাসীদের জন্য, সেটি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের ভবিষ্যৎ-বাণী হিসাবে।

১৯০৪-৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে ভারতীয়রা জাপানের নবজাগরণকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে আসছে। জাপানের মাধ্যমেই এশিয়া প্রথম তার আত্মমর্য়াদা ও সম্মান ব্যক্ত করল। অতএব এক শক্তিশালী জাপান এশিয়ার স্বার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

আমি সর্বান্তঃকরণে জাপানের মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিকে স্বাগত জানাই, যাতে তিনি বলেছেন, প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে জাপান বদ্ধপরিকর। সে কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এশিয়া সদা বিপন্ন হয়ে থাকবে। এশিয়া, বিশেষত ভারত ত্রি-শক্তির (জার্মানি-ইতালি-জাপান)-প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে, যদি তারা চিরতরে এই বিপদের অবসান ঘটাতে পারে। বর্তমানে যে যুদ্ধ এই ত্রি-শক্তি ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে চালাচ্ছে তা ভারতের স্বার্থের জন্য নিরতিশয় প্রয়োজন এবং সেই কারণে ভারতীয়রা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীসমূহের নিরবচ্ছিন্ন পরাজয় সন্তোষ ও আনন্দের সঙ্গে দেখে যাচ্ছে।

ভারতীয়দের একটা অংশ, যে কোনও কারণেই হোক ব্রিটেনের পক্ষে আছে, এই ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে ভুল হবে। যে দেশ এতদিন বিদেশিদের অধীনে আছে, তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুমাত্র অতিরঞ্জন না করে আমি বলতে পারি ভারতীয়দের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার জ্বলন্ত ইচ্ছা পোষণ করে। তাদের কাছে এই যুদ্ধ এক ঈশ্বর-প্রেরিত সুযোগ তাদের দীর্ঘ লালিত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য।

---

১. আজাদ হিন্দ রেডিয়ো-তে (জার্মানি) ৬ এপ্রিল, ১৯৪২-এ প্রচারিত এবং "আজাদ হিন্দ" পত্রিকায় (৩ এপ্রিল ১৯৪২)-এ মুদ্রিত

ভারতবাসীদের ভালই মনে আছে বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কীভাবে তাদের বঞ্চনা করেছেন, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেই একই অভিজ্ঞতা তাদের আবার হোক, তারা তা চায় না, তারা জানে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এবং পালন না করার এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই কারণে তারা মনস্থ করেছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তারা চিরতরে অবসান করবে, যার জন্ম হয়েছিল লুণ্ঠন এবং দুর্নীতি থেকে, এবং অবিচার ও উৎপীড়ন যাকে বড় করে তুলেছে। মহামান্য প্রধানমন্ত্রীকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি এ রকম সুবর্ণ সুযোগ, একটি জাতির জীবনে যা কদাচিৎ আসে, তাকে ভারত হেলায় হারাবে না।

ভারতবাসীরা ভাল করেই জানে, সে দুটি কারণে তার এই দাসত্ব সে দুটি হল বহির্বিশ্ব থেকে তার বিচ্ছিন্নতা, এবং তার অভ্যন্তরীণ অনৈক্য। এই শিক্ষা, যা তারা লাভ করেছে তিক্ত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে, তারা কখনও ভুলবে না। অতীতে, যেমন ভারত ছিল একটি স্বাধীন, গৌরবান্বিত এবং প্রগতিশীল জাতি, তেমনি ভবিষ্যতেও ভারত পৃথিবীর অন্য সব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্ব রক্ষা করে বাস করবে, বিশেষ করে ত্রি-শক্তির সঙ্গে এবং সেইভাবে মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অবদান জোগাবে। এক স্বাধীন, সুখী ও প্রগতিশীল বৃহৎ এশিয়া নির্মাণের মহৎ কাজটি করার জন্য জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করা ভারতের পক্ষে সম্মানজনক ও সুবিধাজনক হবে।

১৯

আপসের জন্য হাতড়ে বেড়ানো আর যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার, একই কথা

বেতার ভাষণ, ১৩ এপ্রিল ১৯৪২[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বেতারে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের উদ্দেশে কথা বলছি। ভগিনী ও ভ্রাতাগণ! আমি শুনে বেদনা পেলাম যে ভারতের জন্য ব্রিটিশ প্রস্তাবগুলির প্রতিক্রিয়াশীল এবং কদর্য চরিত্র সত্ত্বেও পৃথিবীর লোকের মনে হচ্ছে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কেউ কেউ ভারতে মি. উইনস্টন চার্চিলের দূত আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর সঙ্গে এখনও কষ্টকর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের সামরিক সীমারেখা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এবং ব্রিটিশ প্রচারের কুপ্রভাবের ফলে, দেশে আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি হয়তো এখনও বুঝতে পারছেন না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছে এবং অবিলম্বে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই কারণে ব্রিটিশরা যদি এসব শর্তও দিত যা এখনকার প্রস্তাবের থেকে অনেক বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ তা হলেও ওই রকম একটি শক্তির সঙ্গে কোনও আপস করার কোনও অর্থ থাকত না।

আজ এমন কোনও ভারতবাসী নেই যার ব্রিটেনের কোনও প্রতিশ্রুতিতে কোনও বিশ্বাস আছে, যে প্রতিশ্রুতি যুদ্ধের পরে পালন করা হবে। এই অসুবিধার জন্য, আমাদের উদারপন্থী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ একটি আপসের পথ সুগম করবার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন, মিত্রশক্তিসমূহের সরকার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে, যুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে। কিন্তু সে গ্যারান্টির কি মূল্য থাকবে যদি আমাদের হাতে তার পালনে ব্রিটেনকে বাধ্য করবার জন্য কোনও শক্তি না থাকে? প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ পয়েন্ট-এর কী গতি হয়েছিল আমরা কী ভুলে গেলাম? আমরা কি ভুলে গেলাম যে, প্রেসিডেন্ট উইলসনের দূত তাঁর পত্র পকেটে নিয়ে সারা বলকান ঘুরে বেড়িয়েছেন বলকান দেশগুলিকে অক্ষশক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুরোধ জানিয়ে? আমরা কি ভুলে গেলাম, ওই সব রাষ্ট্র, যাদেরকে প্ররোচিত করা হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তারা যাতে যুদ্ধে যোগ দেয়, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিজেদের ভাগ্যের হাতে প্রেসিডেন্ট উইলসন সঁপে দিলেন, যখন অক্ষশক্তিসমূহ তাদেরকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করল? আমার কোনও সন্দেহ নেই, কিছু লোক এখনও অন্ধ হয়ে থাকলেও, আমাদের দেশবাসীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বুঝতে পারছে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চক্রান্ত করে প্ররোচিত করছে এবং নিজেদের তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার বলে মনে করে, যে সাম্রাজ্য বাধ্য হয়ে গুটিয়ে নিচ্ছে?

হাসি পায়, যখন দেখি যে-সব লোক ব্রিটিশদের দাস ছিল এবং এখনও দাস আছে, হঠাৎ

---

১. আজাদ হিন্দ বেতারে (জার্মানি) বেতার ভাষণ ১৩ এপ্রিল, ''আজাদ হিন্দ'' পত্রিকায় (৩/১৯৪২) মুদ্রিত।

নিজেদেরকে মস্ত বাহাদুর মনে করছে, যেহেতু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং লুই জনসন-এর মতো লোক তাদের সঙ্গে আছেন এবং নিজেদেরকে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা বলে মনে করছে এবং পৃথিবীর কোনও শক্তি সেই সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে পারবে না। সেই সাম্রাজ্য এখন, আর সব অতীতের সাম্রাজ্য যে দিকে গেছে, সেই দিকেই যাচ্ছে। এমনকী ভারত, শেষ ভারতবাসী পর্যন্ত, তার সমস্ত ধনসম্পদ দিয়ে যদি ব্রিটেনের জন্য যুদ্ধ করত, তার পতন কোনওক্রমেই রোধ করা যেত না। ভারতকে দাস করে রাখা, দরিদ্র করে রাখার যে অনিবার্য ফল তা ব্রিটেনকে ভোগ করতেই হবে এবং আগামীকাল যদি ভারতে একটি জাতীয় সরকারও স্থাপিত হয়, একটি আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা এবং আধুনিক অস্ত্রে তাকে সজ্জিত করা এই যুদ্ধ চলাকালীন কোনও মতেই সম্ভব নয়।

এও কম কৌতুকজনক নয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় উদ্ধারকর্তারাই আবার নিজেদের মনে করেন আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রবাদী। এই মান্যবরেরা দেখতে চান না যে ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। শুধুমাত্র, চতুর ব্রিটিশেরা তাঁদের মন বুঝে চলেন, তাঁদের খাতির করেন। তাঁরা ভুলে যান ভারত আজ ব্রিটেনের জুতোর তলায় শায়িত, তাঁরা পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে যান। তাঁরা খোলাখুলি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেন না, ভারতীয়দের চিন কিংবা রাশিয়া কিংবা আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলে নিজেদের আসল মতলব তাঁরা চাপা দিতে চান। কিন্তু এইভাবে তাঁরা ভারতবাসীদের বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। ভারতবাসীরা উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ।

বর্তমানে দেশের সামনে যে সংকট, আপসের জন্য চেষ্টা করা যে যুদ্ধের জন্য দামামা বাজানোর সমান, সে বিষয়ে আমার দেশবাসীকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। ভারতকে ব্রিটিশরা যে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে, তার একটা কারণ তারা ত্রিশক্তিকে ভারত-আক্রমণে প্ররোচিত করতে চাইছে, যাতে ভারতীয়রা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করতে রাজি হয়। অপরপক্ষে, ত্রিশক্তি খোলাখুলি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের সহানুভূতির কথা ঘোষণা করেছে। নিরপেক্ষ আয়ারল্যান্ডকে আক্রমণ করার তাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করা, যা না করলে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে এখন আপস করার (ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতাই হবে যার ভিত্তি) অর্থ হবে ভারতকে ত্রিশক্তির শত্রুতে পরিণত করা, যাতে ওই ত্রিশক্তি ভারতে সামরিক ঘাঁটিই শুধু আক্রমণ করতে বাধ্য হবে না, আক্রমণ করতে বাধ্য হবে সেই সব ভারতীয়কেও যাঁরা ব্রিটেনের সামরিক প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করবেন। যাঁরা এখন ব্রিটেনের সঙ্গে আপস করার পথ খুঁজছেন, তাঁরা যেন বুঝে দেখেন, তাঁরা কাজ করছেন যুদ্ধকে ভারতে নিয়ে আসার জন্য। আপসের তাৎক্ষণিক ফল হবে লোভী ইংরেজদের ভারতের ধনসম্পদের আরও বেশি লুণ্ঠন, ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের আপস-সন্ধানীদের যুদ্ধ ঘোষণা এবং তার পরিণাম হবে, ইংরেজদের আসন্ন পরাজয়ে অংশীদারিত্ব এবং তার অর্থ লজ্জা ও অপমান। এবং ব্রিটিশেরা যখন পরাজয়ের পূর্বাহ্নে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে, ঠিক যেমন জেনারেল ম্যাকআর্থার ও জেনারেল ওয়েভেল অন্যত্র করেছিলেন, তাদের নতুন পোড়া-মাটি নীতি অনুযায়ী তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব কিছু নাশ করে দিয়ে যাবে, একবার যখন আমাদেরকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় যুদ্ধবাজদের যুদ্ধের এলাকার মধ্যে নিয়ে আসা

হবে, তখন শুধু যে মানুষকে নিজেদের দেশে যুদ্ধের ভয়ংকরত্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে তাই নয়, ভারতের অতি প্রয়োজনীয় যে সমস্ত রসদ, খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আসে, তার সরবরাহও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দেশবাসী মানচিত্র দেখে সহজেই বুঝতে পারবে, এখন ব্রিটেনের অবস্থা কেমন সংকটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপ থেকে ব্রিটেন বহিষ্কৃত হয়েছে। আফ্রিকাতে প্রথম দিকে কয়েকটি জয়লাভের পর, ব্রিটেন এখন পশ্চাদপসরণ করছে। নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্য, এখনও পর্যন্ত যেখানে ব্রিটেনের প্রভুত্ব ছিল, এখন সেসব জায়গায় বারুদের স্তূপ হয়ে আছে, একটি স্ফুলিঙ্গ সেখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। দূরপ্রাচ্যে তারা সর্বত্র জাপানিদের হাতে হেরে ভূত হচ্ছে, পদাঘাত খাচ্ছে। কাজেই তাদের একমাত্র আশার স্থল ভারত। এবং সেই কারণেই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আজ আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যকে তার অনিবার্য নিয়তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, ভারতকে হয় সেই সাম্রাজ্যের সঙ্গে তলিয়ে যেতে হবে নতুবা, সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে যদি সে হোয়াইট হল কিংবা হোয়াইট হাউস (ব্রিটিশ কিংবা মার্কিন সরকার—অনুবাদক) থেকে এখন যে-সব প্রস্তাব আসবে, তা সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

যদি স্যার স্ট্যাফোর্ড নিজেকে ভারতের বন্ধু বলে দাবি করেন, বর্তমান সময়ে তিনি ভারতের সবচেয়ে উপকার যা করতে পারেন তা হল ভারতকে এই যুদ্ধের বাইরে রাখা। তা হলে ভারত তার নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারবে, নিজের নিয়তি নিজে গড়তে পারবে।

এতদিন পরে ব্রিটিশেরা বুঝতে পেরেছে, ভারতে তাদের কোনও নৈতিক মর্যাদা নেই। সেই জন্যই তারা মার্শাল চিয়াং কাইশেক-কে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, সেই জন্যই মি. লুই জনসনকে তাড়াহুড়ো করে ভারতে পাঠিয়েছে, তিনি পকেটে হোয়াইট হাউসের একটি চিঠি বয়ে এনেছেন। সাম্রাজ্যবাদে সর্বশেষ দীক্ষিত হয়েছে আমেরিকানরা। তাই তারা যেমন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাউকে রাজি করবার চেষ্টা করে, তেমনি আবার ভয়ও দেখায়। ভারতীয়দের তারা ভয় দেখিয়ে বলেছে, মি. উইনস্টন চার্চিল-এর দূতের প্রস্তাবে তারা যদি সাড়া না দেয় তা হলে তাদের কী সর্বনাশ হবে। আমার দেশবাসীকে আমি আবেদন করছি ব্রিটিশদের প্রচারে আর ভুলবেন না।

মিত্রশক্তির রাজনীতিকেরা তাঁদের জন্য যে ফাঁদ পেতেছেন তাতে যদি তাঁরা পড়েন, তার পরিণতি হবে, ভারতের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ। ভারতের ভাগ্য এখন অতি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে। আমাদের প্রথম কর্তব্য যুদ্ধের পরবর্তী ক্ষেত্র ভারত যাতে না হতে পারে, তা করা, এবং সেটা করবার একমাত্র পথ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা না করা। আমি পরিপূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান সহকারে বলতে পারি, ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ভারতকে যদি ব্যবহার করা না হয় ত্রিশক্তির ভারত আক্রমণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকবে না।

আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আমার পরবর্তী আবেদন, যুদ্ধকে ভারতের বাইরে রেখে, তাঁরা যেন অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রাম আবার আরম্ভ করেন, আরও তীব্রতর আকারে। ভারতের এখনই স্বাধীনতার দাবি ব্রিটেন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এখন ভারতের পালা, নিজের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার। ভারতের বন্ধন মোচনের এর চেয়ে ভাল সুযোগের কী স্বপ্ন ভারত দেখতে পারে?

পরিশেষে আমি আমার দেশবাসীকে বলতে চাই, আমরা, ঘটনাচক্রে যারা ভারতের বাইরে আছি, এই ক'মাস আমরা চুপ করে বসে নেই। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমরা নিবিড়

আগ্রহ নিয়ে দেখে যাচ্ছি এবং নিজেদেরকে প্রস্তুতও করে যাচ্ছি আগামী সংগ্রামের জন্য, যে সংগ্রাম ভারতকে তার কাম্য স্বাধীনতা এনে দেবে। আমরা জানি সব জায়গায় ব্রিটিশ বাহিনী পলায়নপর। আমরা জানি ব্রিটেনের নৌশক্তি, যার ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল, এখনই অতীতের কাহিনি হয়ে গেছে। আমরা জানি ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবার মতো বায়ুশক্তিও ব্রিটেনের নেই, স্থলশক্তিও নেই। অতএব সেদিন সন্নিকটে যে দিন আমাদেরকে বাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে হবে, আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে ভাগ নেবার জন্য। এখন আমাদের যে যুদ্ধ করতে হবে, তা শুধু ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশি ও বিলাতি সব মিত্রশক্তির সঙ্গেও এবং যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বশক্তি হওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবী থেকে সহায়তা পায়, তা হলে ভারতের স্বাধীনতার যারা বন্ধু, আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য আহ্বান করলে কোনও দোষ হয় না। আমাদের দেশবাসী দিল্লিতে কী হচ্ছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন। তাঁরা সুসংবাদ নিয়ে যান যাঁরা কারাগারে বন্দি, আমাদের সেই কমরেডদের কাছে। আমরা যে দিন তাঁদের পাশে হাজির হব, সেদিনের আর দেরি নেই, ভারতের যত কারাগার সেদিন আক্রমণ করে দখল করব, বিদেশি অত্যাচারীদের বিতাড়িত করব, ভারত আবার স্বাধীন হবে।

২০

আমার আনুগত্য

বেতার প্রচার, ১ মে ১৯৪২[১]

ভগ্নীগণ ও ভ্রাতাগণ!

আমি এর আগে আপনাদের উদ্দেশে কথা বলেছি তিন সপ্তাহের বেশি আগে, জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে, এবং এখন আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান নীতির তত্ত্বকথা ও ভণ্ডামির কথা। সেই নীতির ফলে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে গিয়েছিলেন। একদিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ভবিষ্যতের ডমিনিয়ন স্টেটাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং আরেক দিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় এখনই সহযোগিতা দাবি করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি আশা করেছেন, সেই হাস্যকর দাবি ভারতীয়েরা মেনে নেবে। অবশ্য এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়, এবং সেটা সারা পৃথিবীতে ভারতীয়দের আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

তবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেদনার সঙ্গে এবং সবিস্ময়ে, স্যার স্ট্যাফোর্ড বিদায় নেওয়ার পর এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাখ্যান করার পরও, আমাদের কোনও কোনও প্রধান স্বদেশবাসী প্রকাশ্যে যে নীতি সমর্থন করছেন তার অর্থ হল ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিঃশর্ত সহযোগিতা।

মানুষের স্মৃতি কি এতই দুর্বল যে এই ভদ্রমহোদয়গণ ভুলে গেলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কী প্রস্তাব পাশ করেছিল যুদ্ধ সম্পর্কে? ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ বছরের পর বছর আমরা কি জোর দিয়ে বলিনি, যখন যুদ্ধ আসবে আমরা তাতে যোগ দিতে রাজি হব না, এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে টেনে যুদ্ধে নামাবার যত চেষ্টাই করুক, আমরা তা প্রতিরোধ করব? ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে বর্তমান যুদ্ধ যখন বাধল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে নিঃশর্ত সমর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করেনি? এম এন রায়ের মতো বড় নেতাকে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতা সমর্থন করার অপরাধে, কংগ্রেস কি শাস্তি দেয়নি? এম এন রায় সেদিন যা বলেছিলেন, সেটা মহাত্মা গান্ধীর কোনও কোনও অনুগামী আজ যা বলছেন তার চেয়ে বেশি কিছু নয়, অতএব আমরা অপেক্ষা করে আছি, যারা সোজাসুজি আজ কংগ্রেসের নীতি ভঙ্গ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় দেখবার জন্য। আমি আরও জানি, অহিংসা ধর্মে এই নতুন দীক্ষিতেরা হয়তো বলবেন, নতুন যে বিপদ, বাইরে থেকে আক্রমণের বিপদ, তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাঁরা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রশ্ন করতে চাই, ভারতবাসী এতদিন ধরে যে আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই

---

১ মে ১৯৮২-এ বার্লিন বেতারে প্রচারিত এবং ''আজাদ হিন্দ'' পত্রিকায় (৩.৪.১৯৪২) মুদ্রিত।

করেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ, তাকে কি আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি? ব্রিটিশ প্রচার অতীতে যাই বলে থাক, ভবিষ্যতে যাই বলুক, সুবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত ভারতীয়ের কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে এই বিপুল বিশ্বে ভারতের শত্রু একটাই, যে শত্রু তার কাছ থেকে তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, যে শত্রু আজও ভারতমাতার বুকের ওপর বসে তার রক্তপান করছে। সেই শত্রু হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

নৈতিকতার দিক থেকে এ এক অতি দুঃখজনক ঘটনা যে, আমাদের কোনও কোনও দেশবাসী ব্রিটিশ প্রচারে এত দূর প্রভাবান্বিত হয়েছেন যে তাঁরা ভুলে গেছেন, প্রকৃত শত্রু তারা, যারা এখনও ভারতকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। সেই বিপথগামী ব্যক্তিরা জাপান ও জার্মানির আক্রমণের কথা বলেন, যদিও ভারত সম্পর্কে ওই দুই শক্তির কী নীতি সে বিষয়ে তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই।

বন্ধুগণ, ওই দুই দেশ সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান আছে। এক বৎসরের বেশি হল, আমি যখন দেশত্যাগ করি তখন থেকে ওই দুই দেশের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এবং আমি পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে ওই দুটি দেশ চায় ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন হোক, তার নিজের নিয়তির নিয়ন্তা হোক। উপরন্তু তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত ও ধ্বংস করতে। অতএব আগামী প্রজন্মের ভারতবাসী, যাদের হাতে ন্যস্ত দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের কাজ হবে বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে অভ্যুদয় হবে এক স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের। *ত্রি-শক্তির হয়ে ওকালতি করা আমার কাজ নয়, তারা অতীতে যা করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে তার সাফাই দেওয়াও আমার কাজ নয়।* সে কাজ করতে হবে, ওই দেশের নিজেদের, এবং সে কাজ করতে তারা যথেষ্ট সক্ষম, আমার চিন্তা-ভাবনা ভারতকে নিয়ে, এবং একজন দেশপ্রেমিক ভারতীয় হিসাবে আমার কর্তব্য দেশবাসীকে জানানো, বর্তমান বিশ্ব-সংকটে, অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে, আমরা ভারতের মুক্তিসাধন কীভাবে করতে পারি।

বর্তমান বিশ্ব-সংকটে ইতিহাসের নিয়মে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যারা শত্রু তারাই আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সঙ্গী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হলে, নিশ্চিহ্ন হলে, ভারত স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে কোনওক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে যদি জিতে যায়, (যদিও সেটা প্রায় অসম্ভব) ভারতের দায়ত্ব চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। কাজেই ভারতের সামনে দুটি পথ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব এবং ভারতকে দেখতে হবে, সে যেন স্বাধীনতাই বেছে নেয়। ভারতের জন্য আজ এমন এক সুযোগ এসেছে যা জীবনে একবারই আসে, এবং এমন সুযোগ ইতিহাসেও ক্বচিৎ আসে।

বন্ধুগণ, আমি শুনে হেসেছি, ব্রিটেনের মাইনে করা প্রচারকরা আমাকে বলেছেন শত্রুর চর। আমি যখন আমার নিজের দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলি, আমার কোনও সার্টিফিকেটের দরকার হয় না। আমার সমস্ত জীবন, যা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ, নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস, সেইটাই আমার সদিচ্ছার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি। সম্ভবত আজকের জীবিত কোনও ভারতবাসীর চেয়ে আমি বিদেশিদের এবং বৈদেশিক রাজনীতি, ভাল জানি। ব্রিটিশদের আমি জেনে এসেছি আমার শৈশব থেকে। ব্রিটিশরা, যারা কূটনীতিতে এবং রাজনৈতিক তঞ্চকতায় সিদ্ধহস্ত, তারা যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমাকে প্রলুব্ধ করতে, নীতিভ্রষ্ট করতে বা বিপথগামী করতে না পেরে থাকে, পৃথিবীর কোনও শক্তি তা পারবে

না। আমি সারা জীবন ভারতের সেবক, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাই থাকব। আমার আনুগত্য চিরদিন থেকেছে, চিরদিন থাকবে একমাত্র ভারতের প্রতি, পৃথিবীর যেখানেই আমি থাকি না কেন।

প্রধানমন্ত্রী তোজোর ঐতিহাসিক ঘোষণা, "ভারত ভারতবাসীর জন্য", যেসব ব্রিটিশ প্রচারবিদদের মুখ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে, তাঁরা এখন আবার নতুন করে তাঁদের সেই পুরনো যুক্তি দেখাতে আরম্ভ করেছেন, চিন-জাপান যুদ্ধ থেকে যা নেওয়া হয়েছে। বাড়ির ছাদ থেকে তারা তারস্বরে চিৎকার করবেন, "জাপানিরা চিনে কী করেছে দেখো।" ওই সব ভারতীয় এবং ব্রিটিশ প্রচারবিদদের আমি বলতে পারি, আমি যখন ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, চিন দেশে একটি সদিচ্ছা মিশন পাঠানোর প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য আমি দায়ী ছিলাম।

সে-সব দিন ছিল, যখন মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি ভারতীয়দের সহানুভূতি অমন প্রবলভাবে অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে-মার্শাল এই সেদিন এসেছিলেন ভারতবাসীদের ইংল্যান্ডের জন্য যুদ্ধ করতে বলবার জন্য, তিনি ছিলেন অন্য মানুষ, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ক্রীড়নক। এবং যে জাপানের সঙ্গে মার্শাল এখন যুদ্ধ করছেন সে জাপানও অন্য জাপান, যে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, যে-জাপান ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রাচ্য থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, যার সঙ্গে মার্শাল চিয়াং কাই-শেক আজ সম্মানজনক বোঝাপড়ায় আসতে পারেন, শুধু যদি তাঁর ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের কব্জা থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন।

অতএব, বন্ধুগণ একবার ভেবে দেখুন, ভারত আজ কোথায় দাঁড়িয়ে। যে শক্তির অবিলম্বে কোনও অস্তিত্বই থাকবে না তার আঁচল ধরে ঝুলে থেকে আপনারা কি আপনাদের রাজনৈতিক কবর খুঁড়তে চান? তার চেয়ে অনেক ভাল হয় না কি ত্রি-শক্তি যে বন্ধুত্বের হাত আপনাদের বাড়িয়ে দিয়েছে সেই হাত গ্রহণ করা, যে সহযোগিতার ইচ্ছা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষণায় প্রকাশ পেয়েছিল সেই সহযোগিতা গ্রহণ করা? আমাদের যে-সব বন্ধুরা আরাম কেদারায় বসে রাজনীতি করেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো চেঁচিয়ে বলবেন, "আমরা কোনও বিদেশি শক্তির সাহায্য নেব না!" বন্ধুগণ, আপনাদের রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য নিতে কেউ বাধ্য করবে না। সে সাহায্যের প্রয়োজন না হলে নেবেন না। কিন্তু প্রয়োজন হলে সে সাহায্য যদি নেন কোনও ক্ষতি নেই। বিগত ২০০ বছরের আধুনিক ইতিহাস আমি খুব নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছি, বিশেষ করে পড়ে দেখেছি ওই সময়ের সমস্ত স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা, কিন্তু আমি এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইনি, কোনও-না-কোনও আকারে বিদেশি সহায়তা ও মৈত্রী ছাড়া যেখানে স্বাধীনতা এসেছে। আর আপনারা নিজের চোখেই কি দেখতে পাচ্ছেন না ব্রিটেন নিজে কী করছে? সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সূর্য যেখানে কখনও অস্ত যায় না, সারা পৃথিবীতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সৈন্য, অর্থ, গোলা-বারুদ ভিক্ষে করছে, পৃথিবীর সব স্বাধীন জাতির কাছ থেকে শুধু নয়, ভারতের মতো যে সব দেশ দাস হয়ে আছে, তাদের কাছ থেকেও। ব্রিটেন সাহায্য ভিক্ষা করায় যদি দোষ না হয় প্রয়োজনে ভারত সহায়তা গ্রহণ করলেও কোনও দোষ হতে পারে না, আর ব্রিটিশ থেকে যদি ভারতে যে-সব আমেরিকানরা সাহায্য করতে এসেছে তাদের স্বাগত করতে পারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অন্তিম সময়ে যে কোনও বন্ধু আমাদেরকে সাহায্য করতে আসবেন তাদেরকেও আমাদের উচিত আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

বন্ধুগণ, শেষবার যখন আপনাদের প্রতি কিছু কথা বলছিলাম তারপর আপনারা লক্ষ করেছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কেমন জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধের অজুহাতে আমেরিকান আক্রমণের জন্য দ্বার খুলে দিয়েছে। মার্কিন কূটনীতিক, মার্কিন ব্যবসায়ী ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর লোকেরা এখন সারা ভারতে যথা ইচ্ছা বিচরণ করছে এবং এ-সব যদি এখনই বন্ধ করা না হয়, শীঘ্রই আমরা এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে হোয়াইট হাউসের কর্তারা এবং মার্কিন মূলধন এখন লাটে তুলেছে এবং তারাই এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিজের হাতে তুলে নিতে, এই যুদ্ধ চলাকালীনই।

ভারতের ভাইসরয় তাঁর ৭ মে-র বেতারের ভাষণে আপনাদের কাছে আবেদন করেছেন একটি জাতীয় যুদ্ধ মোর্চা (National war-front) গঠন করতে। মান্যবর খুব উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়েছেন সমস্ত বিভেদ বিসর্জন দিয়ে একটি সর্বদলীয় মোর্চা গঠন করার জন্য, ভারতের চিরকালের শত্রুর বিরুদ্ধে। মহামান্য এ কথাও সঠিক বলেন যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও কাজ করার সংকল্প জাগ্রত করতে হবে। আগামী সংগ্রামের জন্য আমাদেরকেও জনসাধারণের নৈতিক বল গড়ে তুলতে হবে এবং যারা আপস ও সহযোগিতার কথা বলে তাকে দুর্বল করবার চেষ্টা করছে তাদের নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। অবশ্য মান্যবর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আপনাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। ঠিক সময়ে অস্ত্র আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে, ইতিমধ্যে সব কিছু প্রস্তুত করে রাখুন কেননা আমাদের একটি মিনিটও নষ্ট করা চলবে না, এবং আমাদের কারারুদ্ধ কমরেডদের কাছে সুসংবাদ পৌঁছে দিন। আমরা দিবারাত্র তাঁদের কথা ভাবছি। তাঁদের জানিয়ে দিন প্রত্যাশিত লগ্ন উপস্থিত হলে প্রথম তাঁরাই স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন।

বন্ধুগণ, স্বদেশবাসীগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন কালের বালুকাবেলায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর স্বাধীন ভারতের জন্মের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৮৫৭ সালের এই মে মাসেরই ১০ তারিখে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল। ৮৫ বছর পরে ১৯৪২-এর মে মাসে শুরু হয়েছে ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম। বন্ধুগণ প্রস্তুত হন, ভারতের মুক্তির লগ্ন আগত। আমরা ভারতবাসী, যারা ভারতের বাইরে আছি, তারা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছি। আমরা শুধু মাতৃভূমির বন্ধন মোচনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি না, স্বাধীন ভারত পুনর্গঠনের সমস্যাবলির সমাধানের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছি। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ, একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে শীঘ্রই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে জয়ী হতে। এবং তারপর একটি স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে স্বাধীন ভারত স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তার নিজের সরকার কেমন হবে। তাতে কোনও বিদেশি শক্তি হস্তক্ষেপ করবে না। স্বাধীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপিত হবে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির ওপর। এবং স্বাধীন ভারত, আজাদ হিন্দ হবে স্বাধীন সুখী এবং সৌভাগ্যশালী মানুষের দেশ যারা স্বাধীন জাতিদের মধ্যে স্থান করে নেবে।

২১

আমার প্রাচ্যে থাকা উচিত

জার্মান বিদেশমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop)-এর প্রতি পত্র, ২২ মে ১৯৪২

Berlin-Charlottenburg 2
Sophienstr. 6-7
২২ মে ১৯৪২

মান্যবর,

মান্যবর অবগত আছেন দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলি জাপানি বাহিনীকে ভারতের সীমান্তে নিয়ে এসেছে। ওই সব ঘটনা ভারতের অভ্যন্তরের ঘটনাসমূহের ওপর প্রভাব ফেলেছে যেখানে পরিস্থিতি এখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। ভারতের এখন সুযোগ এসেছে ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার, যে রকম সুযোগ ইতিহাসে কদাচিৎ আসে। অতএব আমার মনে হয় এই অনন্য সুযোগ আমার গ্রহণ করা উচিত।

আমি যে এক বছরের একটু বেশিদিন এখানে ছিলাম তার দিকে যখন ফিরে তাকাই আমার মনে হয় আমি আমার দেশের জন্য কিছু দরকারি কাজ করেছি যার ফল স্থায়ী হবে। কিন্তু এখন সময় এসেছে, যখন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য অন্তিম প্রচেষ্টা করা উচিত। তার জন্য আমার প্রাচ্যে থাকা অপরিহার্য। একমাত্র সেখানে থাকলেই আমি ভারতের বিপ্লব সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারব।

জার্মানিতে আমি যতদিন থাকলাম সেই সময়ে যে আতিথেয়তা, সহায়তা ও যত্ন আমি জার্মান সরকারের এবং বিশেষ করে আপনার কাছে পেয়েছি তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তার ফলে রচিত হয়েছে আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য বন্ধন। আমি এত নিশ্চিত আগে কোনওদিন ছিলাম না যে ত্রিশক্তির এবং ভারতের নিয়তি অভিন্ন। আমাদের উভয় পক্ষেরই লক্ষ্য অভিন্ন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম পরাজয়। তার জন্য আমাকে প্রাচ্যে গিয়ে নিকট থেকে সেই লক্ষ্যের দিকে ভারতের বিপ্লবকে পরিচালিত করতে হবে। শুধু ভারতের লক্ষ্যই নয়, আমাদের উভয় পক্ষের লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে সাহায্য হবে প্রাচ্যে ভারতের যত কাছাকাছি সম্ভব, আমার উপস্থিতির দ্বারা।

আমি যখন ইউরোপে থাকব না, যে সংগঠন মান্যবর আপনি গড়ে তুলতে আমাকে সাহায্য করেছেন সেটি জার্মান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করে যাবে এবং বলাবাহুল্য, এখানে আমার যে সংগঠন, তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আমি বজায় রেখে চলব এবং জার্মান সরকারের সঙ্গেও সংযোগ রাখব, প্রাচ্যে জার্মান দূতাবাস এবং জার্মান বন্ধুদের সহায়তায়।

প্রাচ্যে যাত্রা করা এখনকার ব্যবস্থাদির দ্বারা সম্ভব এবং জার্মান ও ইতালিয়ান সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এখন আমাকে দিতে পারে।

আমার সন্দেহ নেই, মান্যবর আপনি এবং ফ্যুরের ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কারণে তার প্রয়োজন বুঝতে পারবেন। অতএব আপনি, মান্যবর আমার গমনের জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন, যাতে জাতীয় বিপ্লবের নেতা হিসাবে আমি দেশের প্রতি আমার কর্তব্য করতে পারি।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে,

সশ্রদ্ধ

সুভাষচন্দ্র বসু

২২

জার্মানির ফ্যুরের-এর মুখোমুখি

হিটলার এবং বসুর সাক্ষাৎকার বিবরণী, ২৯ মে ১৯৪২[১]

৩০ মে ১৯৪২
বার্লিন

হিটলার এবং ভারতের জাতীয় নেতার ২৯ মে ১৯৪২[২]-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী

উপস্থিত : ফেডারেল ফরেন মিনিস্টার, সেক্রেটারি অফ স্টেট, কেপলার, রাষ্ট্রদূত Hewel।

প্রথমেই বসু প্রবীণ বিপ্লবী হিসাবে ফ্যুরের-কে অভিবাদন জানান এবং এই সাক্ষাৎকার তাঁকে দান করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর জীবনে এই দিন চিরদিন একটি ঐতিহাসিক দিবস হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফ্যুরেরকে তিনি বৎসরাধিক কাল পূর্বে তাঁর সে দেশে আগমনের সময় থেকে জার্মান সরকারের তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার ও আতিথেয়তার জন্য এবং তাঁর দেশের মুক্তির বিষয়ে সহায়তার জন্য এবং ইণ্ডিয়ান লিজন গঠনে সহায়তার জন্য জার্মান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। আগের বছর জানুয়ারিতে যখন তিনি ভারত ত্যাগ করেন তাঁর সহকর্মীরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত নিয়তির জন্য ও ভারতের জন্য কাজ করবার সম্ভাবনার বিষয়ে। কিন্তু বসু এই কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে ও ভাবনা-চিন্তা করে। অতীতের দিকে তাকিয়ে তিনি নিঃসন্দেহ তিনি যা করেছেন তা ভারতের সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্য। ত্রি-শক্তির সহায়তা ভারতের প্রয়োজন ছিল, যদিও ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যুদ্ধ ভারতকেই করতে হবে। ভারতকে এই যুদ্ধে তার কর্তব্য যেমন করতে হবে, বহির্বিশ্বের সহানুভূতি ও সমর্থনও তার প্রয়োজন।

এখন সময় এসেছে জাপানি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার প্রশ্ন বিবেচনার। জার্মানি এবং ইতালির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করার ওপর ভারত প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিল,

---

১. হিটলারের সঙ্গে নেতাজির সাক্ষাৎকারের সরকারি বিবরণের এটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির লেখ্যাগার থেকে, মাইক্রোফিলম এর আকারে, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে এটি প্রাপ্ত। পরবর্তীকালে এটি Staats maenner und Diplomaten bei Hitler, Part two সম্পাদক Andreas Hillgrueber, Bernard এবং Graefe fuer Weh rwesen,, Frankfurt am Main-1970-এতে প্রকাশিত হয়— সম্পাদকদ্বয়

২. বিদেশ মন্ত্রকের অফিসের ফাইলে পল স্মিডট (Paul Schmidt) হিটলারের সরকারি দোভাষীর সরকারি বিবরণীতে সাক্ষাৎকারের তারিখ দেওয়া আছে ২৭ মে, ১৯৪২। অন্যান্য সূত্র, যেমন Wehrmacht-এর সর্বাধিনায়ক-এর বিবরণী, The Fuehrer's Diary এবং German News Bureau (PNB) বিবরণী থেকে পরিষ্কার যে সাক্ষাৎটি হয়েছিল ২৯ মে ১৯৪২, সাক্ষাৎ হয়েছিল বার্লিন-এ Reich Chancellory-তে— সম্পাদকদ্বয়।

গুরুত্ব দিয়েছিল ওই দুটি দেশের সহানুভূতি ও সহায়তা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার ওপরও। তার কারণ শুধুমাত্র জাপানের সহায়-সম্পদের ওপর নির্ভর করতে সে চায়নি।

তারপর বসু পূর্ব এশিয়া যাবার বিষয় উত্থাপন করেন। তাঁর এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভারতের যতদূর সম্ভব নিকটে আসতে চেয়েছিলেন, যেখান থেকে ভারতীয় বিপ্লব পরিচালনা করা যায়। অবশ্য তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে যে-সব বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের তিনি এখানে রেখে যাবেন, তাঁরা প্রচার কার্য চালাবেন।

উপসংহারে বসু অনুরোধ করেন ফ্যুরের একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বিপ্লবী হিসাবে তাঁকে কিছু উপদেশ দিন। যদিও ভারত জার্মানি থেকে বহু দূরে অবস্থিত এবং সেখানকার পরিস্থিতি ইউরোপের পরিস্থিতি থেকে অনেক আলাদা, কিছু কিছু মৌলিক নীতি অবশ্যই আছে যার ভিত্তিতে সমস্ত বিপ্লবই পরিচালিত হওয়া উচিত।

ভারতের ভাবমূর্তি চিরদিন ব্রিটিশ প্রচার কর্তৃক বিকৃত হয়েছে, এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা গড়ে ওঠে। বসু যে ভারতের প্রতিনিধি সেটা প্রাচীন, দার্শনিক ভারত নয়, আধুনিক প্রগতিশীল ভারত।

উত্তরে ফ্যুরের পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। জার্মানি এবং ভারত উভয়েরই শত্রুরা অভিন্ন এবং নির্মম। প্রথমত ছিল ইংল্যান্ড, যে ভারত শাসন করছিল এবং ইউরোপও শাসন করছিল ইউরোপীয়দের পারস্পরিক বিভেদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং চেয়েছিল সেই শাসন চালিয়ে যেতে। স্পষ্টত সেই বিপদ দূর করা যায় একমাত্র ইংল্যান্ডের সামরিক পরাজয়ের দ্বারা, যার ফলে নিশ্চিতভাবে ইংল্যান্ডকে ভবিষ্যতে সেই প্রভাব হারাতে হবে।

ব্রিটিশরা ছাড়াও, বলশেভিকরা এবং আমেরিকানরা আমাদের উভয়ের শত্রু, উপরন্তু ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও রাশিয়াও পরস্পরের প্রতি সৎ আচরণ করছে না। আমেরিকা চাইছে, ইংল্যান্ড যা করছে তা নিজেরাই করতে, আবার রাশিয়া চাইছে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার উত্তরাধিকারী হতে। আমেরিকা ইংল্যান্ডের উত্তরাধিকার বহন করে কিনা, অথবা, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এবং ব্রিটেন উভয় দেশকেই রাশিয়া প্রবঞ্চিত করে কিনা তাতে জার্মানি অথবা ভারত কারওই কিছু এসে যায় না। ভারতে কেউ যেন রাশিয়ার বিপদকে অগ্রাহ্য না করেন; এবং রাশিয়া সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর কোনও কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ মতামত, তাঁর (ফ্যুরেরের) মনে হয়েছে,অত্যন্ত বিপজ্জনক।

জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে দূরত্ব বিপুল। যদিও উভয় দেশেরই প্রতিপক্ষ অভিন্ন, তবু যে সব রণাঙ্গনে সব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে সেগুলি পরস্পর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। সেই দূরত্ব সত্ত্বেও ইউরোপে জার্মানির জয়ের প্রভাব ভারত স্পষ্ট অনুভব করবে। বিগত আড়াই বছর জার্মানির সাফল্য ব্যতীত পূর্ব এশিয়া, জাপান অত অগ্রগতি করতে পারত না। কাজেই ভারত ও জার্মানি একই যুদ্ধ করছে, একই শত্রুর বিরুদ্ধে, সে যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে তাতে কিছু এসে যায় না। রাশিয়ার হাতে না পড়ে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সুযোগ ভারতের এখন এসেছে, কেননা রাশিয়া এখন জার্মানির হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

যে-যুদ্ধ এখন জার্মানি করছে সেটি রাজনীতিক হিসাবে প্রচার-যুদ্ধ করা নয়, সৈনিক হিসাবে ক্ষমতার যুদ্ধ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যুরের কোনও মিথ্যা ভবিষ্যদ্‌বাণী না করার নীতি মেনে চলছেন, যা তাঁর ক্ষমতার বাইরে এমন কোনও প্রতিজ্ঞা তিনি কখনও করেননি। অভ্যন্তরীণ বিষয়েও জয়লাভ করার ভবিষ্যদ্‌বাণী তিনি পরিহার করেছেন, যখন সেটা তার নিজের ক্ষমতার বাইরে থেকেছে।

এই সব কারণে এই মুহূর্তে মিশর সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। তার কারণ তার আগের দিন রোমেল আক্রমণ আরম্ভ করেছেন। সেই আক্রমণের ফলে রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনী ভেঙে পড়বে কিনা তিনি আগে থেকে বুঝতে পারছেন না। সে যাই হোক, জার্মানি তার যতদূর সাধ্য করবে, সে রক্ত এবং ঘাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রোমেলের সাফল্য যদি আশানুরূপ না হয়, মিশরের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় আকারের কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে তাতে ক্ষতিই হতে পারে। তবে রোমেল যদি শত্রুকে পরাজিত করতে পারেন, তা হলে তা থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। ফ্যুরের তৎক্ষণাৎ মিশরিদের বলবেন ব্রিটিশদের অধীনতার শিকল ছুড়ে ফেলে দিতে। সে-ক্ষেত্রে সে রকম একটা আবেদন তিনি বিবেক পরিষ্কার রেখে করতে পারবেন, কারণ জার্মানির শক্তি সে আবেদনের পিছনে থাকবে।

তিনি (ফ্যুরের) বিদেশি শক্তিদের পরাস্ত করা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন। তাঁর নিজের স্বদেশ অস্ট্রিয়া সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা সে-দেশ আক্রমণের মাত্র এক দিন আগে ১৯৩৮-এর ১২ মার্চ করেছিলেন। যে রাজনীতিক চান তাঁর কথায় লোকে গুরুত্ব দিক, তিনি তাই করবেন।

আরব দেশের প্রশ্নেও তাঁর মনোভাব একই রকম। দক্ষিণ ককেশাসে যদি জার্মানি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়ে থাকত এবং মিশরিদের এবং আরব বিপ্লবীদের কাছে পাঠানোর জন্য কয়েকটি মোটরবাহিত ডিভিশন থাকত, আরবদের উদ্দেশে একটি আবেদন জারি করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। কিন্তু এখন যখন জার্মানি আরব দেশ থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে, সে-রকম একটি ঘোষণা দায়িত্বহীনতার কাজ হত। তিনি (ফ্যুরের) কোনও ইংরেজ নন। তিনি ঘোষণা জারি করে অন্য সব জাতিকে ধ্বংস করতে চান না। মিশরের এবং আরব বিপ্লবীদের পরাজয়ের জন্য তিনি কাজ করছেন না। প্রকৃত সাফল্য লাভে তাদের সাহায্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ইংরেজদের মতো তিনি চান না তারা শত্রুপক্ষের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করার জন্য যুদ্ধ করুক। নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করবার জন্য জার্মানি নিজেদের রক্ত দিতে প্রস্তুত।

এই পরিস্থিতিতে মিশরের প্রতি আবেদনের কথা বিবেচনা করার সময় তিন মাস পরে আসতে পারে কিংবা এক বছর কি দু'বছর পরে আসতে পারে। সে যাই হোক, সেটা হতে পারে একমাত্র যখন সে দেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে তার দ্বারদেশে জার্মানি যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করবে, তার পরেই। আরব দেশ সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যেতে পারে।

জার্মানি থেকে ভারতের দূরত্ব অপরিমেয়, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব একমাত্র স্থলপথে অথবা বিমানযোগে। স্থলপথে যোগাযোগের জন্য যদি দক্ষিণের পথ বেছে নেওয়া হয় পারস্য উপসাগর মারফত, তবে উত্তরে যোগাযোগ হতে পারে আফগানিস্তানের পথে। যে দিক দিয়েই যাক, সে পথ যাবে রাশিয়ার মৃতদেহের ওপর দিয়ে।

তাঁর মতে, যুদ্ধে জাপানের বিস্ময়কর দ্রুত অগ্রগতি বিগত অর্ধবর্ষে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার ফলে সে দেশের সৈন্যবাহিনী বস্তুত ভারতের সীমানায় পৌঁছে গেছে। জাপানের লক্ষ্য কী তিনি (ফ্যুরের) জানেন না। তিনি জানেন না প্রথমে চিয়াং-কাই শেক-এর দিক থেকে আসা বিপদের হাত থেকে তার বাহিনীকে রক্ষা করা তিনি বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাকি তাঁর সঙ্গে কোনও রকম বোঝাপড়া চান, নাকি তারা প্রথমে অস্ট্রেলিয়া কিংবা

ভারতের দিকে যেতে চান। পূর্ব এশিয়াতে তাদের শক্তির পরাজয় সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটাবে। সেই পতন স্বভাবতই জার্মানির ওপর চাপ অনেক কমাবে আর রক্তক্ষয়ও কমাবে। তারপর জার্মানি পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলি অতিশয় আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করে যাবে এবং তার উদ্দেশ্য তার দিক থেকে যতটা সম্ভব সহায়তা প্রদান করা। সে কাজ সে করবে ব্রিটিশদের যেখানেই দেখবে সেখানেই তাদের আঘাত করে। সে-প্রসঙ্গে তিনি ডুবোজাহাজের যুদ্ধের কথা বলেন, পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধেও তাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য হবে, ঠিক যেমন উড়োজাহাজ-আক্রমণ ঘটেছে ব্রিটেনের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের ওপর এবং উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে। সেখানকার প্রত্যেকটি পরাজিত ব্রিটিশ ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যদেরকে মুক্ত করবে এবং যে-সব ভারতীয় বাহিনী ব্রিটিশদের হাতে বন্দি, পরে ভারতীয়দের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

এই মুহূর্তে জার্মানি তার বেশি কিছু করতে পারবে না। তবে জার্মানি যদি জাপানের মতো ভারতের সীমান্তের কাছে পৌঁছতে পারে যার জন্য সম্ভবত আরও এক কি দু'বছর লাগবে, তা হলে তিনি (ফ্যুরের) বসুকে তার কাছে থাকতে অনুরোধ করতে পারতেন, বলতে পারতেন জার্মান বাহিনীর সঙ্গে মার্চ করে ভারতে প্রবেশ করতে এবং তারপরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অগ্নি জ্বালাতে।

তবে সেই সময়ে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল তিনি বসুকে শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন, জাপানের ওপর নির্ভর করতে, ভারতের সীমান্ত থেকে বৈপ্লবিক যুদ্ধকে দেশের মধ্যে নিয়ে যেতে। একজন প্রবীণ বিপ্লবী হিসাবে তিনি শুধু বসুকে পরামর্শ দিতে পারেন ভারতে একটি অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সুযোগ নিতে, বাইরের থেকে শত্রুর যে চাপ তার সহযোগে। তাঁর বিশ্বাস, নেহরুর ফ্যাসিস্ট-বিরোধী, জাতীয়তা-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কিংবা গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ এই দুটির কিছুই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে না, ব্রিটিশ শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া যাবে একমাত্র যদি বাইরে থেকে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতি বিদ্রোহ করে। সেই রকম একটি অভ্যুত্থান সব চেয়ে ভাল করে সংগঠিত করা যেতে পারে সে দেশের যতটা সম্ভব কাছ থেকে। কাজেই সেই রকম কোনও একটা জায়গায় অবস্থান করা বসুর পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে, যেখান থেকে ব্রিটিশদের ওপর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক চাপ দেওয়া যায়। ফ্যুরের জানেন না, জাপানিরা সে চাপ সৃষ্টি করতে চায় কিনা। সে-রকম কিছু জার্মানিকে তারা জানায়নি।

অন্য দিক থেকে তিনি বিশ্বাস করেন না শুধুমাত্র একটি অভ্যুত্থান বাইরের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবে। একজন প্রবীণ বিপ্লবী হিসাবে তিনি জানেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যতটা উন্নতি হয়েছে তার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈনিকও ঠিকভাবে সংগঠিত হলে এবং অস্ত্রশস্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করা যদি সিদ্ধান্ত হয়, একটি বড় দেশকে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। একমাত্র যদি বাইরে থেকে সামরিক চাপ দেওয়া যায় তা হলে অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক শক্তিসমূহ নতুন সামরিক শক্তি সরবরাহে বাধা দিতে পারে যার ফলে সামরিক শক্তি ভেঙে পড়বে।

এখন যা পরিস্থিতি তাতে ভারতে সরাসরি প্রভাব কার্যকর করতে জার্মানির আরও দু'-এক বছর লাগবে। অপরপক্ষে জাপানের প্রভাব কয়েক মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারে। অতএব বসুর উচিত জাপানিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা শুধুমাত্র ভারতের ঘটনাবলির ওপর প্রভাব ফেলবার জন্য নয়, জাপানিরা যাতে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ভুল না করে সে জন্য তাদেরকে সঠিক পরামর্শও দেওয়ার জন্য।

তবে, ফ্যুরের বিমান যাত্রার বিরুদ্ধে বসুকে সতর্ক করে দেন, পাছে সেই যাত্রার পথে তিনি ব্রিটিশ ভূখন্ডে অবতরণ করতে বাধ্য হন। বসু এতই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব যে সে রকম কোনও পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন করা যায় না। তাঁর জন্য অধিকতর নিরাপদ কোনও যাত্রার পরিকল্পনা করা উচিত। একটি জাপানি ডুবোজাহাজ ইউরোপে সেই সময়ে এসেছিল। সেটি যদি অনতিবিলম্বে ফিরে যায় বসুকে নিয়ে যেতে পারে। নচেৎ ফ্যুরের তার জন্য একটি জার্মান ডুবোজাহাজ দিতে পারেন যেটি তাকে ব্যাংককে নিয়ে যাবে। তারপর একটি মানচিত্রের সাহায্যে তিনি, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সেই যাত্রার জন্য প্রায় ছ'সপ্তাহ লাগতে পারে, সেটা দেখিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বসুর কাছে আরও ব্যাখ্যা করেন, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে ভারত এবং রাশিয়া যাত্রার পথ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে নাটাল এবং পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ডুবোজাহাজের বাধার সৃষ্টি করে।

কথাবার্তার মধ্যে বসু আরও দুটি অনুরোধ জানান। 'Mein Kampf' পুস্তকে এবং অন্য উপলক্ষেও হিটলার যে সমস্ত উক্তি করেছেন ব্রিটিশ প্রচারে তা অত্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই কারণে তিনি ফ্যুরেরকে অনুরোধ করেন যেন সময় সুযোগমতো ভারতের প্রতি জার্মানির মনোভাব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। ভারত সম্পর্কিত বিষয়গুলো তার ফলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বসু আরও অনুরোধ করেন জার্মানি যেন ভারতকে নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দান করে, যাতে তাকে একমাত্র জাপানের ওপর নির্ভর করতে না হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্যুরের এইভাবে ভারতের করণীয় কাজটি নির্দিষ্ট করেন: ব্রিটেনের প্রভাব লোপ করে দেওয়া, রাশিয়ার প্রভাব পরিহার করা, ভারতের পূর্ব সীমানার বিষয়ে জাপানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা এবং শেষত ভারতের অভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং পুনর্গঠন ভারতের ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে। এ-কাজ করা সময়সাপেক্ষ হবে, জার্মানির ঐক্য সাধনের তুলনীয় প্রক্রিয়ার কথা মনে রাখলে বলা যায় তার জন্য একশো থেকে দু'শো বছর লাগতে পারে।

তাঁর নিজের বিভিন্ন বিবৃতি যে বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ফ্যুরের তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন, আগে যে মনে করা হত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে তার সম্পর্কেই তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। পরাধীন জাতিগুলির দুর্বলতার কারণে তিনি মনে করতেন এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশেষত এই কারণেও যে, যাঁরা জার্মানিতেও একই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা চাইতেন ভারতীয় ধাঁচের অহিংস প্রতিরোধ জার্মানিতেও গ্রহণ করা হোক। এই নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

যুদ্ধের পর ভারতকে জার্মানির সাহায্যের প্রশ্নে ফ্যুরের মন্তব্য করেন যে তখন থেকে সেটা হবে শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা। বসুর ভোলা উচিত নয় যে কোনও দেশের শক্তি তার কামানের যতদূর পাল্লা তার চেয়ে বেশি দূর পৌঁছতে পারে না।

বিদায়ের সময় ফ্যুরের বসুর যাত্রা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সাফল্য কামনা করেন।

স্মিডট (Schmidt)

২৩

বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহকে প্রদত্ত বিবৃতি

জুন ১৯৪২[১]

ভদ্রমহোদয়গণ,

বিশ্বের সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি, আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি অতিশয় আনন্দিত এবং একজন সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্বের বিষয়ে যিনি অবহিত, সেই হিসাবে আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকেই স্বাগত জানাচ্ছি।

সংযোগ স্থাপনে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেব, যাতে আমার প্রতি আপনাদের কয়েকটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর থাকবে।

ভারত থেকে আমার যাত্রা নিঃসন্দেহে ঘটনাসংকুল ছিল, কিন্তু সে-যাত্রা কঠিন ছিল না, আজ আমাদের বন্ধুর সংখ্যা প্রচুর এবং ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের কয়েকটি সূত্রও আছে। এখন আর ব্রিটেনের এবং তার গুপ্ত বাহিনীর পক্ষে ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্ত পাহারা দেওয়া সম্ভব নয় এবং যখন ঠিক সময় আসবে তখন আমার ভারতে পুনঃপ্রবেশ কেউ আটকাতে পারবে না।

ভারত থেকে আমার নিষ্ক্রমণ কোনও একটি মস্তিষ্ক থেকে জন্ম নেয়নি। সমগ্র পরিকল্পনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে সযত্নে পরিকল্পনাটি রচনা করা হয়েছিল। আজ আমি এখানে এসেছি ভারতীয়দের এক বিরাট অংশের ইচ্ছা অনুসারে এবং দেশত্যাগের পর আমি যা কিছু করেছি, সেইসব তাদের সম্পূর্ণ সমর্থনলাভ করেছে। আমার সর্বক্ষণ যোগাযোগ রয়েছে, শুধুমাত্র ভারতের জনগণের সঙ্গেই নয়, আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যাঁদের সহায়তা ও সমর্থন আমার প্রয়োজন সেইসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গেও। আমি নিজেকে ভারতীয় জাতির সেবক বলে মনে করি, এবং বর্তমানে আমার কাজ ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান। *কিন্তু যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে, ভারতীয়দের কর্তব্য হবে ঠিক করা, তারা কী ধরনের সরকার চায় এবং ভবিষ্যৎ ভারত-রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব কে দেবেন। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠন সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব স্বাধীন ভারতকেই গ্রহণ করতে হবে।*

যতদিন আমি আমার দেশের বাইরে আছি ততদিন আমি এমন কিছু করব না ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ব্যাপকতম সমর্থন যার পেছনে থাকবে না।

আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, কেন আমি এই পর্যায়ে আমার যাত্রার বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারি না, কিন্তু এটুকু আমি আপনাদের বলতে পারি যে, বার্লিনে পৌঁছোবার

---

১. "আজাদ হিন্দ" পত্রিকা (৫-৬-১৯৪২)-তে প্রকাশিত।

আগে অনেক ভ্রমণ করেছি, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছি। আমার ভবিষ্যতের গতিবিধি সম্বন্ধে আমি শুধু বলতে পারি যে, একজন বিপ্লবীর কর্মপরিকল্পনা সর্বদা বিশেষ মুহূর্তের পরিস্থিতির সঙ্গে, এবং যে অবস্থার সম্পর্কে তিনি আগ্রহী তার প্রয়োজনের সঙ্গে, খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

মাস কয়েক আগে আমার মৃত্যুর সংবাদে আমি অতিশয় কৌতুক বোধ করেছিলাম। সেটা ছিল ব্রিটিশদের একটি অক্ষম প্রচার, যা তাদের উদ্দেশ্যটাকেই বিফল করে দিয়েছিল। আমি নিশ্চিত ব্রিটিশ প্রচারবিদেরা নিজেরাই সেটা নিয়ে এখন খুশি নয়।

ভারত ছেড়ে আসার পর আমার সামনে দুটোই প্রধান লক্ষ্য— প্রথম, পৃথিবীতে এখন কী ঘটছে, একপক্ষীয় প্রচার বাদ দিয়ে, সেটা জানা এবং দ্বিতীয়ত, বিদেশে ভারতের কোনও বন্ধু অথবা সঙ্গী আছে কিনা সেটা জানা।

আমার নিজের নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং অনুধাবনের দ্বারা এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের ঘটনাবলির যা জানতে পেরেছি তাতে আমি এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ব্রিটেন এই যুদ্ধে পরাস্ত হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস শুধু অবশ্যম্ভাবীই নয়, অবিলম্বেই ঘটবে।

দ্বিতীয় কথাটির প্রসঙ্গে বলি, ভারতে, ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রচারের সঙ্গে আমি যথেষ্ট পরিচিত ছিলাম এবং সেই কারণেই প্রকৃত সত্য অবগত হওয়ার জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফলে আমি এখন বিশ্বাস করি যে, ইতিহাসের নিয়মে ত্রিশক্তির রাষ্ট্রসমূহ— আমার স্বাভাবিক বন্ধু ও সহযোদ্ধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর প্রত্যেকটি আঘাত স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতকে সাহায্য করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা ভারতের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা।

হের হিটলার এবং সিনর মুসোলিনির সঙ্গে আমার কথোপকথন স্বাভাবিক কারণেই গোপন রাখতে হবে, কিন্তু আমি অকপটে বলতে পারি, তাঁরা এবং জাপানি গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধে দেশের বাইরে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রসঙ্গে, আমি আপনাদের অনুরোধ করতে চাই, ব্রিটিশ প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন এবং তারা অধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে চায়। তবে তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে যারা ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করে থাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কখনও কখনও আন্দোলনের গতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পার্থক্য দেখা গেলেও তারা সকলেই স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। কোনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে আমি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মনে করি না, যদিও নিজেকে আমি দেখি জাতীয় বাহিনীর পুরোধা হিসাবে।

ভারতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ হারিয়েছে। এখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা আসবে না।

অতএব সকল জাতীয়তাবাদী ভারতীয়কে এখন চেষ্টা করতে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের জন্য। এই সংগ্রামে কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী শুধুমাত্র অহিংস প্রতিরোধ অথবা আইন অমান্য আন্দোলনের অস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা সময় এলে তরবারি ধরতেও দ্বিধা করবেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি শক্তিশালী জোট

গঠন করেছে, বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখার এবং ভারতকে পরাধীন করে রাখার জন্য। বিদেশি সৈন্য এবং সামরিক সরঞ্জাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং চিন থেকে ঢালাও সরবরাহ করা হচ্ছে ভারতে। এ-রকম পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের কর্তব্য এবং অধিকার হল, যে কোনও সূত্র থেকে প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করা।

ভারত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায় আরম্ভ হয়েছে। তারপর থেকে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে এবং অনতিবিলম্বে তা টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করবে। ভারতে আমাদের সামনে যে কাজ অপেক্ষা করছে তা কত কঠিন আমার অজানা নেই। তা হলেও আজ ব্রিটিশ শক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া এবং চিরকালের জন্য নিজেদের স্বাধীন করা সম্ভব। আগামী মাসগুলিতে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

আমি জানি ব্রিটিশ প্রচার আমার নামে কটূক্তি করেছে, কারণ তাদের যে অসত্য বিবৃতি, ত্রি-শক্তি ভারতের শত্রু, আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করেছি এবং আমি বলেছি, ভারতের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করিনি কারণ কটূক্তি দুর্বলতারই প্রমাণ।

আমি নিশ্চিত জানি এই যুদ্ধে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হবে এশিয়া থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহিষ্কার এবং তার ফলে সারা পৃথিবীতে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবলভাবে প্রোৎসাহিত হবে।

২৪

আজাদ হিন্দ ফৌজের শপথ

ইউরোপে ইন্ডিয়ান লিজন-এর প্রতি ভাষণ, জুন ১৯৪২ বেতারযোগে প্রচারিত[১]

বীর সৈনিকগণ! আজ আপনারা শপথ নিলেন, ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার নীচে আপনারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। আজ থেকে আপনারা স্বাধীন ভারতের আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক। চল্লিশ কোটি ভারতীয়র দায়িত্ব আপনারা স্বেচ্ছায় নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। আজ থেকে আপনাদের মন, শক্তি ও অর্থ ভারতীয় জাতির সম্পত্তি।

বন্ধুগণ, আপনারা আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী সৈনিক হওয়ার গৌরব বহন করছেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আপনাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই ধর্মযুদ্ধে যারা শহিদ হবেন তাদের প্রত্যেকের মূর্তি স্বাধীন ভারতে স্থাপিত হবে। আপনাদের স্মৃতিস্তম্ভে আগামী প্রজন্ম পুষ্পবর্ষণ করবে। আপনারা অতি সৌভাগ্যবান, নিজেদের মাতৃভূমির সেবা করবার এই অমূল্য সুযোগ আপনারা লাভ করেছেন। যদিও আমরা এই অনুষ্ঠান বিদেশে পালন করছি, আমাদের মন এবং আমাদের হৃদয় আমাদের দেশেই আছে। মনে রাখবেন, আপনাদের সামরিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেসব দায়িত্ব বহন করবার জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, ভারতের স্বাধীনতার দামামা বেজে উঠেছে। সামনের সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে যাতে যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি তা আমরা বহন করতে পারি। আপনাদের আশ্বস্ত করছি সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন আপনাদের সামরিক দক্ষতা আপনাদের কাজে লাগাতে হবে।

আজ আমরা জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করছি। সময় আসছে যেদিন আপনারা এই পতাকাকে অভিবাদন জানাবেন লাল কেল্লায়। কিন্তু ভুলবেন না স্বাধীনতার মূল্য আপনাদেরকে দিতে হবে। স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, জোর করে তা আদায় করতে হয়। তার মূল্য শোধ করতে হয় রক্ত দিয়ে। আমরা কোনও বিদেশ থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা করব না। আমরা স্বাধীনতা লাভ করব তার মূল্য দিয়ে, সে মূল্য যতই হোক। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যখন ভারতে প্রবেশ করবে আমাদের বাহিনী, তাকে নেতৃত্ব প্রদান করব আমি। আমাদের এখানকার আজকের যে অনুষ্ঠান তার খবর ভারতে পৌঁছে গেছে। সেই সংবাদ স্বদেশে দেশপ্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করবে, যারা খালি হাতে ব্রিটিশদের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। সারাজীবন আমার উচ্চাভিলাষ একটি বাহিনীকে

১. ইউরোপে ইন্ডিয়ান লিজন-এর প্রতি ভাষণ এবং আজাদ হিন্দ বেতারে জুন ১৯৪২-এ প্রচারিত।

অস্ত্রসজ্জিত করব যারা শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে। আজ আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, সেইরকম একটি বাহিনীর সম্মান আপনাদের প্রাপ্য। এই কথা বলে আমি আমার ভাষণ শেষ করছি। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হন, আপনারা স্বেচ্ছায় যে শপথ আজ গ্রহণ করলেন তা পালন করবার শক্তি আপনাদের দান করুন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

সারা বিশ্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন

ব্যাংককে সম্মেলনের উদ্দেশে বার্তা[১], ১৫ জুন ১৯৪২

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বিশিষ্ট সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় আপনাদের সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের বার্তা পেয়ে আমি আনন্দিত। আমি যেহেতু নিজে তাতে যোগদান করতে পারব না, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার এই বার্তা পাঠিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ইউরোপে অবস্থিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখাসমূহও এই বার্তায় আমার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে।

ভারত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর বিদায় গ্রহণের পরেই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ের সূচনা হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে ভারতের ভিতরে কিংবা বাইরে যত জাতীয়তাবাদী আছেন সকলকেই তাঁদের ভূমিকা পালন করতে হবে। বিগত আঠারো মাস আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রামে ভারতের বাইরে ত্রি-দেশীয় শক্তিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং সহযোগী, এবং আমি নিঃসন্দেহ তারা সানন্দে আমাদের প্রয়োজনীয় সব রকম সহায়তা প্রদান করবে, কিন্তু ভারতের অধীনতা-মোচন প্রধানত ভারতীয়দের নিজেদেরই সাধিত করতে হবে। জাতীয় বাহিনীর আমরা যারা অগ্রগামী সৈনিক তাদের পবিত্র কর্তব্য জাতীয় সংগ্রামকে নেতৃত্ব প্রদান করে জয়যুক্ত করা। ভারতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে যদিও আমার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ধারণা আছে, নাগরিকদেরই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আঠারো মাস ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমি নিরপেক্ষভাবে যে পর্যবেক্ষণ করেছি তার ফলে আমি এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ব্রিটেন এই যুদ্ধে পরাজিত হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে কিংবা দুর্বল করতে যে-সব শক্তি চেষ্টা করছে, তারা ভারতের মুক্তিতে সহায়তা করছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে যারা চেষ্টা করছে তারা ভারতের দাসত্ব চিরস্থায়ী করতে চাইছে।

ভারতের বাইরে যে সব জাতীয়তাবাদীরা আছেন, তাদের গভীর সন্তোষের কারণ এই যে, ভারতস্থ সব জাতীয়তাবাদীরা ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ। আমরা যারা জাতীয় বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈনিক, তারা অবশ্য মনে করি যে, সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে অস্ত্রধারণ করবার সময় অদূরে। এবং আমরা আরও মনে করি যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সারা বিশ্ব থেকে সহায়তার সন্ধান করছে এবং বৈদেশিক সৈন্য ও বৈদেশিক সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে ভারতকে প্লাবিত করছে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে-কোনও সাহায্য

---

১. ১৫ জুন ১৯৪২-এর ব্যাংকক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির উদ্দেশে বার্তা।

কেউ দান করলে তা গ্রহণ করবার। উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় শক্তিসামর্থ্য পাওয়া গেলে ভারতীয়রা নিঃসন্দেহে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তাদের স্বাধীনতা লাভ করবে। চরম মুহূর্ত এলে, চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার ভারতে প্রবেশ কেউ রোধ করতে পারবে না।

আমি নিশ্চিত জানি, এই যুদ্ধে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বহিষ্কার যেটা জয়যুক্ত জাপানি সৈন্যবাহিনীর লক্ষ্য। ভারতের স্বাধীনতালাভ সারা বিশ্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন শক্তি যোগাবে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, ইউরোপে আজাদ-হিন্দ সংঘের শাখাসমূহ জাতীয় সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এর পরে যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন হবে তার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে। এখন সময় এসেছে সারা বিশ্বের জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার, যাতে তাঁরা এক বিশ্বব্যাপী সংগঠনে পরিণত হতে পারেন। আপনাদের সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি, এবং আন্তরিকভাবে আশা করি ও বিশ্বাস করি, জয়লাভের দিকে আমাদের অগ্রগতির পথে এটি হবে আরেকটি মাইল-ফলক।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

সুভাষচন্দ্র বসু

২৬

অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করুন

বেতার প্রচার, ১৭ জুন ১৯৪২[১]

স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ!

আনুমানিক পাঁচ বছর আগে আমি আপনাদের উদ্দেশে শেষ বেতার-ভাষণ দিয়েছি আজাদ হিন্দ বেতারে। তারপরে আমি অনেক ভ্রমণ করেছি এবং এখন আমি আছি জার্মানির কেন্দ্রস্থলে। বার্লিন হ্রস্ব-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতারের সৌজন্যে আমি বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটের মুহূর্তে আবার আপনাদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাই।

সর্বপ্রথমে আমায় আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে হয়, আপনাদের জাতীয় সম্মানবোধ এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানের জন্য, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে। এই প্রত্যাখ্যানের দ্বারা আপনারা শুধু যে ভারতকে তার স্বাধীনতার লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে আপনারা বিশ্বের দৃষ্টিতে নিজেদেরকে উচ্চতর স্থানেও তুলেছেন। তার ফলে আজ ভারত বিশ্ব-রাজনীতির প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে।

ভারত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর বিদায় গ্রহণের পর আমাদের দেশের বড় বড় ব্যক্তিরা চেষ্টা করেছিলেন, ব্রিটেনের যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে, ভারতের জাতীয় দাবি সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও নিষ্পত্তি ব্যতিরেকেই। সে-চেষ্টা যদি সফল হত, সেই হত ভারতবাসীদের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা। ধন্যবাদ দিতে হয় ভারতের জনমতকে এবং মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতাকে যে সেই বিপদ চিরতরে দূর করা গেছে। এখন পরিষ্কার বোঝা গেছে, ভারতীয়রা ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ দেবে না। এখন একটিমাত্র সমস্যার সমাধান করা বাকি আছে, স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের কী করতে হবে।

সে বিষয়ে প্রথম কাজটি ইতিমধ্যেই করা হয়েছে ভারতের অধিবাসীদের এবং মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা। সে কাজটি হল, ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, এই দাবি করা, যাতে ভবিষ্যতে ভারতের রণাঙ্গনে পরিণত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে। তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের এখন কার্যকর পরিকল্পনা করতে হবে, এই দাবি যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট না স্বীকার করে তা হলে আমরা কী করব।

এটি একটি গভীর সন্তোষের বিষয় যে, ভারতের জনমত ভারতে পোড়া-মাটির নীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। আবার একবার মহাত্মা গান্ধী প্রয়োজনের সময়ে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

---

১. বার্লিনের হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতারে প্রচারিত ১৭ জুন ১৯৪২, এবং "আজাদ হিন্দ" পত্রিকা ৫-৬-১৯৪২-এ মুদ্রিত।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং আন্দোলন করে কাজ হবে না। ভারতের অধিবাসীদের কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করতে যখন বাধ্য হবে, তখন যথেচ্ছভাবে ভারতের সম্পদ যেন ধ্বংস করা না হয়।

বন্ধুগণ! যখন আমি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অমান্য করে ভারত পরিত্যাগ করে আসি, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, নিজে দেখা পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে এবং দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ভারতের সঙ্গী আছে কি না, তা দেখা। যতদিন আমি দেশের বাইরে আছি, আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি, নিজের কান দিয়ে শুনেছি, এবং এই বিশ্বযুদ্ধে দু'পক্ষের প্রচারই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। সেই কারণে এখন যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার বিষয়ে আমি নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক মতামত গঠন করতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বের ঘটনাবলির এই সুদীর্ঘ, কষ্টসাধ্য এবং সমালোচনামূলক অনুধাবনের পর আমার বিচার ভুল হবে, বিপথগামী হবে, তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এবং আমি আরও বলতে চাই যে, দেশত্যাগের পর আমি যা কিছু করেছি, কিংবা ভবিষ্যতে আমি যা কিছু করতে পারি তার সবই হয়েছে এবং হবে, আমার দেশকে দ্রুত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে এবং আমি এমন কিছু কখনই করব না, ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যার অনুমোদন করবেন না এবং আমি আরও বলব, ধূর্ত এবং অসৎ এবং মিথ্যাভাষণে পটু ব্রিটিশেরা যদি আমাকে প্রলুব্ধ করতে, অসাধুতার পথে নিয়ে যেতে না পেরে থাকে, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যারা সে কাজ করতে সক্ষম হবে। আমি ঘটনাচক্রে যখন যেখানেই থাকি, আমার আনুগত্য থাকবে ভারতের প্রতি, এবং একমাত্র ভারতের প্রতি।

ইউরোপে আসার পর থেকে আমি নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছি এবং সেই কারণে প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে দিনের পর দিন বিবিসি-র প্রচারিত (এখানে সুভাষচন্দ্র B.B.C- অর্থাৎ the British Broadcasting Corporation কে বলেছেন the Bluff and Bluster Corporation of London অর্থাৎ শূন্যগর্ভ, বাগাড়ম্বর ও আস্ফালনের প্রতিষ্ঠান— অনুবাদক) যাবতীয় মিথ্যার তুলনা করতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ব্রিটেন এই যুদ্ধে পরাজিত হতে চলেছে, এবং তার পরাজয় ও ধ্বংসের পর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে খণ্ডবিখণ্ড হতে পারে। আমরা সক্রিয়ভাবে ব্রিটেনের সহায়তাই করি কিংবা আমরা কঠোরভাবে নিরপেক্ষই থাকি, এই মহাসংগ্রামের অন্তিম পরিণতির তাতে বিন্দুমাত্র কোনও পরিবর্তন হবে না। এইরকম পরিস্থিতিতে এটা শুধু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কাজই হবে না, অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজও করা হবে, ভারত যদি কোনও গতিশীল ভূমিকা পালন করে। নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা ভারতকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাতে ধ্বংস হয় তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে, যাতে সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে একটি স্বাধীন ও বিজয়ী ভারতের জন্ম হয় যা হবে ভারতীয়দের সৃষ্টি।

তবে, এই সংগ্রামে বিদেশ থেকে কিছু সাহায্য প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বে বিগত দু'শো বছরব্যাপী যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে আমি সযত্নে তা জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি এমন একটি দৃষ্টান্তও দেখিনি বাইরের কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হওয়ার। যখন শত্রু এক শক্তিশালী বিশ্ব সাম্রাজ্য, তখন সাহায্যের প্রয়োজন আরও বেশি এবং সেই শক্তিশালী বিশ্ব সাম্রাজ্য অর্থাৎ ব্রিটেন যখন অন্য কয়েকটি শক্তি-সমবায়ের দ্বারা সমর্থিত তখন যে-কোনও সহায়তা যা অন্যদের কাছ থেকে আমরা পেতে পারি, তা গ্রহণ না করা হবে মূর্খতার চূড়ান্ত। ব্রিটেন যখন আমেরিকা, চিন, আফ্রিকা থেকে

এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে সমরোপকরণ ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে ভারতে ঢেলে দিচ্ছে, তখন অন্য কোনও জায়গা থেকে আমরা সাহায্য নিলে সে বিষয়ে কোনও অভিযোগ একজন ব্রিটিশের মুখে শোভা পায় না। অবশ্য ভারতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার প্রয়োজনে কী সাহায্য সে গ্রহণ করবে, এবং সেইরকম সাহায্যের প্রয়োজন তার যত কম হবে ততই ভাল।

আমরা সাহায্য কিংবা সহায়তা একমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করতে পারি যাঁরা আমাদের বন্ধু ও সহযোগী। বর্তমান ক্ষেত্রে, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের জন্য চেষ্টা করছে, তারা কাজ করছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য এবং তারাই আমাদের বন্ধু ও সহযোগী এবং অপরপক্ষে যারা সেই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে, তাদের একমাত্র প্রয়াস সেই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা আমাদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য। তবে এই তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য ছাড়াও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ত্রিশক্তি ভারতের বাইরে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মিত্র ও সহযোগী।

আমি জানি স্বামী সহজানন্দের মতো বন্ধুরা হয়তো ত্রিশক্তির আন্তরিকতা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হচ্ছে, নিঃসন্দেহে সে-কাজ তারা করবে। উপরন্তু সমগ্র বিশ্ব, ত্রিশক্তি সমেত লাভবান হবে যদি ভারত নিজেকে স্বাধীন করতে পারে এবং একমাত্র যে দেশটি ভারতের স্বাধীনতালাভে দুঃখিত হবে সেটি হল ব্রিটেন।

ভারতের ইতিহাসের এই চরম মুহূর্তে শুধুমাত্র মতাদর্শগত বিবেচনায় যদি আমরা ভেসে যাই, সে হবে এক মারাত্মক ভুল। জার্মানি কিংবা ইতালি কিংবা জাপানের অভ্যন্তরীণ নীতিতে আমাদের কিছু যায় আসে না, সে-সব হল একমাত্র দেশের অধিবাসীদের চিন্তার বিষয়। কিন্তু একটি শিশুরও বুঝতে পারা উচিত যে ত্রিশক্তির অভ্যন্তরীণ নীতি যাই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা, যে আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় শত্রু। আমরা কি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি না, মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা করছে?

সেইসময় অনেক আগেই এসে গেছে, যখন আমার বন্ধু এবং সহযোগীদের স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে পৃথক করতে শিখতে হবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি ভারতীয়দের নিজেদেরই বিবেচনার বিষয় এবং সেইটাই হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক নীতি হওয়া উচিত ব্রিটেনের যারা শত্রু তাদের সঙ্গে সহযোগিতা। আমি যেমন সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক ক্ষেত্রে ত্রিশক্তির রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা সমর্থন করি, তেমনি আবার নিজস্ব জাতীয় ক্ষেত্রে সমর্থন করি সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতিতে আমি কোনও হস্তক্ষেপ কখনও বরদাস্ত করব না। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমার মতামত আজও ঠিক তাই আছে আমি যখন দেশে ছিলাম তখন যা ছিল।

কেউ যেন ভুল করে মনে না করেন, ত্রিশক্তির সঙ্গে বৈদেশিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার অর্থ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য স্বীকার করে নেওয়া এমনকী তাদের মতাদর্শ মেনে নেওয়া।

আজ আমার কাজ মুক্তির উদ্দেশ্যে ভারতের অন্তিম সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান। কিন্তু সে-কাজ যখন সম্পন্ন হবে, ভারত স্বাধীন হবে, তখন আমার কাজ হবে দেশবাসীর সামনে

দাঁড়িয়ে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা। তাঁরা কীরকম সরকার চান এবং জুন ১৯৪০-এ যখন আমাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার আগে মহাত্মা গান্ধীকে আমার বিদায় জানাবার সময়ে যা বলেছিলাম আমার মিশন সম্পূর্ণ হলে, ভারত স্বাধীন হলে আমি আবার তাঁর সামনে আসব।

বন্ধুগণ, আমাদের সকলের এটা একটা আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে ত্রিশক্তির সম্পূর্ণ কূটনৈতিক সমর্থন সহকারে দূর প্রাচ্যে আমাদের দেশবাসীগণ আমাদের মাতৃভূমির আশু স্বাধীনতা লাভের পন্থা-পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য এখন সমবেত হচ্ছেন। আমি এ-কথা প্রায়ই বলেছি, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম পর্যায় আরম্ভ হয়েছিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর ভারত থেকে বিদায়ের সঙ্গে। আমরা অল্প দিনের মধ্যেই একটা পর্যায়ে পৌঁছোব যখন আমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে, যদি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীসমূহ স্বেচ্ছায় এদেশ থেকে চলে না যায়। সেই শুভদিনের জন্য সেই সঙ্গে প্রস্তুত হন। ভারত থেকে পলায়নের আগে ধ্বংসকারীরা যাতে যথেচ্ছভাবে ধ্বংসকার্য না চালাতে পারে সেজন্য সারা দেশে সংগঠন গড়ে তুলুন।

বন্ধুগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন এমন টলমলে অবস্থায় পৌঁছেছে যে, আমার স্থির বিশ্বাস সঠিক নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে ভারতীয়রা তাদের মুক্তি নিজেরাই সাধন করতে পারবে। *সে মুক্তি আসতে আর বিলম্ব নেই এবং আমি আবার বলছি সেই প্রহর যখন আসবে আমি আপনাদের পাশে থাকব অন্তিম সংগ্রামে যোগদানের জন্য। যে-শক্তি ভারত থেকে আমার নিষ্ক্রমণ আটকাতে পারেনি তারা আমার প্রবেশও নিবারণ করতে পারবে না।* ইতিমধ্যে কারাগারে বন্দি আমাদের কমরেডদের প্রতি সুসমাচার পাঠান। তাঁরা যেন ধৈর্য ধরে সেই শুভলগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করেন। কারণ যখন স্বাধীনতার প্রভাত আসবে, তাঁরাই প্রথম তাকে স্বাগত জানাবেন এবং আমরা তাঁদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসব যাতে তাঁরা হবেন ভারতের স্বাধীনতার অন্তিম যুদ্ধের সৈনিক।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

গান্ধীকে সম্পূর্ণ সমর্থন

আগস্টের প্রথম দিক, ১৯৪২

ব্রিটিশ সরকারের যে-প্রস্তাবটি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে নিয়ে এসেছিলেন মূলত তাতে ছিল যুদ্ধের অবসানের পর ডমিনিয়ন স্টেটাস-এর প্রতিশ্রুতি এবং তার মধ্যে এই সম্ভাবনা ছিল যে ভারতকে দুটি অথবা ততোধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হবে, মুসলিম লিগের পাকিস্তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী। ভারতীয়রা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ১৪ এপ্রিল ভারত ত্যাগ করেন তাঁর মিশন বিফল হওয়ার পর। ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলির এবং মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ ও জনগণের সমর্থন লাভ করেন। ভারতীয়দের একটি অংশ, যাদের এখনও ব্রিটেন এবং আমেরিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটেনি, তাঁদের কাছে এটা বিস্ময়করভাবে অদ্ভুত মনে হয় যে, ব্রিটেনের শ্রমিক দল ও গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক দল ভারতের দাবি সমর্থন করল না, আগ বাড়িয়ে ক্রিপস-এর অদ্ভুত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভারতীয়দের ধিক্কার জানাল।

তাঁর ব্যর্থতাকে আড়াল করবার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ইংল্যান্ডে বুক ফুলিয়ে বলতে লাগলেন, তিনি অন্তত একটি অক্ষশক্তি-বিরোধী নীতির প্রতি সক্রিয় জনসমর্থন একত্র করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমে তাঁর সেই দাবি হঠাৎ সমর্থন করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তাঁর নতুন অবস্থান অনুযায়ী। নেহরুর ঘোষণায় ছিল ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে যদিও কোনও আপস হয়নি, তা সত্ত্বেও ভারতের কর্তব্য এবং ভারতের স্বার্থে প্রয়োজন, ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা। তাঁর নীতির অর্থ কার্যত মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিঃশর্ত সমর্থন। তবে নেহরু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কোনও অংশের সমর্থন লাভ করতে পারলেন না এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির চারশো জন প্রতিনিধি যখন এলাহাবাদে এপ্রিল মাসের শেষভাগে সম্মিলিত হলেন, তাঁরা নেহরুর নেতৃত্ব স্বীকার না করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল:

১) কংগ্রেস এমন কোনও প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারে না, যা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে না।

২) ভারত তার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না অন্য কোনও বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ অথবা আক্রমণের দ্বারা।

৩) কোনও বিদেশি শক্তি ভারত আক্রমণ করলে তার প্রতিরোধ করতে হবে, তবে কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে।

৪) কংগ্রেস ভারতে বিদেশি সৈন্যবাহিনী আনয়নের অনুমোদন করে না।

এই প্রস্তাবের কারণে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই দাবি আর করতে পারবেন না যে, তিনি অক্ষশক্তি-বিরোধী নীতির প্রতি ভারতীয় জনসাধারণকে সক্রিয় সমর্থনে সম্মত করতে পেরেছেন।

কিছুকালের জন্য নেহরু একা হয়ে পড়লেন। জাতীয়তাবাদীরা কেউ তাঁর নীতির পক্ষে ছিলেন না। তারপর তিনি আবার গান্ধীর কাছাকাছি আসতে আরম্ভ করলেন।

তারপর কয়েকমাস ইঙ্গ-মার্কিন প্রচার সারা বিশ্বে সক্রিয় হয়ে উঠে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি সমর্থন এবং কংগ্রেসের নীতিকে তার তথাকথিত অন্যায় জেদের জন্য নিন্দা করে গেল। এমনকী চুংকিং-এর মুখপাত্র এবং এজেন্টরা একই সুরে গাইতে লাগল।

ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁরা ব্রিটেনের পক্ষপাতী, তাঁরা কাজ চালিয়ে গেলেন নিষ্ঠা সহকারে, ব্রিটিশদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করে। নিজেদের হাত আরও শক্ত করা এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল করার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আপসহীন জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। প্রকৃতপক্ষে যখন অনেক কংগ্রেসি, যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু, ডিসেম্বর ১৯৪১ কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন, অন্য কংগ্রেসি যাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপসের কথা চিন্তাই করেননি; তাঁদেরকে কারাগারেই রাখা হল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন ভারতে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি যখন প্রতিদিন মুক্তিপ্রাপ্ত কংগ্রেসিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, অন্য আপসহীন কংগ্রেসিদের দিনের পর দিন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি চলে যাওয়ার পরেও সেই গ্রেপ্তারি চলতেই থাকল। সেই নির্যাতনের প্রধান শিকার হলেন ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেসের বামপন্থীরা। সেটাই ব্রিটিশদের পরিচিত নীতি—'মধ্যপন্থীদের নিজের দলে জড়ো করে চরমপন্থীদের দমন করো।'

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর যেসব নেতা এখন জেলখানায় জেল খাটছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সর্দার শার্দূল সিং কবিশের, কার্যকারী সভাপতি; শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্গদেশে কংগ্রেস দলের সভাপতি; রুইকর, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি; কামাথ, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ভূতপূর্ব সদস্য; মহারাষ্ট্রের বাপাট; ইউ. পি-র ভি. ডি. ত্রিপাঠী; সীমান্তপ্রদেশের মইন আকবর শাহ; কেরালা, (কালিকট)-এর আবদুর রহমান; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্নপূর্ণাইয়া প্রমুখ।

ব্রিটিশ সরকারের উক্ত নীতি চূড়ান্ত আকার ধারণ করল যখন ফরওয়ার্ড ব্লককে বেআইনি সংস্থা ঘোষণা করা হল (জুন ১৯৪৮-এর ২৩ তারিখে)

মে, ১৯৪২ থেকে গান্ধী একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। ব্রিটিশের পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁরা জানতেন তাঁরা কী চান এবং তাঁরা নিজেদের পথে চলেছেন। আপসহীন জাতীয়তাবাদীরাও তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা যে-কোনও উপায়ে ব্রিটেন-এর সঙ্গে সংঘর্ষের পরিকল্পনা চালিয়ে গেছেন, কোনও আপসের চিন্তা মাথায় না রেখে। এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যে গান্ধী কালক্ষেপ করে গেছেন। কিন্তু কালক্ষেপের নীতি বেশিদিন চালিয়ে গেলে একটি রাজনৈতিক দলের মৃত্যুর কারণ হয়। সেই কারণে শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে অচল অবস্থার অবসান করতে হল, নাহলে নিজেকে

সম্পূর্ণ অকেজো করে ফেলতে হত। তারপর যখন তিনি দেখলেন, ব্রিটিশদের দিক থেকে নতুন কোনও পদক্ষেপের লক্ষণ নেই, তখন তিনি একটা স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্যোগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (পনেরো সদস্যের কার্যকরী কমিটি) ওয়ার্ধাতে ১৯৪২-এর ১৪ জুলাই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল এই কথা ঘোষণা করে (অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে) যে, ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহার করতে হবে।

ভারত থেকে ক্রিপস-এর বিদায়ের পর কিছুকালের জন্য নেহরু হলেন ইঙ্গ-মার্কিনদের প্রিয়পাত্র, কারণ তিনি মিত্রশক্তিসমূহের প্রতি সক্রিয় সমর্থন চাইলেন। কিন্তু তারপর থেকে তিনি তাঁদের উষ্মা ও ক্রোধের কারণ। প্রথমে তিনি নিন্দা করলেন তাদের পোড়ামাটি নীতি। তারপর তাঁর স্লোগান হল ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ করতে হবে কারণ তা না হলে তাদের অবস্থিতি ত্রিশক্তির যুদ্ধ আরম্ভ করবার কারণ হবে। এ-কথা আমি যখন লিখছি ব্রিটিশেরা তাদের সমস্ত ক্রোধ তাঁর ওপরে কেন্দ্রীভূত করেছে। কারণ তিনি শুধু আইন-অমান্য আন্দোলনের ভয় দেখাননি, সেই ভীতি প্রদর্শনকে কার্যে পরিণত করবার সমস্ত রকম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছেন যদি ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহার না করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাবটি বোম্বাইয়ে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সামনে ৭ আগস্ট ১৯৪২ পেশ করা হবে সেটি ভাল করে অনুধাবন করা দরকার, কারণ সেটি থেকে তার প্রণেতার মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রস্তাবের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয়:

'ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন, শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে নয়, বিশ্বের নিরাপত্তা, জঙ্গিপনা এবং অন্যান্য ধরনের সাম্রাজ্যবাদ এবং একজাতির ওপর আরেক জাতির আক্রমণের অবসানের জন্য...

কংগ্রেস মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি চায় না, এবং জাপান কিংবা কোনও বিদেশি শক্তির ভারত আক্রমণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়।

কংগ্রেস ব্রিটেনের প্রতি বর্তমান বৈর-মনোভাব পরিবর্তন করে বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি করতে চায় এবং চায় যে পৃথিবীর জাতিসমূহের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের অবসানের উদ্দেশ্যে যৌথ উদ্যোগে ভারত যেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। সেটা সম্ভব হবে ভারত যদি স্বাধীনতার আলোক উপভোগ করতে পারে...

ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে কংগ্রেস গ্রেট ব্রিটেন কিংবা মিত্রশক্তিবর্গকে, তাদের যুদ্ধকার্য পরিচালনার কাজে কোনওভাবেই বিব্রত করতে চায় না। কিংবা কোনওভাবেই কাউকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে চায় না, কিংবা অবশ্যই চিনের ওপর জাপান কিংবা অক্ষশক্তিবর্গের কোনও চাপ চায় না এবং মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বিপন্ন হয়, সেটাও কংগ্রেস চায় না।

সেই কারণে ভারতে মিত্রশক্তিসমূহের সৈন্য মোতায়েনে কংগ্রেস সম্মত, তারা তাই চায় জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবং চিনকে সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে।

ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি প্রত্যাহারের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কখনওই এ ছিল না যে ভারত থেকে ব্রিটিশদের সবাইকে সরে যেতে হবে এবং তাদের অবশ্যই নয় যারা ভারতকে তাঁদের নিজের দেশ করতে চান এবং এখানে অন্যদের মতো নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে চান। সেরকম প্রত্যাহার যদি সদিচ্ছা সহকারে হয় তার ফলে একটি স্থিতিশীল অস্থায়ী ভারত সরকার স্থাপিত হতে পারে এবং সেই গভর্নমেন্ট ও সংযুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হতে পারে আক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিনকে সহায়তার জন্য।'

সরল মনে এ-রকম অলীক ধারণা কেউ না পোষণ করেন যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব আপসের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, এবং চাইছে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। বরং মহাত্মার প্রধান অনুগামীরা ১৪ জুলাই তাদের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর নানা বিবৃতিতে তাদের এই বাসনা জলের মতো পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে কংগ্রেস মিত্রশক্তি সমূহের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে চান এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করছেন যেন তাঁরা ভারতীয় প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের (যিনি একজন মুসলিম) এবং সর্দার বল্লভভাই পটেলের বিবৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে যদিও সর্দার পটেলকে ভারতের বাইরে বিশেষ কেউ চেনে না, কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদের মধ্যে তিনি মহাত্মার দক্ষিণ হস্ত।

এখানে আমার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, যখন কংগ্রেসের কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ গান্ধীপন্থীরা। যদিও কংগ্রেসের নামে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরাই, তবু অন্য গোষ্ঠী ফরওয়ার্ড ব্লকের বামপন্থীরা, যাঁরা আজ কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যালঘু হতে পারেন, তাঁরাই গান্ধীপন্থীদের খোলাখুলি ব্রিটিশ-বিরোধিতার পথে নিয়ে এসেছেন।

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে কোনও আপস যে হয়নি, তার কারণ পূর্বোক্তদের বিরোধিতা নয়, তার কারণ আপস যাতে সম্ভব হতে পারে তার জন্য ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন ছিল শেষোক্তরা তাও দিতে প্রস্তুত নন বলে। ঠিকমতো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কংগ্রেসের প্রস্তাব যা চেয়েছিল তা হল বাস্তবপক্ষে কাগজে কলমে স্বাধীনতা। সেই চুক্তি অনুযায়ী মিত্রশক্তিসমূহ ভারতে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করতে পারত, এবং ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত ভারতের মধ্যে সামরিক ঘাঁটি থেকে। মিত্রশক্তিরা সেই যুদ্ধে নতুন ভারত সরকারের সহযোগিতা দাবি করতে পারত। তার অর্থ দাঁড়াত এই যে, মিত্রশক্তিসমূহ কংগ্রেসের সম্মতিতে ভারতের ওপর তাদের অধিকার আরও বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারত এবং শেষপর্যন্ত ভারতকে যুদ্ধে টেনে নামাতে পারত, ইচ্ছুক অংশীদার হিসাবে।

ব্রিটিশদের দিক থেকে দেখলে, সেই প্রস্তাব থেকে তাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার কিছু ছিল না। কিন্তু ব্রিটেনের সময় খারাপ যাচ্ছিল, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দূরদর্শিতা অথবা কূটনৈতিক পারদর্শিতা এখন আর তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

এখনও ব্রিটেন শাসন করছে রক্ষণশীল দল এবং ওয়াশিংটন এবং চুং কিং-এর চাপ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করতে চায় না, নিম্নলিখিত কারণে:

১) তারা যুদ্ধ করছে সাম্রাজ্য বাঁচাতে। ভারতকে বাদ দিলে সাম্রাজ্যের আর কিছু থাকে না। ভারতকে যদি স্বাধীনতা দিতে হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোনও অর্থ থাকে না।

২) ওরা এখনও যুদ্ধে জিতবার আশা করে, এবং যুদ্ধে জিতে গেলে তারা আশা করে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দমন করতে পারবে।

৩) যুদ্ধের পর ভারতীয় সমস্যার সমাধান করবার জন্য ব্রিটিশের পরিকল্পনা হল পাকিস্তান, অর্থাৎ ভারতকে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা।

৪) রক্ষণশীলরা মনে করেন, যুদ্ধের মাঝখানে গান্ধীর সঙ্গে আপস করলে যুদ্ধোদ্যমে তাঁদের বিশেষ কোনও সুবিধা হবে না। তাঁরা মনে করছেন ইতিমধ্যেই

তাঁরা ভারত থেকে যে সাহায্য পাবার তা পাচ্ছেন। তা ছাড়া সাধারণভাবে ব্রিটিশরা স্বতঃই যুদ্ধের মধ্যে সরকারের পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয় এবং যখন যুদ্ধ চলছে তখন বড় কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তন পছন্দ করে না।

৫) ভারতের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া, এমনকী কাগজকলমে, ভবিষ্যতে অন্তহীন জটিলতার সৃষ্টি করবে, বিশেষত যখন যুদ্ধের পরে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁদের মাথায় অন্য মতলব আছে।

৭ আগস্ট ১৯৪২-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের জন্য আগে থেকেই ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্র জুলাই-এর মাঝামাঝি থেকে পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে। তাঁদের পক্ষের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিকে খোলাখুলি উক্ত প্রস্তাবকে নিন্দা করবার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বাইরে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করবার জন্য, যদি আইন অমান্য আন্দোলনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। তার ওপরে ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন ভারতীয়দের ভয় দেখাচ্ছে, গন্ডগোল বাধালে তার ফল মারাত্মক হবে। কিন্তু যাদের কেউ চেনে না এমন লোকেরা এদেশে যত প্রচার চালাক, তাতে কংগ্রেসের অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না এবং বাইরে থেকে কুৎসা রটনা করলে তাতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মনোভাব আরও দৃঢ় হবে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি বিপুল সংখ্যাধিকের ভোটে কর্মসমিতির প্রস্তাব সমর্থন করবে। এতেও সন্দেহ নেই, কংগ্রেস বিপুল জনসমর্থন লাভ করবে। কিন্তু ১৯২৮-এর এবং ১৯৩০-২-এর বড় বড় আন্দোলন থেকে আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি বলতে বাধ্য যে পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধী পরিস্থিতিটা ভুলভাবে পরিচালনা করবেন। প্রয়াত দেশবন্ধু সি আর দাশ, যিনি মহাত্মাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মহাত্মা যাঁর আড়ালে পড়ে গিয়েছিলেন, তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, গান্ধী সবসময়ে তাঁর আন্দোলন অতি চমৎকারভাবে আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রায়ই শেষ পর্যন্ত গোলমাল করে ফেলেন।

তা ছাড়া এই কথাটাও অগ্রাহ্য করলে চলবে না যে, অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে ব্রিটিশকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা যাবে না। অতএব গান্ধীজি যে ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান দাবি করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েও, এই সমগ্র আন্দোলনটির বিষয়ে মনোভাব কী হবে সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লক যে পন্থা গ্রহণ করেছে সেটি হল এইরূপ:

১) ভারত থেকে ব্রিটিশদের প্রত্যাখ্যান গান্ধী যে দাবি করেছেন সে বিষয়ে তাঁকে জোরালো সমর্থন এবং যাঁরা তাঁকে আক্রমণ করেছেন তাদের প্রতি ধিক্কার।

২) ভারতীয়দের উদ্দেশে বলা, ব্রিটিশদের সঙ্গে আপসের চিন্তা কোনও অবস্থায় না করতে। ব্রিটেন সেরকম কোনও প্রস্তাব যদি দেয়, তা হলেও এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে সম্মত হলেও।

৩) ভারতীয়দের এ বিষয়ে অবহিত করা যে ভারতে মিত্রশক্তির বাহিনী মোতায়েন করার অর্থ হবে ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং ভারতে অবস্থিত মিত্রশক্তির যে-সব ঘাঁটি তার ওপর আক্রমণ করতে তাদেরকে প্ররোচিত করা। অতএব ভারত

থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহারের দাবির মধ্যে ভারত থেকে মিত্রশক্তিসমূহের সৈন্যবাহিনীর অপসারণ এবং ব্রিটিশ অফিসারদের অপসারণের দাবিও থাকতে হবে। তাদের অপসারণ ব্যতীত আমরা যে স্বাধীনতা পাব সেটা হবে কাগজকলমে স্বাধীনতা।

৪) ভারতীয়দের বলতে হবে, অহিংস প্রতিরোধ যদি দেশের স্বাধীনতা আনতে ব্যর্থ হয় অন্তিম সংগ্রামে তাদের অস্ত্র ধারণ করতে হবে।

৫) ভারতীয়দের সাবধান করে দিতে হবে সংযুক্ত রাষ্ট্রের কাছে আবেদন নিরর্থক। বাস্তবিকপক্ষে সংযুক্ত রাষ্ট্রের অর্থ ব্রিটেন ও আমেরিকা, অন্য সব রাষ্ট্র পুত্তলিকা ছাড়া আর কিছু নয়। গত যুদ্ধে সারা পৃথিবীকে উইলসন-এর ১৪ দফা বোকা বানিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী রুজভেল্ট-এর অ্যাটল্যান্টিক চার্টার তাদের প্রতি আরও বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

৬) ভারতীয়দের বলতে হবে, ভারত কোনও অবস্থাতেই স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ এই যুদ্ধে সহযোগিতায় সম্মত হতে পারে না। ভারত খুব বেশি হলে নিরপেক্ষ থাকতে রাজি হতে পারে, যদি ব্রিটেন তার স্বাধীনতা স্বীকার করে। তাতেই ব্রিটেনের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং তার চেয়ে বেশি কিছু ভারত দিতে রাজি হতে পারে না, না হলে যুদ্ধ ভারতীয়দের নিজেদেরই তাদের দেশে টেনে আনা হবে।

লেশমাত্র সন্দেহ নেই, ভারতে যে সংকট উপস্থিত হয়েছে তা নিয়ে ব্রিটেন আজ অতিশয় বিচলিত, এই সংকট এমন সময়ে এসেছে যখন মিশরের পরিস্থিতি প্রায় অনিশ্চিত। অবশ্য তারা জানে যদি তারা যথেষ্ট পরিমাণে নৃশংস ও হিংস্র হয়, কিছু দিনের জন্য তারা ভারতের আন্দোলন দমন করতে পারে। তবু তারা নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এই সব কারণে:

১) এইরকম সময়ে নৃশংস আচরণ করলে তাতে বিশ্বে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ করতে অসুবিধা হতে পারে।

২) ভারতে যে আন্দোলন শান্তির সময়ে তুচ্ছ করা যেতে পারত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান সংকটের সময়ে সেটাই গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

৩) জনবিক্ষোভ ও অশান্তির ফলে যুদ্ধকালীন উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মনোবলের ওপরেও তার প্রভাব পড়তে পারে।

৪) আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মনে এমন তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে যে তারা বিদেশি শক্তির কাছে সাহায্য চাইতে পারে এবং এখন সেই সাহায্য পাওয়া সম্ভব।

৫) আইন অমান্য আন্দোলন যদি বলপ্রয়োগে দমিয়েও দেওয়া হয়, ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ওপর কোনও প্রথম শ্রেণির আধুনিক সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করা ব্রিটেনের পক্ষে সহজ হবে না, যখন ভারতীয় জনসাধারণ নিজেরাই প্রবলভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

বোম্বাইয়ে ৭ আগস্ট-এর সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি অধিবেশনের প্রাক্কালে ব্রিটিশ

ব্রডকাস্টিং করপোরেশন এবং সারা পৃথিবীতে তার সহযোগী বেতার- কেন্দ্রগুলি গান্ধীর বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক প্রচার আরম্ভ করেছে।

এইসব বেতার কেন্দ্রের মতে গান্ধীর অপরাধ, গত ২৭ এপ্রিল কংগ্রেস কর্ম সমিতির মূল প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন, ভারত জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। গান্ধীর এই প্রস্তাব নেহরুর কথায় সংশোধিত হয়েছিল।

গান্ধীর মূল প্রস্তাব আমি অতি যত্নসহকারে পাঠ করেছি। তাতে পুরোপুরি নতুন কথা কিছু নেই। কারণ গান্ধী মাঝে মাঝে তাঁর পত্রিকা 'হরিজন'-এ একই ধরনের কথা লিখছেন। কিন্তু বিবিসি এই বিষয়টি নিয়ে এত হইচই করছে চারটি কারণে:

প্রথমত, গান্ধী জাপানের সঙ্গে শান্তি চান ভারতে তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, এই কথা বিবিসি মিত্রশক্তিদের আকারে ইঙ্গিতে জানাতে চায়। একই সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছে বলে বিশ্বে ঘোষণা করার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চায়। তৃতীয়ত, ভারতে কঠোর এবং রক্তক্ষয়ী ব্যবস্থাদি গ্রহণের সাফাই গাইতে চায় বিশ্ব জনমতের সামনে, এবং শেষত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীর প্রতিপক্ষকে তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার একটা সুযোগ দিতে চায়।

যে চাতুর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা বিবিসি করেছে, সেটি গান্ধীকে অক্ষশক্তির এক গুপ্ত এজেন্ট প্রতিপন্ন করার শোচনীয়ভাবে বিফল হবে। ভারতের অভ্যন্তরে এতে কোনও কাজই হবে না এবং ভারতের বাইরে গান্ধীকে কিছুমাত্র যাঁরা জানেন, তাঁরা একে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেবেন না। ভারতে কংগ্রেসিদের মধ্যে সবাই গান্ধীর প্রস্তাবের কথা জানেন এবং তাঁদের কাছে এটা কোনও নতুন খবর নয়।

বহির্বিশ্বে বিবিসি-র এই নতুন খবর, এ রকম একটা ধারণা সৃষ্টি করবে গান্ধী নেহরুর মতো মতান্ধ নন, এবং তাঁর চেয়ে গান্ধী বেশি বাস্তববাদী। নেহরু অন্ধ অক্ষশক্তি-বিরোধী— কেউ বাধা দেবার না থাকলে ত্রিশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তিনি যতদূর প্রয়োজন যেতে পারতেন। আজ তাঁর মৌলিক নীতি ত্রিশক্তি-বিরোধিতা। অপরপক্ষে গান্ধীর প্রথম কথাই অহিংসা। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন যেহেতু স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে না, তাই গান্ধীকে ব্রিটিশদের সঙ্গে একটি আপসের কথা ভাবতে হচ্ছে এবং তিনি আপস চান বলে অক্ষশক্তি-পক্ষপাতী বিদেশনীতি তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। অক্ষশক্তি অনুকূল নীতি স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষ এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদ।

গান্ধী যেহেতু অন্ধমতাদর্শপন্থী নন, তাঁকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে প্রকৃত সামরিক পরিস্থিতি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রচার-কার্য তাকে প্রভাবিত করেছে।

উপরোক্ত প্রস্তাবে তিনি যে পন্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটা ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে যে লাইনের ইঙ্গিত দিয়ে আসছে, তারই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আজ আমার মনে পড়ছে ১৯৪০-এর জুন মাসে ওয়ার্ধার নিকটে তার গ্রামের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার যে দীর্ঘ কথা হয়েছিল, আমাকে জেলে নিয়ে যাবার আগে সে সময়ে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তার সঙ্গে উপরোক্ত প্রস্তাবে ব্যক্ত তার মতামতে অনেক পার্থক্য। এবং আমাদের ভুললে চলবে না, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ গান্ধী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের উচিত যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

তবে গান্ধীর এই পরিবর্তনে এবং আমাদের প্রচার-সাফল্যে আমরা যতই খুশি হই, আমরা

যেন অসম্ভবের প্রত্যাশা না করি। গান্ধী প্রকাশ্যে অক্ষশক্তির পক্ষে প্রচার করবেন এমন আশা বাতুলতা। তিনি তাঁর নিজের অহিংসা মন্ত্রে আটকে গেছেন। তার ফলে ওরকম নীতি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবে যথাসময়ে। তাকে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন দিতে হবে। কিন্তু সেই আন্দোলন শিথিল হয়ে যাবার আগেই তাকে নতুন একটা মোড় দিতে হবে এবং নতুন কার্যকর পদ্ধতির সাহায্যে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে যতদিন না ব্রিটিশদের ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

২৮

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

বেতারপ্রচার, ১৭ আগস্ট ১৯৪২[১]

বন্ধুগণ!

ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা স্বীকার করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বরাবরই অনিচ্ছা। রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা সবসময়েই পরিস্থিতির গুরুত্বকে খাটো করে দেখায়। আর তাদের সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর যা কিছু ঘটছে, তাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ইঙ্গ-মার্কিনদের যারা তাঁবেদারি করে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ভারতে এখানে-ওখানে গোলমাল বেধেছে, যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ, দিল্লি, পুণে, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, পাটনা, মাদুরা, আগ্রা, মোরাদাবাদ, নাগপুর, কানপুর, করাচি, কলিকাতা, সেকেন্দ্রাবাদ, ওয়ার্ধা, ঢাকা, তেনালি, জয়পুর, অমরাবতী, রামনাদ, মসুলিপট্টম এবং রাওয়ালপিন্ডি। বোম্বাই এ পর্যন্ত এই ঘোর দুর্যোগের কেন্দ্র।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে বোম্বাইতেই পুলিশকে নিরস্ত্র জনতার ওপর সাতবার গুলি চালাতে হয়েছিল। তাতেও হয়নি,. সন্ধ্যাবেলা আবার পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। বোম্বাইয়ে একদিন ২৭ জনের মৃত্যু হয়, ১৮৯ জন আহত হন। দিল্লিতে মৃত ও আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ এবং ৫৫। ব্রিটিশরা নিজেরাই যখন এ-কথা স্বীকার করছে তখন বুঝতে পারা যায়, ভারতে আজকের চিত্রটি কী।

যে-সব খবর নিরপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আসছে তাতে বোঝা যায় যে, ভারতে এখন বিপ্লবের অবস্থা। সর্বত্র সভা আর মিছিল চলছে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে। দিল্লি এবং অন্যত্র দলে দলে লোক গভর্নরের প্রাসাদের দিকে মিছিল করে যাচ্ছে ব্রিটিশেরা এ দেশ ছাড়ুক, এই দাবি জানাবার উদ্দেশ্যে। অনেক জায়গায় কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছেন, এবং মালিকেরা শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করছেন। রেলস্টেশনে এবং শ্রমিকদের বাসস্থানে ব্যাপক ধরনা চলছে এবং তার ফলে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষ বেধেছে। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশে দোকান-বাজার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থেকেছে। জাতীয় স্বাধীনতার দাবিতে স্কুল-কলেজে ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। ইংরেজদের প্রকাশ করা যে-সব সংবাদপত্র কংগ্রেস ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারকে নিন্দা করেছে, হাজার হাজার সে-সব কাগজ পোড়ানো হয়েছে এবং সেগুলোর জায়গায় কংগ্রেসিদের প্রকাশিত বুলেটিন পুলিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, ইংরেজদের রাজার চিত্র-সংবলিত ডাকটিকিট প্রচুর পোড়ানো হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রতীক

---

১. আজাদ হিন্দ বেতারে ১৭ আগস্ট ১৯৪২-এ প্রচারিত এবং "আজাদ হিন্দ" পত্রিকায় ৭/৮-এ প্রকাশিত (১৯৪২)

হিসাবে। স্মারক আদি, যেমন বোম্বাইয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্মারক যেগুলি ভারতের দাসত্বের প্রতীক, সেগুলিকে জনসাধারণ ধ্বংস করে ফেলেছে। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর যে আক্রমণ হয়েছে, দেশের প্রশাসন-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবার জন্য, সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। জায়গায় জায়গায় ট্রাম, বাস এবং রেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে। পুলিশ গুলি চালালে জনসাধারণ প্রত্যুত্তরে রেলস্টেশন আক্রমণ করেছে এবং রেললাইন ভেঙেছে। ডাক, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছে এবং তার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে ভবিষ্যতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন তার কাটা হলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড হবে। এবং সব শেষে যার কথা বলছি সেটাও তুচ্ছ করবার মতো নয়। জনসাধারণকে যখন ব্যাটন, কাঁদানে গ্যাস, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার মতো চূড়ান্ত প্ররোচনায় ফেলা হয়েছে, তখন তারা থানায় আগুন লাগিয়েছে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করেছে যার মধ্যে মিলিটারির জন্য খাদ্যও থাকে। নিরস্ত্র জনসাধারণ ও নির্মম সশস্ত্র বিদেশি সাম্রাজ্যের এই মহাসংঘর্ষের মধ্যে যেটা বেদনাদায়ক, সেটা হচ্ছে, এক দিকে সাঁজোয়া গাড়ি এবং আকাশ থেকে ফেলা বোমা, আরেক দিকে সাধারণ মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র বলতে পাথর ও সোডার বোতল।

স্বাধীনতার তূর্য ধ্বনিও এখন যাঁরা ব্রিটিশ পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে মিনারে যুদ্ধ করছেন সেই ভারতীয়রা শুনতে পেয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, আর কেউ কেউ অস্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে তাঁদের বিদেশি অত্যাচারীদের দিকে তাক করেছেন এবং তার পরে যে সংঘর্ষ হয়েছে তাতে একজন ব্রিটিশ জেনারেল নিহত হয়েছেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ব্রিটিশরা কয়েকটি ভারতীয় রেজিমেন্টের প্রতি বিশজন সৈনিকের একটিকে গুলি করেছে।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পণ করেছেন, এই জাতীয় অভ্যুত্থান দমন করবেনই। তাদের কাছে ভারতীয়দের জীবন সস্তা এবং তাই তারা যত ইচ্ছে গুলি চালাচ্ছেন। ভারতের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং অরক্ষিত। এ পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, ৭০০ জন হত, ৪৫০০ আহত। নারীরাও রেহাই পায়নি এবং প্রচুর সংখ্যায় তাদেরও জেলে পাঠানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা দমেনি, তাদেরকে রোখা যায়নি, সবচেয়ে যেটা উৎসাহজনক এবং প্রেরণাদায়ক তা হল, আন্দোলন দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ছে দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে, শহর থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে। দেশবাসীর প্রত্যেক অংশ এই সংগ্রামের অংশভাগী হয়েছে— মধ্যবিত্ত, ছোট ছোট দোকানদার, কারখানার শ্রমিক, ছাত্র। সেদিনও দূরে নেই যেদিন কৃষিজীবীরা দলে দলে এসে জাতীয় সংগ্রামে প্রবেশ করবেন। বন্ধুগণ! যখন পুরোদমে লড়াই চলছে, আপনারা এ-কথা শুনে উৎসাহিত বোধ করবেন যে, পৃথিবীর সংবাদপত্রে ভারতের সংবাদ এখন প্রথম পাতায়, সারা বিশ্বে বেতার প্রচারে ভারতের খবর সবচেয়ে আগ্রহপূর্ণ। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা পৃথিবীর কোনায় কোনায় প্রচার করা হয়, যার ফলে প্রত্যেকে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারতের ঘটনার খুঁটিনাটি সব জানতে পারে।

শুনে আরও ভাল লাগে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই যুদ্ধে ভারত একা নয়। বিশ্বের যতগুলি রাষ্ট্র এখন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা সকলেই ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে, এবং ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারের সমস্ত কৌশল সত্ত্বেও বিশ্বের জনমত আমাদের সংগ্রামে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের দুঃখযন্ত্রণা যত বাড়ে, যত আমরা যুদ্ধ করি, বিদেশে তাদের

কাছ থেকে আমরা তত বেশি সহানুভূতি ও সম্ভ্রম লাভ করি এবং মর্যাদা ও গর্বে সারা পৃথিবীর ভারতীয়দের মাথা উঁচু হয়।

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করে আরও বলতে চাই, শুধু যে সারা বিশ্বের জনমত আমাদের পক্ষে আছে তাই নয় বিদেশের ভারতীয়রা এখন সম্পূর্ণ জাগ্রত, যত রকম ভাবে সম্ভব বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি কাজে লাগাতে এবং ভারতের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা যথাসাধ্য করছেন। দূরপ্রাচ্যে, আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন এই সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সর্বত্র সভা ইত্যাদির আয়োজন করেছেন। যে কোনও সময়ে আপনাদের যদি বিদেশ থেকে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শুধু চেয়ে পাঠালেই হবে। বিদেশে আপনাদের স্বদেশবাসীরা আপনাদের যা প্রয়োজন, তা নিয়ে দ্রুত হাজির হবেন।

গত দু'দশকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ের মধ্যে আমি থেকেছি, ১৯২১ থেকে ১৯৪০। স্বভাবতই আমার দুঃখ হয়, আজ আমি এই অন্তিম আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য দেশে নেই। কিন্তু সে দিনের আর বেশি দেরি নেই, যে-দিন আমি আপনাদের পাশে থাকব। ততদিন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে, আমার কর্তব্য হবে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো, বর্হিবিশ্বকে ভারতের পরিস্থিতির সমস্ত তথ্য সম্পর্কে অবহিত রাখা এবং ব্রিটেনের যারা শত্রু তাদের কাছ থেকে ভারতের প্রয়োজনীয় সহানুভূতি ও সহায়তা আদায় করা।

১৯২১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আন্দোলনে অর্জিত আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আমি আপনাদের নিম্নলিখিত পরামর্শ দিতে পারি, যার দ্বারা আমার বিশ্বাস, এই সংগ্রামে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

প্রথমত, সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলুন এবং পর্যায়ে পর্যায়ে সারা দেশেও ছড়িয়ে দিন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও আন্দোলনের পরিকল্পনা করবার সময়ে জনসাধারণের কোনও ক্ষতি যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে। আপনাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবলমাত্র প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষতি করা।

তৃতীয়ত, আপনাদের আন্দোলনের ধরন এখন বদল করে নিরস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে রূপান্তরিত করুন। যুদ্ধের দুটি লক্ষ্য থাকতে হবে, ভারতে ব্রিটেনের যুদ্ধ-সংক্রান্ত উৎপাদন ধ্বংস করা এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া।

চতুর্থত, বিবিসি-র ইউরোপীয় পরিষেবায় কর্নেল ব্রিটন-এর প্রচার শুনুন এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে কর্নেল ব্রিটন-এর কৌশল কাজে লাগান।

পঞ্চমত, জনসাধারণের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলি উপযোগী হতে পারে:

(ক) ব্রিটিশ সামগ্রীর সম্পূর্ণ বয়কট।

(খ) সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জনসভার আয়োজন।

(গ) সারা দেশে মিছিল করে উচ্চ সরকারি পদাধিকারীদের বাসস্থানে যাওয়া, ভাইসরয় থেকে তাঁর নিম্নস্থ সকলের বাসস্থানে।

যদি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তা হলে তাঁরা এবং তাঁদের সকলে যেন এখনই ভারত ছেড়ে চলে যান— এই দাবি করা।

(ঘ) মিছিল করে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে, সেগুলি দখল করা, যেমন আদালত, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি, সেখানে সমস্ত কাজকর্ম অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

(ঙ) সমস্ত আইন অমান্য, যদি তার দ্বারা প্রশাসনকে বিব্রত করা যায়।

(চ) যে-সব ভারতীয় অফিসার ব্রিটিশ-পক্ষপাতী, তাঁদের সামাজিকভাবে একঘরে করা।

(ছ) দেশে সমস্ত ব্রিটিশদের সামাজিক বয়কট।

(জ) কর দেওয়া বন্ধ করুন, যদি তার ফলে আপনাদের বেশি কষ্ট ভোগ না করতে হয়।

(ঝ) পুলিশ এবং মিলিটারি আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে রাস্তায় বাধার সৃষ্টি আরম্ভ করুন।

(ঞ) যে-সব ব্রিটিশ অফিসার এবং জেল-অফিসার লোকের ওপর অত্যাচার করতে বেশি উৎসাহ দেখাবেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

ষষ্ঠত, কারখানা, বিশেষত যুদ্ধসংক্রান্ত কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট আরম্ভ করতে হবে, তা যদি সম্ভব না হয় তাঁদের কারখানা 'ধীরে চলো' নীতিতে চালাতে হবে।

তা ছাড়া তাদের ছোটখাটো অন্তর্ঘাত করতে হবে, নাট-বল্টু সরিয়ে ফেলা, স্টিমের চাপ কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি, যদি তাতে কাজে বিঘ্ন ঘটায় অথচ শ্রমিকদের নিজেদের খুব বেশি কষ্ট ভোগ করতে না হয়।

সপ্তমত, চাষিদের সমস্ত কর দেওয়া বন্ধ করতে হবে, যে-সব কর ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করে, যদি তাতে খুব বেশি কষ্ট না পেতে হয়।

অষ্টমত, ছাত্রদের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে অন্তর্ঘাতের জন্য গেরিলাবাহিনী তৈরি করতে হবে। প্রতিদিন তাদের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে বলে ব্রিটিশ সরকারকে উত্ত্যক্ত করবার এবং প্রশাসন যন্ত্রকে বিকল করবার জন্য, যেমন, ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে গিয়ে তাদের পদত্যাগ দাবি করা।

নবমত, নারীদের, বিশেষত ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে গুপ্ত সংবাদবাহক হিসাবে এবং গুপ্ত কর্মী হিসাবে এবং যাঁরা সংগ্রাম করবেন তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য।

দশমত সরকারি অফিসে এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত কল-কারখানায় করণিকদের ধীরগতিতে এবং অদক্ষ-ভাবে কাজ করতে হবে, এবং তাদের প্রভুদের যতটা সম্ভব অসুবিধা ঘটাতে হবে।

একাদশত, ব্যবসায়ীদের ইংরেজ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কারবার করা বন্ধ করতে হবে।

দ্বাদশত, যে-সব সরকারি অফিসার আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত, তাঁদের এখনই পদত্যাগ করার দরকার নেই।

ত্রয়োদশত, ইংরেজদের বাড়িতে পরিচারিকাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে, কোনও না কোনও অজুহাতে ধর্মঘট করবার জন্য, যেমন বর্তমান বেতনের দ্বিগুণ বেতনের জন্য। তাঁদেরকে বলতে হবে, নিকৃষ্ট খাদ্য রান্না করতে, কিংবা খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে অবাঞ্ছিত বস্তু মিশিয়ে দিতে, যাতে ইংরেজদের পক্ষে ভারতে বসবাস অসম্ভব হয়। অনুরূপভাবে ইংরেজদের জনসমক্ষে বেরোনো অসম্ভব করে দিতে হবে।

চতুর্দশত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত দৃশ্যমান প্রতীক যতদূর সম্ভব নষ্ট করে রাখতে হবে, যেমন, ডাকটিকিট, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি।

পঞ্চদশত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং ডাক পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাবার সবরকম প্রচেষ্টা করতে হবে। তেমনি, পরিবহণ অর্থাৎ ট্রাম, বাস রেল পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে হবে, বিশেষত যখন সৈন্যদের স্থানান্তর করা হচ্ছে, কিংবা যুদ্ধের উপকরণাদি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ধরনের অন্তর্ঘাতে বিনা প্রয়োজনে জনসাধারণের অসুবিধা যেন না ঘটানো হয়।

পরিশেষে, আমি বলতে চাই, এই আন্দোলন সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে হবে। এই সব কাজ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দরকার হলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে তাকে দমন না করা যায়। এই গেরিলা যুদ্ধ যতদিন দরকার চালিয়ে যেতে পারলে স্বাধীনতা আসবে, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরাজয়ের সম্মিলিত ফল হিসাবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবে।

বন্ধুগণ! নেতাদের সকলকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে বলে মনখারাপ করবার কোনও কারণ নেই। বরং, তাঁদের বন্দিত্ব সমস্ত জাতির অন্তহীন অনুপ্রেরণার কারণ হওয়া উচিত। বিগত কুড়ি বছর আমরা কি শিখিনি, যখন সমস্ত নেতারা জেলখানায় বন্দি, তখন আন্দোলন কী করে চালিয়ে যেতে হয়? যে-সব নেতাদের আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারা কর্মপরিকল্পনা রেখে গেছেন, সেই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে আপনাদের, তার ফলাফল যাই হোক, প্রত্যেক রণাঙ্গনে আপনাদের লড়াই করতে হবে, সবরকমভাবে, যাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার পতন ঘটে।

বন্ধুগণ! আমার কোনও সন্দেহ নাই, আপনারা জানেন, ভারতের সংগ্রাম, শুধু ভারতেই নয়, বিশাল পৃথিবীব্যাপী চলছে— প্রত্যেক রণাঙ্গনে, যেখানে ইতিহাস রচিত হচ্ছে। যেসব শক্তি এখন এই অভিশপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য যুদ্ধ করছে, তারা শুধু নিজেদের জন্যই লড়াই করছে না, সেই সঙ্গে ভারতের জন্যও যুদ্ধ করছে। ভারতকে স্বাধীন করার মূল দায়িত্ব ভারতের মানুষকেই বহন করতে হবে। অতএব এ-কাজ আপনাদেরই হবে, এই যুদ্ধকে তার অন্তিম জয় পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার কাজ, তাতে দুঃখ কষ্ট, ত্যাগ স্বীকার, যতই আসুক। স্বাধীনতা শহিদের রক্ত ব্যতীত আসে না, এবং সেই মূল্য না দিয়েও স্বাধীনতা যদি লাভ করা যেত, সেটা লাভ করার যোগ্য হত না। রক্তের অভিষেকই জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের এবং তাকে রক্ষা করার শক্তি দান করে।

সারা বিশ্ব এখন দেখতে পাচ্ছে, যে কোমল মখমলের দস্তানায় ব্রিটেনের লৌহমুষ্টি আবৃত ছিল, সেটি তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এবং নগ্ন, নির্লজ্জ পাশবিক শক্তিএখন ভারত শাসন করছে। গ্যাসের ঘন পর্দার আড়ালে, পুলিশের ব্যাটনের আঘাতের তলায়, বুলেটের নিরন্তর আওয়াজের মধ্যে এবং আহত ও মরণোন্মুখের অদম্য অবাধ্যতার মধ্যে ভারতের আত্মা জিজ্ঞাসা করছে, "সেই স্বাধীনতা কোথায়?" সাত সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে গিয়ে ওই প্রশ্ন পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে যাচ্ছে, কিন্তু ওয়াশিংটনের কোনও জবাব নেই। ক্ষণিক বিরতির পর ভারত আবার প্রশ্ন করছে, "কোথায় আটলান্টিক চার্টার যা প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব সরকারের গ্যারান্টি দেয়?" এবারে ডাউনিং স্ট্রিট এবং হোয়াইট হাউস একসঙ্গে উত্তর দিচ্ছে, "সে চার্টার ভারতের জন্য নয়।"

এই হল সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাকে ভারতবাসী অত ভাল করে জেনে এসেছে, সেই ১৮৫৭ সাল থেকে, যখন নির্দোষ এবং নিরস্ত্র জনসাধারণকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হল সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্য তার ভারত-সংক্রান্ত নীতিতে শুধু

রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলের নয়, শ্রমিক দলেরও পূর্ণ সমর্থন পেয়ে এসেছে। আজ সেই সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে। জগতের সামনে তার মুখোশ খুলে পড়েছে। কিন্তু ভারতের ভয়ের কিছু নেই। নির্যাতন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তার চিত্ত জেগে উঠেছে এবং সন্ত্রাস ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে সে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে।

বন্ধুগণ, গণহত্যার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যখন আপনাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতা লাগাম ছাড়া হয়ে উঠেছে, তখন এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলবেন না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার শেষ সম্বল দিয়ে লড়াই করছে।

আপনারা কি আশা করছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার শেষ আঘাত না হেনেই হার মানবে? না, বন্ধুগণ, প্রস্তুত থাকুন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী, আটলান্টিক চার্টারের যাঁরা প্রণেতা, তাঁরা আগামী দিনে তাঁদের যথাসাধ্য করবেন আমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে সবচেয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাই এই চরম মুহূর্তে আপনাদের সমস্ত শক্তি ও সাহস সংহত করুন। ভ্রাতা এবং ভগিণীগণ! সাহসী হন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যান কেননা স্বাধীনতা হাতের কাছে। আপনাদের স্লোগান হোক, "এখনই, নয়তো কখনও নয়"— "জয় অথবা মৃত্যু!"

২৯

ভারতের মহারণে যোগ দিন

বেতার প্রচার, ৩১ আগস্ট ১৯৪২[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বেতারে আপনাদের উদ্দেশে বলছি:

কমরেডগণ! দু'বছর আগে যখন আমি আপনাদের উদ্দেশে কথা বলছিলাম, তারপর ভারতের আন্দোলন অপ্রতিহত শক্তিতে চলেছে, এবং দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে। ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র সারা মাস চেষ্টা করছে এইরকম একটা ধারণা জন্মাতে যে, আন্দোলন এখন থিতিয়ে আসছে এবং পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে, কারণ একই সঙ্গে বিবিসি এবং তার এজেন্টরা খবর দিয়েছে, কিংবা বলা ভাল, দিতে বাধ্য হয়েছে যে সারা দেশে নিরস্ত্র নারী-পুরুষের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। আমি আপনাদের এ-বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারি যে খ্রিস্টীয় ১৯৪২ সালে ভারতকে আর বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না, ব্রিটেন যতই চেষ্টা করুক এই দেশের ওপরে পরদা টেনে দেওয়ার। বস্তুত, ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রত্যেকটি সংবাদ, ভারতের শহর ও গ্রামের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি গুলি বর্ষণ, রামনাথে কিংবা ওয়ার্ধাতে, বিক্রমপুরে কিংবা লক্ষ্ণৌতে, ঘটামাত্র তার খবর সারা পৃথিবীতে প্রকাশ করে দেওয়া হয়, রেডিয়োতে প্রচার করা হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সেইসব দেশে যে-সব দেশ মিত্রশক্তির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অথবা নিরপেক্ষ। কমরেডগণ, আমি ভাল করেই জানি কীভাবে আগেকার সমস্ত আন্দোলনের সময়ে আমাদের কত কষ্ট করতে হয়েছিল, ভারতে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কীরকম অত্যাচার করছে, তা বাইরের জগৎকে জানাতে। আজ সে-সমস্যা নেই, এবং আমার আনন্দদায়ক কাজ বর্হিবিশ্বকে ভারতের ঘটনার বিষয়ে অবহিত করা এবং ভারতের এই দুঃখকষ্টের সময়ে তার যে সহানুভূতি ও সহায়তা প্রয়োজন তা যাতে সে পায় সেই চেষ্টা করা। আপনারা আজ যদি নিজেদের চোখে দেখতে পেতেন, নিজেদের কানে শুনতে পেতেন ভারতের মহাসংগ্রামের বিষয়ে আপনাদের বিদেশের বন্ধুরা কী প্রচার করছেন, আপনারা বুঝতে পারতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ থেকে ভারত কী পরিমাণ সহানুভূতি লাভ করছে এবং ব্রিটিশ অত্যাচার এবং সন্ত্রাস যত বাড়বে, ভারতের জন্য সহানুভূতি তত বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। যত আমাদের যন্ত্রণা বাড়বে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার যত বাড়বে, বিশ্বের চোখে আমাদের মর্যাদাও তত উচ্চ হবে।

কমরেডগণ, আমি আপনাদের আরও জানাতে চাই, আমরা যেমন সারা বিশ্বের জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করেছি, এও সম্ভব হয়েছে যে, আমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাহায্য আমাদের দাসত্বমোচনের জন্য, তাও আমরা বিদেশ থেকে পেতে পারি। কাজেই,

---

১. আজাদ হিন্দ বেতারে (জার্মানি) ৩১ অগাস্ট ১৯৪২-এ প্রচারিত।

সন্ত্রাস ও নৃশংসতায় যাবতীয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাদের যদি কখনও মনে হয় যে আপনারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছেন, এবং আপনারা যদি চান বিদেশের বন্ধুরা তাঁদের সাহায্যের হাত আপনাদের দিকে প্রসারিত করে দিন, শুধু মুখ ফুটে সে-কথায় আপনারা একবার বললেই হবে। কিন্তু সেই বন্ধুরা যাঁরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে আগ্রহী, তাঁরা আপনাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন না, যতদিন না আপনাদের সে-সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং আমাদের জাতীয় মর্যাদা ও স্বার্থের খাতিরে কোনও সাহায্য আমাদের চাওয়া উচিত নয়, যতদিন সেই সাহায্য ছাড়াই আমরা পারব। এই প্রসঙ্গে আমি আবার আপনাদের কাছে আবেদন করতে চাই, বিদেশে আপনাদের স্বদেশবাসী, যাঁরা ভারতের দ্রুত স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন। আজ আমরা ভারতের জাতীয় সম্মানের জিম্মাদার, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত। যেমন দেশে তেমনই দেশের বাইরে আমরা সর্বদা স্বাধীনতার পক্ষে এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপরে কোনও বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না। মতাদর্শঘটিত কোনও বিচারের দ্বারা আপনারা পথভ্রষ্ট হবেন না, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, যার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যখন বলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরা আমাদের বন্ধু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়া এবং ভারত আবার স্বাধীন হওয়া তাদের স্বার্থের অনুকূল এবং তারা খুব ভাল করে জানে, যতদিন ভারত ব্রিটেনের অধীন থাকবে, তাদের জয় সম্ভব নয়, শান্তি আসতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি কখনওই আশা করব না যে বিদেশি শক্তিরা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, যদি সেটা তাদের স্বার্থে না হয়।

কমরেডগণ, আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন বিগত কয়েক মাস তারা সবচেয়ে দুঃসময় অতিবাহিত করেছে। সেদিন আর নেই যেদিন লন্ডন ছিল বিশ্বের রাজধানী। সেদিন আর নেই যেদিন রাজা ও রাষ্ট্রনায়কেরা লন্ডনের পথে রওয়ানা হতেন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য। সেদিন আর নেই যেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ইউরোপে আসতে হত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ব্রিটিশ কবি ঠিক বলেছেন, "পুরাতন ব্যবস্থা বদলে যায়, নতুনকে জায়গা করে দেয়, ঈশ্বর নানাভাবে নিজেকে পূর্ণত্ব দান করেন।" তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এখন নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ছুটতে হচ্ছে এবং ব্রিটেনের আমেরিকানরা এখন ব্রিটিশ আইনের নাগালের বাইরে বলে ঘোষণা করা হয় এবং অনেক রণাঙ্গনে আমেরিকান অফিসারেরা ব্রিটিশ বাহিনীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে। এইভাবে ব্রিটেন ও তার সাম্রাজ্য দ্রুত রুজভেল্টের উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু পুরাতন সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবার কোনও বাসনা ভারতের নেই, এবং সেই কারণে তাকে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও নতুন সাম্রাজ্যবাদ দুইয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হবে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক দিকটি হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান যাজক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রু, সব রকমের সমাজবাদের শত্রু বলে নিজেকে ঘোষণা করে যিনি শপথ নিয়েছেন, সেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এখন নিজের আগেকার সাম্রাজ্যবাদী আত্মম্ভরিতা গলাধঃকরণ করে মস্কোতে ক্রেমলিনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে।

এটা কি একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রতিভূ এখন বেপরোয়া হয়ে সব কিছুই করবেন, শুধু কোনও অবস্থাতেই ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবেন না? ভারত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটের মণি এবং সেই মণিটিকে রক্ষা করতে যা কিছু সম্ভব

ব্রিটিশরা সবই করবে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে, অতএব ভারতীয়রা বিশেষত নেতারা যেন সব আশা ত্যাগ করেন যে ব্রিটেন তাঁদের দাবি স্বীকার করে নেবে, এবং ব্রিটিশরা যতদিন না ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়, ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যান। আমাদের সংগ্রামের শেষের দিনগুলিতে কষ্ট ও যন্ত্রণা অনেক হবে, অত্যাচার ও হত্যা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সে মূল্য দিতেই হবে। এটা তো স্বাভাবিক, শেষের প্রহরে ব্রিটিশ সিংহ শক্ত কামড় লাগাবে, কিন্তু সে কামড় হবে মরণোন্মুখ সিংহের। আমরা সে কামড় খেয়েও বেঁচে থাকব।

কমরেডগণ, এই সংকটের সময়ে আমাদের উচিত স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া তার ফলাফল যাই হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অদূর ভবিষ্যতে পতন ঘটবে, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে সে সাম্রাজ্য সমস্ত রণক্ষেত্রে তার পরাজয়ের ফলে, সেই সাম্রাজ্য শেষপর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার ফলে শক্তি চলে আসবে ভারতীয়দের হাতে। আমাদের অন্তিম জয় আসবে একমাত্র আমাদের প্রচেষ্টার ফলে। অতএব সাময়িকভাবে যদি আমাদের খারাপ সময় আসে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই, বিশেষত যখন আমাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে মেশিন গান, বোমা, ট্যাঙ্ক এবং বিমানের। আমাদের কর্তব্য সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, এবং সামরিক বিপর্যয় সত্ত্বেও জাতীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, যতদিন না স্বাধীনতার লগ্ন আসে।

নেতারা কারাগারে আছেন বলে দমে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং তাঁদের যন্ত্রণাভোগ সমস্ত জাতিকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে। বিগত কুড়ি বছর আমি সংগ্রাম পরিচালনা করতে চাইছি, যখন নেতারা সবাই জেলে আছেন, তা ছাড়া এখন যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে আছেন, তারা আপনাদেরকে পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন, এখন কী করতে হবে তার।

কমরেডগণ, আমি আগেই আপনাদের সুনিশ্চিত করেছি, আমি বিদেশে যা কিছু করে আসছি সবই আমার দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশের ইচ্ছানুসারে। আমি এমন কিছু করব না, যা সমগ্র জাতি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করবে না। দেশ ছেড়ে আসা অবধি একাধিক যোগাযোগ প্রণালীর মাধ্যমে আমি আমার দেশবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছি, ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো এবং ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। বিগত কয়েক মাস ভারতে আবার স্বদেশবাসীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে এতদিনে জেনে গেছেন, যখনই আপনারা ইচ্ছা করবেন, আমার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে পারেন। এখন আমি আপনাদের জানাতে পারি, যখনই আমি চাইব আমার ভারতে যাওয়া কিংবা ভারত থেকে চলে আসা বন্ধ করা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সম্পর্কে এবং আজাদ হিন্দ বেতার সম্পর্কে ভারত সরকারের কিছু কিছু গোপন রিপোর্ট আমি দেখেছি, এবং দেখে আমার হাসি পেয়েছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাঁরা আমার বিষয়ে সবই জানেন, কিন্তু একদিন আমার সঙ্গে তাঁদের এমন লড়াই লড়তে হবে যা তাঁরা জীবনে কখনও লড়েননি এবং ক্ষতি নেই, যদি আমি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে জানাই যে শত্রুদের দেশে তারা যে-সব কৌশল ব্যবহার করেছেন, আমার লোকেরা তা সযত্নে অনুধাবন করেছেন এবং আমাদের পুরনো শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে সে-সব খুবই কাজে লেগেছে।

কমরেডগণ, এই মুহূর্তে যত দেশ ব্রিটেনের দ্বারা অবদমিত হয়ে আছে, ব্রিটেনের আধিপত্যের তলায় আছে, তারা সবাই হয় বিদ্রোহ করছে কিংবা বিদ্রোহ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভারতে আমরা যদি আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাই আমরা শুধু যে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করব তাই নয় ব্রিটেনের দ্বারা শোষিত এবং অবদমিত সমস্ত দেশের মুক্তি ত্বরান্বিত করব।

পক্ষান্তরে, ভারতীয়রা যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে, ব্রিটেনের শত্রুরা উদ্যোগী হয়ে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বহিষ্কার করবে। যেভাবেই হোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং একমাত্র প্রশ্ন হল, শেষ পর্যন্ত যখন সাম্রাজ্যের পতন হবে, তখন কী হবে? আমরা কি আমাদের প্রাপ্য অধিকার হিসাবে অন্য শক্তিগুলোর হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করব, না কি স্বাধীনতা আমরা জয় করে নেব নিজেদের চেষ্টায়? মি. জিন্না, মি. সাভারকার এবং সেইসব নেতা যাঁরা এখনও ব্রিটেনের সঙ্গে আপসের কথা ভাবছেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করতে চাই, শেষবারের মতো উপলব্ধি করুন, আগামীকালের পৃথিবীতে কোনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থাকবে না। যে-সব ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দল এখন স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন, আগামী কালের ভারতে তাদের সকলের সম্মানিত স্থান থাকবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থকরা স্বাধীন ভারতে স্বাভাবিকভাবেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়বেন। এই প্রসঙ্গে *আমি সমস্ত দল এবং গোষ্ঠীকে আবেদন করতে চাই, এই কথাটি বিবেচনা করুন, এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দিক থেকে চিন্তা করুন এবং যে মহাসংগ্রাম এখন চলছে, এগিয়ে এসে তাতে যোগ দিন। মুসলিম লিগের মধ্যে প্রগতিশীল যাঁরা আছেন, তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে ১৯৪০ সালে কলকাতা করপোরেশনের কাজের সময়ে একসঙ্গে কাজ করবার আমার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের প্রতি আমি আবেদন করছি। আমি আবেদন করছি ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলিম পার্টি সাহসী মজলিশ-ই-অহরর-এর প্রতি, যাঁরা ১৯৩৩-এ অন্য সব দলের আগে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। আমি আবেদন করছি, ভারতে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতদের প্রাচীন প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন জমিয়ত-উল-উলেমার প্রতি, যার নেতৃত্বে আছেন বিশিষ্ট দেশপ্রেমী ও নেতা মুফতি খিফায়াত উল্লাহ। আমি আবেদন করছি ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন আজাদ (স্বাধীন) মুসলিম লিগের প্রতি, আমি আবেদন করছি ভারতের নেতৃস্থানীয় শিখ দল 'অকালি দল'-এর প্রতি। এবার আমি সবশেষে (যদিও এঁরা নগণ্য নন) আবেদন করছি বাংলার 'প্রজা পার্টি'র প্রতি, যাঁদের ওপর এই প্রদেশের আস্থা আছে, এবং যার নেতৃবৃন্দ সুপরিচিত দেশপ্রেমী। আমার সন্দেহ নেই, যদি এই সব সংগঠন সংগ্রামে যোগ দেয়, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন নিকটতর হবে।*

যে আন্দোলন এখন ভারতে চলছে তাকে বলা যায় অহিংস, গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে ছড়িয়ে পড়বার কৌশল। আমাদের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে, যাতে ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারি তাদের আক্রমণ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী আমাদের যতদূর সম্ভব চলমান হতে হবে এবং অনবরত স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেন কখনওই আগে থেকে বুঝতে না পারে, এরপরে আমাদের তৎপরতা কোথায় আত্মপ্রকাশ করবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন ১৯২১ থেকে ১৯৪০ আমি সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে ছিলাম এবং সংগ্রামের ব্যর্থতার কী কী কারণ ছিল আমি জানি। এখন আমার সুযোগ হয়েছে গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশলের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করার। বর্তমান সংগ্রাম কী করে সফল করা যায় সে বিষয়ে আমি কিছু কিছু পরামর্শ দিতে সক্ষম। এই অহিংস গেরিলা আন্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দ্বিবিধ। প্রথমত, ভারতে সমস্ত যুদ্ধ-সংক্রান্ত উৎপাদন বন্ধ করা, এবং দ্বিতীয়ত, দেশে ব্রিটিশ প্রশাসন অচল করা। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে দেশবাসীর প্রত্যেকটি অংশকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। প্রথমত, সমস্ত কর যা থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারের আয় হয়,

বন্ধ করে দেবেন। দ্বিতীয়ত, সমস্ত কল-কারখানায় শ্রমিকেরা হয় কারখানার ভিতরে ঢুকে ধর্মঘট করবেন অথবা কারখানার ভিতরে 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাবেন। তা ছাড়াও, তাঁরা অন্তর্ঘাত করবেন নাট-বল্টু অপসারণ প্রভৃতি উপায়ে। তৃতীয়ত, ছাত্ররা গুপ্ত গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করবে দেশের বিভিন্ন অংশে অন্তর্ঘাত করার উদ্দেশ্যে। তা ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উত্ত্যক্ত করার জন্য তারা নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করবে, ডাকঘরে ডাকটিকিট প্রভৃতি পোড়ানো, ব্রিটিশ স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি ধ্বংস করা। চতুর্থত, নারীরা বিশেষত ছাত্রীরা গোপনে নানা রকম কাজ করবেন বিশেষ গুপ্ত সংবাদ-বাহক হিসাবে এবং যাঁরা সংগ্রাম করবেন, তাঁদের আশ্রয় দেবেন। পঞ্চমত, সরকারি অফিসার ইত্যাদিদের পদত্যাগ করবার দরকার নেই, যাঁরা সরকারি অফিসে এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত কারখানায় কাজ করেন, তাঁরা বাইরে যাঁরা সংগ্রামরত, তাদের সমস্ত রকম সংবাদ দেবেন এবং অদক্ষভাবে কাজ করে উৎপাদন বিঘ্নিত করবেন। ষষ্ঠত, ব্রিটিশদের গৃহে যাঁরা পরিচারকের কাজ করেন, তাঁদের সংগঠিত করতে হবে প্রভুদের অসুবিধায় ফেলবার জন্য, যেমন বেশি বেতন দাবি করা, নিকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা প্রভৃতি। সপ্তমত, ভারতীয়রা সমস্ত ব্যাঙ্ক, নানা প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি প্রভৃতির সঙ্গে কাজ-কারবার বন্ধ করে দেবেন। অষ্টমত, বিবিসি-র ইউরোপীয় পরিষেবায় প্রচারিত কর্নেল ব্রিটন-এর অনুষ্ঠান শোনা এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে কর্নেল ব্রিটন-এর কৌশলাদি ব্যবহার করা।

জনসাধারণের জন্য আমি নিম্নলিখিত কাজগুলি করার পরামর্শ দিচ্ছি:

(ক) ব্রিটিশ সামগ্রী বয়কট এবং ব্রিটিশ দোকান এবং সরকারি দোকান বয়কট।

(খ) ভারতে ব্রিটিশদের এবং যে-সব ভারতীয় ব্রিটিশদের পক্ষে আছেন তাঁদের সম্পূর্ণ বয়কট।

(গ) সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জনসভা এবং মিছিল ইত্যাদি করে যাওয়া।

(ঘ) গুপ্ত বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ এবং গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র স্থাপন।

(ঙ) ব্রিটিশ সরকারি অফিসারদের গৃহে মিছিল করে গিয়ে ভারত থেকে তাঁদের বিদায় দাবি।

(চ) মিছিল করে গিয়ে সরকারি অফিস প্রবেশ এবং দখল করা, প্রশাসনে বিঘ্ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

(ছ) যে-সব পুলিশ অফিসার ও জেলখানার অফিসার জনসাধারণকে নির্যাতন করেন, তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(জ) যে-সব রাস্তা দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির আক্রমণ করার সম্ভাবনা সে-সব রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করা।

(ঝ) যে-সব সরকারি অফিসে এবং কারখানায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজ হচ্ছে, তাতে আগুন লাগানো।

(ঞ) বিভিন্ন স্থানে যত ঘন ঘন সম্ভব ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ ছিন্ন করা।

(ট) সৈনিকদের এবং যুদ্ধোপকরণের স্থানান্তরণে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যখনই সম্ভব রেল, বাস এবং ট্রাম পরিষেবায় বাধা সৃষ্টি করা।

(ঠ) বিভিন্ন স্থানে থানা, রেলস্টেশন এবং জেলখানা ধ্বংস করা।

কমরেডগণ, আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি এই কার্যসূচি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন যন্ত্রকে অচল করে দেওয়া যাবে। *এই প্রসঙ্গে আমার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে অহিংস গেরিলা যুদ্ধে সর্বদাই কৃষিজীবী সম্প্রদায় নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি দেখে আনন্দিত যে কয়েকটি প্রদেশে, বিহারে এবং মধ্যপ্রদেশে কৃষিজীবীরা এর মধ্যেই সামনে এসে পড়েছেন।* আমার আন্তরিক আশা, স্বামী সহজানন্দ এবং অন্য কৃষক নেতারা, যাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগেই সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা এখন আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবেন। স্বামী সহজানন্দকে এবং কিষান আন্দোলনের নেতাদের আমি এখন অনুরোধ করব, সংগ্রামের শেষপর্যায়ে তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পূর্ণ করুন। আমরা চাই স্বরাজ সর্বসাধারণের জন্য, স্বরাজ শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য।

অতএব শ্রমিক কৃষকদের কর্তব্য, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যখন গঠিত হচ্ছে, জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে এগিয়ে আসা। এটা প্রকৃতিরই নিয়ম যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করবেন, স্বাধীনতা জয় করবেন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁদের হাতে থাকবে। তাই বন্ধুগণ, এটি অত্যন্ত উৎসাহজনক যে দেশীয় রাজ্যের জনগণও সর্বভারতীয় সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। সে-রকম খবর পাওয়া গেছে বরোদা, মহীশূর এবং হায়দ্রাবাদ থেকে এবং আমি নিশ্চিত, সে-দিন অদূরে যে-দিন দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ব্রিটিশ ভারতের লোকদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে মোর্চা গড়বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আনন্দের খবর, স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি দেশে ও বিদেশে আমাদের সৈনিকদের কানে ও হৃদয়ে পৌঁছেছে। অবশ্য চিরাচরিত নৃশংসতা সহকারে তাদের কোর্ট মার্শাল করা হয়েছে। কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। মিশরে বহু সৈনিক স্বেচ্ছায় নিজেদের বাহিনী ত্যাগ করে অক্ষশক্তির বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, এবং তাঁরা তাঁদেরকে বুকে টেনে নিচ্ছেন। এল আলামেন থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদলকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, তারা নির্ভরযোগ্য নয় এই কারণে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছু সংখ্যক সমর্থককে নিয়ে আসা হয়েছে, ভারতীয় সৈনিকদের প্রভাবান্বিত করবার জন্য। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমি বাইরের বিশ্বকে জানাতে পারব, যাতে ব্রিটেনের শত্রুদের কাছ থেকে ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, এই সংগ্রাম সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এবং দরকার হলে মাসের পর মাস চালাতে হবে। এই অহিংস গেরিলা যুদ্ধ যদি যথেষ্ট দিন চালানো যায় তা হলে স্বাধীনতা আসবে, কেননা, বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজয়ের যোগফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলবেন না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন শেষ সম্বল দিয়ে লড়ছে।

সেই সঙ্গে যে কোনও দুঃখকষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা এবং আটলান্টিক চার্টারের প্রণেতারা আগামী দিনে তাদের যথাসাধ্য করতে পারেন আমাদের বিরুদ্ধে। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বেই আসে গভীরতম অন্ধকার। সাহসীরাই সংগ্রাম চালিয়ে যান। আপনাদের স্লোগান হোক "হয় এখনই, নয় কখনও নয়"; "জয় অথবা মৃত্যু"; "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

৩০

স্বাধীন ভারত ও তার নানা সমস্যা

আগস্ট ১৯৪২[১]

নবজাগরণ

ভারতে ব্রিটেনের দখল আরম্ভ হয় ১৭৫৭ সালে, যখন একটি প্রদেশ, বঙ্গদেশ প্রথম ব্রিটিশদের অধিকারে চলে যায়। সেই অধিকার ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় ১৮৫৮-তে, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর। ইংরেজ ইতিহাসবিদেরা সেই বিদ্রোহকে বলেছেন সিপাহী বিদ্রোহ, কিন্তু ভারতের মানুষ তাকে দেখে "প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ" হিসাবে। প্রথম দিকে সে বিদ্রোহ সফল হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিফল হয়ে যায় ভারতীয় নেতাদের রণকৌশল ও কূটনীতিতে কিছু কিছু ত্রুটির কারণে। ব্রিটিশদের দিকে, রণকৌশল ও কূটনীতি দুইই উৎকৃষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশদের জয়লাভ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

বিদ্রোহ বিফল হওয়ার পর সারা দেশে ব্রিটিশ-রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। ভারতীয়রা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং এখন পর্যন্ত নিরস্ত্রই আছে। এখন তারা বুঝতে পারছে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল তারা করেছিল ১৮৫৮ সালে অস্ত্র বর্জন করে, কারণ অস্ত্র বর্জন জাতিকে বহুল পরিমাণে হীনবল ও দুর্বল করে দেয়। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর কিছুকাল ভারতীয়রা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল, তারপর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে আরম্ভ হয় রাজনৈতিক নবজাগরণ যার পিছনে ছিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের উদ্দীপনা। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয় আন্দোলন দুটি পন্থা গ্রহণ করে, ব্রিটিশ সামগ্রী বয়কট এবং গোপনে অভ্যুত্থান। ১৯২০ সালে, বিগত বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, গান্ধী প্রবর্তন করেন একটি নতুন পন্থা, গণ আইন অমান্য অথবা যার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসনের উৎখাত, বিনা অস্ত্রেই। এইসব পন্থা এখন ভারতকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে এসেছে যে ভারতবাসীর পক্ষে ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়ন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি

ভারতে এখন এমন পরিস্থিতি যে সবাই ব্রিটিশদের ঘৃণা করে। কিন্তু ভারতবাসীর বিপুল

---

১. জার্মান ভাষায় 'Wille and Macht' পত্রিকায় (অগাস্ট, ১৯৪২) প্রকাশিত এবং "আজাদ হিন্দ" পত্রিকায় (৯-১০-১৯৪২) পুনর্মুদ্রিত।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে চাইলেও ভারতীয়দের একটা অংশ নিজেদেরকে সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেন না। সেই কারণে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা আপসে আসতে চান, যাতে যা পাওয়া সম্ভব তাদের থেকে সেটা পাওয়া যায়। এমন কোনও ভারতীয় নেই যিনি কোনও নৈতিক বিশ্বাস থেকে সে কাজ করতে চান। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন কোনও সদিচ্ছার ওপরে দাঁড়িয়ে নেই, তার ভিত্তি হল ব্রিটিশ বেয়নেট।

অনেকে বুঝতে পারে না তুলনায় অত ক্ষুদ্র একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্রিটিশরা কী করে অত বড় দেশ শাসন করে। এর পিছনে রহস্যটি এই: একটি ক্ষুদ্র কিন্তু আধুনিক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এক বিশাল কিন্তু নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য কায়েম রাখা সম্ভব, যতদিন সেই আধুনিক দখলদার বাহিনী অন্য একটি শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, নিছক পশুশক্তির দ্বারা সে জনগণের সংগঠিত যে কোনও অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানকে দমন করতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশরা যেহেতু এখন অন্য কয়েকটি শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং তার ফলে যথেষ্ট হীনবল হয়ে পড়ছে, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহ গড়ে তুলতে পারে, যা চিরকালের জন্য ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু তার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, সংগ্রামের জন্য ভারতীয়দের অস্ত্রধারণ করতে হবে এবং যে-সব রাষ্ট্র ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। সেই কাজটি গান্ধী করবেন না, সেইজন্য ভারতের এখন প্রয়োজন নতুন নেতৃত্ব।

ভারত যখন স্বাধীন হবে

অনেকে যে প্রশ্ন করছেন, তা হল ব্রিটেনকে ভারত ছেড়ে যেতে যখন বাধ্য করা হবে, তখন কী হবে? ব্রিটিশদের প্রচারের ফলে অনেকে মনে করছেন, ব্রিটিশরা না থাকলে অরাজকতা থাকবে, বিশৃঙ্খলা হবে। এই সব লোকেরা সুবিধেমতো ভুলে যান যে ব্রিটেনের অধিকার ১৭৫৭-র আগে আরম্ভ হয়নি, এবং ১৮৫৭-র আগে সম্পূর্ণ হয়নি। আর ভারত একটি দেশ যার ইতিহাসের পরিমাপ করতে হয় হাজার হাজার বছরে। ভারতে সংস্কৃতি, সভ্যতা, প্রশাসন, এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা যদি ব্রিটিশ শাসনের আগে সম্ভব হয়ে থাকে, ব্রিটিশ শাসনের পরেও সেসব সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে দমিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রশাসনকে বিজাতীয় করে তোলা হয়েছে এবং যে দেশ আগে ছিল ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা, এখন তা হয়েছে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম।

নতুন অসামরিক প্রশাসন

ব্রিটিশদের এদেশ থেকে বহিষ্কারের পর আমাদের প্রথম কাজ হবে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। নতুন সরকার বলতে অবশ্যই বোঝাবে অসামরিক প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং একটি জাতীয় সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি। অসামরিক প্রশাসনের পুনর্গঠন হবে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। অতীতে অসামরিক প্রশাসন

বরাবরই ভারতীয়রা পরিচালনা করেছেন এবং শুধুমাত্র তার শীর্ষে থেকেছেন ব্রিটিশরা। কিন্তু বিগত কুড়ি বছর সর্বোচ্চ পদে ভারতীয়রা ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশদের স্থান অধিকার করেছেন। ১৯৩৭ থেকে প্রাদেশিক সরকারে মন্ত্রীরা সবাই ভারতীয়, এবং ইংরেজ অফিসারেরা তাঁদের অধীনে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সর্বোচ্চ পদে যেখানেই ভারতীয়রা ইংরেজদের জায়গায় এসেছেন, তাঁরা শেষোক্তদের চেয়ে অধিকতর সক্ষম প্রমাণিত হয়েছেন, ভারতীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় অফিসারেরা ব্রিটিশদের চেয়ে দেশকে অনেক বেশি ভাল জানেন, এবং দেশের মঙ্গলে অনেক বেশি আগ্রহী। কাজেই তাঁরা যে ব্রিটিশদের চেয়ে ভাল কাজ করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এক কথায়, আমাদের এমন প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ একদল অফিসার আছেন যে, অসামরিক প্রশাসন সংগঠিত করা আদৌ কঠিন হবে না। স্বাধীন ভারতের নতুন সরকারকে শুধু নতুন নীতি এবং নতুন কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে এবং শীর্ষে নতুন নেতৃত্বকে বসাতে হবে অসামরিক প্রশাসনের জন্য।

একটি জাতীয় সেনাবাহিনী

একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজটি হবে অপেক্ষাকৃত কঠিন। অবশ্য ভারতেই বহুসংখ্যক প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ সৈনিক আছেন এবং বর্তমান যুদ্ধের জন্য তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অল্পদিন আগে পর্যন্ত ভারতীয় সেনা বাহিনীর অফিসারেরা প্রধানত ছিলেন ব্রিটিশ এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীগুলিতে অফিসারেরা ছিলেন একমাত্র ব্রিটিশ। যুদ্ধের অবস্থার কারণে ব্রিটিশেরা বাধ্য হয়েছেন বহু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করতে এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীগুলিও কিছু সংখ্যক ভারতীয়র জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, যেমন ট্যাঙ্ক, বিমান, ভারী কামান, যা আগে একমাত্র ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত হত, অবস্থার চাপের দরুন তাও ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় অফিসারের অভাব থেকেই গেছে এবং তার ফলে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনে কিছু অসুবিধা থাকবে। এ-বিষয়ে ভারতের প্রধান অসুবিধা হবে অল্প সময়ের মধ্যে, ধরা যাক দশ বৎসরের মধ্যে, সমস্ত শ্রেণীর বহু সংখ্যক অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়ায়। স্থলবাহিনীর সঙ্গে একটি নৌবাহিনী এবং একটি বিমানবাহিনীও গড়ে তুলতে হবে এবং এই সমস্ত কাজই যথাসম্ভব দ্রুত করতে হবে। ভারত যদি কিছুদিনের জন্য শান্তিতে থাকতে পারে এবং কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তা পাওয়া যায়, তা হলে প্রতিরক্ষা সংগঠনের সমস্যা সহজে সমাধান করা যাবে।

নতুন রাষ্ট্র

ভবিষ্যতের ভারত রাষ্ট্র কীরকম হবে তা নিয়ে কোনও অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা ভুল হবে। আমরা শুধুমাত্র একটা আভাস দিতে পারি, কোন কোন নীতি সেই রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে এবং তার রূপ কী হবে। অতীতের কয়েকটি সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা ভারতের আছে, এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা সেই পশ্চাদপটটি পাব, যার ওপরে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের

রাষ্ট্র গঠন করব। তখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমাদের রাজনৈতিক পতন কেন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আবার সেরকম ঘটা রোধ করতে হবে।

তারপর আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের ভারতে বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, এবং সে-বিষয়ে আগ্রহশীল। তা ছাড়া ভার্সাই-উত্তর যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে-সব রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। এবং পরিশেষে ভারতের পরিস্থিতিতে কী কী প্রয়োজন তাও বিবেচনা করতে হবে।

একটি বিষয় কিন্তু পরিষ্কার। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। সেই রকম সরকার ব্যতীত শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে না। সেই সরকারের পিছনে থাকবে একটি সুসংগঠিত, শৃঙ্খলাপরায়ণ সর্বভারতীয় দল, জাতীয় সংহতি রক্ষায় যেটি হবে প্রধান অস্ত্র।

সে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং কোনও রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেশবাসীর সকলের থাকবে সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির যখন কর্ম, খাদ্য, শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সমান অধিকার থাকবে তখন ভারতে আর কোনও সংখ্যালঘু সমস্যা থাকবে না।

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র মসৃণভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে, শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হবে অধিকতর ক্ষমতা।

জাতীয় সংহতি

রাষ্ট্রকে জাতীয় সংহতির জন্য যা কিছু সম্ভব সবই করতে হবে এবং প্রচারের সমস্ত মাধ্যম, সংবাদপত্র, বেতার, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। সমস্ত জাতীয়তা-বিরোধী এবং বিচ্ছেদকামী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে দমন করতে হবে। যেসব গোপন ব্রিটিশ এজেন্ট তখনও থাকবে, তাদেরকেও দমন করতে হবে, তার জন্য যতটা প্রয়োজন শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং আইন সংশোধন করতে হবে, যাতে জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে সমস্ত অপরাধ কঠোর শাস্তি পায়। হিন্দুস্তানি, যে ভাষা ইতিমধ্যেই দেশের অধিকাংশ স্থানে লোক বুঝতে পারে, ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে গৃহীত হবে। ছেলে-মেয়েদের এবং বিদ্যালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে, যাতে তারা অল্প বয়সেই জাতীয় সংহতির চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ প্রচার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এইরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করেছে যে ভারতীয় মুসলিমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃত সত্য হল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলিমদের শতকরা ভাগ যথেষ্ট বেশি। আজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি একজন মুসলিম, তাঁর নাম আজাদ। ভারতীয় মুসলিমদের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ব্রিটিশ-বিরোধী এবং তাঁরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান। নিঃসন্দেহে, মুসলিম এবং হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই যারা ব্রিটিশ পক্ষপাতী, তাদের ধর্মীয় দল হিসাবে সংগঠিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে যেন জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করা না হয়।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় সংহতির এক মহান দৃষ্টান্ত। সে যুদ্ধ করা হয়েছিল

বাহাদুর শাহের পতাকার তলে, যিনি ছিলেন একজন মুসলমান এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই থেকে ভারতীয় মুসলিমরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কাজ করে চলেছেন। ভারতীয় মুসলিমরা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের মতোই এদেশের সন্তান এবং তাদের স্বার্থ অন্য ভারতবাসীদের থেকে অভিন্ন। ভারতের মুসলমান (অথবা মুসলিম) সমস্যা ব্রিটিশদের কৃত্রিম সৃষ্টি— আয়ারল্যান্ডের সমস্যার মতো এবং প্যালেস্টাইনের ইহুদি সমস্যার মতো, ব্রিটিশ শাসনকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেই তা দূর হবে।

সামাজিক সমস্যা

নতুন শাসন প্রবর্তিত হলে ভারত তার সমস্ত মনোযোগ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানের দিকে দিতে পারবে। সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য ও বেকারি। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের দারিদ্র্য প্রধানত দুটি কারণে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের শিল্প কারখানা ধ্বংস করা এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষির অভাব। প্রাক্-ব্রিটিশ কালে ভারত খাদ্য এবং শিল্প যা কিছু প্রয়োজন তা উৎপাদন করত, এবং তার শিল্প উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ইউরোপে রপ্তানি করত, যেমন উৎপন্ন বস্ত্র। শিল্প বিপ্লবের এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে ভারতের প্রাচীন শিল্প সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার জায়গায় একটি নতুন সংগঠন গড়তে তাকে দেওয়া হয় না। ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পসম্ভারের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। তার ফল হয়, লক্ষ লক্ষ ভারতীয়, যারা আগে শিল্পকে অবলম্বন করে জীবনধারণ করত, তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিদেশি শাসন কৃষিজীবীদের দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করছে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টি করেছে। তার ফল ভারতের যে জমি একদা ছিল উৎপাদন-সক্ষম তা উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়েছে এবং কৃষকদের অন্ন জোগাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষিজীবী বছরে প্রায় ছ'মাস কর্মহীন। অতএব ভারত রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন হবে শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে, যদি তাকে দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান করতে হয়।

বিদেশি শাসনে ব্রিটিশেরা শুধু শাসকই ছিল না, তারা শ্রমিকদের নিয়োগকর্তাও ছিল। সেই কারণে শ্রমজীবীদের অবস্থা ছিল করুণ, স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রকে শ্রমিকদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে নজর দিতে হবে, তাদেরকে জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরি দিতে হবে, অসুখে বিমার সুযোগ দিতে হবে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একইভাবে কৃষিজীবীদের অত্যাধিক কর থেকে রেহাই দিতে হবে এবং সাংঘাতিক ঋণভার থেকেও বাঁচাতে হবে। এই বিষয়ে শ্রমজীবী কল্যাণ সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন হবে। তারপরেই গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্যের সমস্যা, ব্রিটিশ শাসনে তার সমাধান হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে এখন ভারতে প্রচুর সংখ্যক প্রশিক্ষিত ডাক্তার আছেন যাঁরা ভারতে অবস্থিত ইংরেজ ডাক্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁরা জনস্বাস্থ্যের সমস্যাবলির সঙ্গে অধিকতর পরিচিত। রাষ্ট্র যদি সাহায্য করে এবং আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, তাঁরা রোগ নিয়ন্ত্রণে এক বিপুল উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ আয়ুর্বেদ এবং ইউনানিও সাহায্য করতে পারে।

তারপরে আছে নিরক্ষরতার মারাত্মক সমস্যা। দেশের বহু অঞ্চলে তার হার শতকরা ৯০। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান আদৌ কঠিন নয়, রাষ্ট্র যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান

করে। বর্তমানে আমাদের বহুসংখ্যক শিক্ষিত পুরুষ ও নারী আছেন, যাঁরা বেকার। স্বাধীন ভারতে এইসব পুরুষ ও নারীকে এখনই দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেওয়া যায়, ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। এই কাজের পাশাপাশি পরীক্ষা চালাতে হবে ভারতীয়দের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনের জন্য। সৌভাগ্যক্রমে কয়েক স্থানে এ-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগে থেকেই চলছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে, হরিদ্বারে গুরুকুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া (জাতীয় মুসলিম) বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওয়ার্ধার কাছে গান্ধীর বিদ্যালয়ে। উপরন্তু, ব্রিটিশ যুগের আগে থেকেই চলে আসছে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভারতের ভবিষ্যৎ লিপির বিষয়ে আমার নিজস্ব মত, দেশে বর্তমান প্রচলিত লিপিগুলি জোর করে তুলে না দিয়ে স্বাধীন ভারতের সরকারের উচিত রোমান লিপিকে উৎসাহিত করা এবং জনপ্রিয় করা।

অর্থনীতি

স্বাধীন ভারত তার বড় বড় পরিকল্পনার জন্য অর্থ কী করে সংগ্রহ করবে, সেও একটা গুরুতর সমস্যা। ব্রিটেন ভারতের স্বর্ণ ও রৌপ্যও লুণ্ঠন করেছে এবং সামান্য যা অবশিষ্ট আছে, তাও অবশ্যই তারা নিয়ে যাবে, এ দেশ পরিত্যাগ করার আগে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে স্বাভাবিক ভাবেই স্বর্ণ-মান (Gold Standard) ত্যাগ করতে হবে, এবং এই নীতি গ্রহণ করতে হবে যে জাতীয় সম্পদ নির্ভর করে শ্রমিকদের ওপর এবং উৎপাদনের ওপর, স্বর্ণের ওপর নয়। বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং সংগঠিত হবে বিনিময় পদ্ধতির ওপর (পণ্য বিনিময়), জার্মানি যা ১৯৩৩ থেকে করে আসছে।

পরিকল্পনা পরিষদ

পুনর্গঠনের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করার সময়ে এই তথ্যটিও জ্ঞাতব্য যে ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ যখন আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম, আমি একটি জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি স্থাপন করেছিলাম, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনার জন্য। পরিষদ ইতিমধ্যেই মূল্যবান কাজ করেছে এবং তার রিপোর্ট আমাদের ভবিষ্যৎ কাজের জন্য উপযোগী হবে।

রাজন্যবর্গ

ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের রাজ্যগুলি এ-কালে অচল এবং বাতিল হওয়া উচিত। অনেক আগেই তাঁরা বিদায় হতেন যদি ব্রিটিশরা দেশের ঐক্যসাধন বিঘ্নিত করবার জন্য তাঁদেরকে ব্যবহার না করত। অধিকাংশ রাজা-মহারাজ ব্রিটিশ সরকারের সক্রিয় সমর্থক

এবং এমন একজন মহারাজাও নেই, যাঁর ইতালির Risorgimento আন্দোলনে (নবজাগরণ: যে আন্দোলনের পরিণতিতে দেশের ঐক্য সংগঠন এবং স্বাধীনতা এসেছিল— অনুবাদক) Piedmont যে ভূমিকা পালন করে, সে-রকম ভূমিকা গ্রহণ করবার কোনও সম্ভাবনা আছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজা যারা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ, তাদের মধ্যে একটা জন-আন্দোলন আছে যার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেস আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রাজা-মহারাজাদেরও বিলুপ্তি ঘটবে, কারণ তাঁদের অধিকাংশ নিজেদের প্রজাদের কাছে অপ্রিয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সরকারের তাঁদের নিয়ে কোনও অসুবিধা হতে পারে না কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজাকে আধুনিক সেনাবাহিনী রাখতে দেয়নি। আমরা সেরকম কিছু আশঙ্কা না করলেও রাজন্যবর্গ যদি বিদ্রোহ করেন আমরা সহজেই তাঁদের সঙ্গে মীমাংসা করে নিতে পারব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

অতীতে ভারতের অধঃপতনের একটা কারণ ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা। সেই কারণে ভবিষ্যতে ভারতকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রাখতে হবে। ভৌগোলিকভাবে ভারতের অবস্থান পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যবর্তী। এই অবস্থান সম্ভবত এ-দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে ভারত যে ত্রি-শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রাখবে, যে ত্রি-শক্তি ভারতের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তা হলে সেটা হবে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য এবং তার স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলার জন্যও ভারতের দরকার হবে বিদেশ থেকে সাহায্যের। কাজেই তার নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সরঞ্জাম এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞের দরকার হবে। তার আরও দরকার হবে সামরিক বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম তার সামরিক প্রতিরক্ষা গড়ে তুলবার জন্য। এই সব ক্ষেত্রে ত্রি-শক্তির রাষ্ট্রসমূহ মূল্যবান সহায়তা প্রদান করতে পারে। স্বাধীন ভারতে জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি হবে এবং তার ফলে উপভোগের মাত্রা বাড়বে লাফিয়ে লাফিয়ে। অর্থাৎ স্বাধীন ভারত হয়ে উঠবে উৎপাদিত বস্তুসমূহের একটি বৃহত্তম বাজার। শিল্পে অগ্রসর সব দেশের কাছে সেটা হবে একটা আগ্রহের বিষয়।

তার প্রতিদানে ভারতও মানবজাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতায় কিছু দান করতে পারবে। ধর্মে এবং দর্শনে, স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, নৃত্য-গীতে এবং অন্যান্য শিল্প ও কারুশিল্পে ভারত পৃথিবীকে অনন্য কিছু অবদান জোগাতে পারবে, এবং বিদেশি শাসনের যে-সব অসুবিধা, তা সত্ত্বেও আমি নিশ্চিত, অতি শীঘ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং শিল্পের বিকাশে ভারত প্রভূত সাফল্য অর্জন করবে।

নবীন ভারতের সামনে এক বিশাল কর্তব্য, কিন্তু আনন্দ এবং গৌরবও আছে তার সামনে, সংগ্রামের এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ের।

৩১

ভারত ও জার্মানি

ভাষণ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২[১]

Herr Reichssstatthalter— Obergruppenfuhrer Lorenz
Herr-Burgermeister, and Gentlemen!

আমার দেশবাসীগণ ও আমি আপনাদের ঐতিহাসিক শহরে আগমন উপলক্ষে আপনাদের কাছে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা আজ পেলাম, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। জার্মানির এবং অবশ্যই ইউরোপের ইতিহাসে হামবুর্গের একটি বিশেষ স্থান আছে এবং সেই কারণে এইখানে আমাদের সম্মেলন একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ, এখানে আজ সন্ধ্যায় যে সব সদয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ উক্তি আপনারা আমাদের প্রিয় দেশ সম্পর্কে করেছেন, তার জন্য। আজ আমরা একটি অতিশয় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত এবং এখন আমরা যতটুকু সহানুভূতি পাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জন্য তার মূল্য এবং গুরুত্ব, আমরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম তখন যা হত, তার চেয়ে বেশি।

Herr Brugermeister আমরা এখানে আজ সমবেত হয়েছি আপনাদের আমন্ত্রণে, হামবুর্গে Deutsch-Indische Gesellschaft-এর প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে। অতএব আজ যদি আমি আপনাদের মহান দেশের সম্পর্কে ভারতবাসীদের মনোভাবের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলি, সেটা উপযুক্তই হবে।

আমরা ভাল করেই জানি, ইতিহাসের বর্তমান যুগের আরম্ভের সময়ে একদা কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র ভারতে নিজেদের অধিকার স্থাপন করবার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতে চলছিল একটা অভ্যন্তরীণ সংকট এবং সেই কারণে সেইসব বিদেশি শক্তিকে প্রতিরোধে ভারত দুর্বল ছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, সেই সময়ে জার্মানি তাদের মধ্যে ছিল না, যারা ভারত সম্পর্কে অসদুদ্দেশ্য পোষণ করত। বস্তুত, প্রথম থেকে ভারতের প্রতি জার্মানির মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। ব্রিটিশরা যখন ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল, তারা প্রাণপণে ভারতের সবকিছুকে নিকৃষ্ট বলে দেখাতে চেষ্টা করল। সেই সংকটের মুহূর্তে, যখন ভারতের প্রয়োজন ছিল কিছু নৈতিক সহায়তা, তখন জার্মান পণ্ডিত, চিন্তাবিদ এবং জ্ঞানীগণ ভারতকে এবং ভারতের সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করেন।

---

১. হামবুর্গে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ ইন্দো-জার্মান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ, ''আজাদ-হিন্দ'' পত্রিকায় (৭-৮-১৯৪২) মুদ্রিত।

জার্মানির কতিপয় কবি এবং চিন্তক, যেমন গ্যেটে (Goethe), শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer), Ruckert এবং শ্লেগেল (Schlegel) ছিলেন ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগ্রাহী। উপনিষদ এবং বৌদ্ধ দর্শনে যার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে শোপেনহাওয়ার উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন এবং গ্যেটে ভারতীয় সাহিত্য ও নাটকের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্যেটে লিখেছিলেন:

তুমি কি চাও যৌবনের পুষ্পরাজি
তার অস্তোন্মুখ বয়সের পরিণত ফল?
চাও কি, যা কিছু আত্মাকে সম্মোহিত করে,
দান করে খাদ্যের প্রাচুর্য?
মর্ত্যকে এবং স্বর্গকে
একমাত্র তোমার সাথে
চাও কি একাসনে?
আমি তোমার নাম
উচ্চারণ করি
শকুন্তলা,
সে-নামেই সমস্ত নিহিত।

যে কাজের সূত্রপাত করেছিলেন, গ্যেটে, শোপেনহাওয়ার, শ্লেগেল এবং অন্যান্যরা, সেই কাজই চালিয়ে যান অনেক পণ্ডিত এবং কবি যাঁর মধ্যে ছিলেন ম্যাক্স মুলার (Max Muller) এবং Deussen, যাঁরা জার্মান-ভারত সম্পর্ক আরও বিকশিত করেছিলেন। জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন ভারতে গিয়েছিলেন এবং ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে। এইরকমভাবে ১৯১৪ সালে বিগত মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং গভীর হয়ে উঠেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান চিন্তা এবং সংস্কৃতির বিকাশ ভারতীয়রা গভীর আগ্রহ এবং গুণগ্রাহিতা সহকারে অনুধাবন করে গেছেন, যা ছিল জার্মানি সম্পর্কে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক আগ্রহ, সেটা ক্রমে হয়ে দাঁড়াল জার্মান জাতির রাজনৈতিক বিকাশ ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভারতীয় কৌতূহল ও ঔৎসুক্য। তারপর একটা আশা ও প্রত্যাশা জাগল যে, নব্য জার্মানি একটি প্রথম শ্রেণীর বিশ্বশক্তি হয়ে উঠবে, যে সক্ষম হবে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ও পরাস্ত করতে। ভারত তখনও রাজনৈতিক পরিপক্কতা লাভ করেনি, যখন বিগত বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল ১৯১৪ সালে। বহু লোক আশা করল জার্মানি সে-যুদ্ধ জিতবে এবং জার্মানি যতবারই কোনও সংঘর্ষে জিতত, ভারতীয়রা উল্লাস প্রকাশ করত। ভারত যেহেতু রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, ভারতীয়রা যে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেনি, তবু ভারতীয়দের একটা অংশ একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিল যা দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হয়নি। তা ছাড়া জার্মানিতে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ জার্মান সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বন্ধন ছাড়াও জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনও ছিল যা ক্রমে ক্রমে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে শুরু হল বয়কট এবং স্বদেশি

আন্দোলন। বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সামগ্রীর সম্পূর্ণ পরিহার এবং স্বদেশি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিল্পকে গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার ভিত্তিতে। ভারতের যুবকেরা ইউরোপে এবং জাপানে গেলেন বিশেষ করে জার্মানিতে গেলেন শিল্পের বিকাশের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার জন্য, এবং স্বদেশে ফিরে তাঁরা নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে আরম্ভ করলেন। জার্মানির দিকে, সে দেশের দ্রুত শিল্পায়নের ফলে সারা বিশ্বে নতুন নতুন বাজার দরকার হল এবং জার্মানির শিল্পমহল সেই কারণে সমানভাবে বেড়ে ওঠা ভারতীয় বাজার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠল।

এখন দেখা যাচ্ছে, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের সমবায়ে গঠিত জার্মান-ভারত সম্পর্কে ভারতের দিকে এই সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও গভীর হয়েছে, জার্মানির প্রতি ভারতের আন্তরিক সহানুভূতির কারণে, যার কারণ ১৯১৯-এর ভার্সাই চুক্তি। সেই সহানুভূতিকে প্রকাশ করেন মহান ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যখন ১৯২৬ সালে তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সাল থেকে ব্রিটিশ প্রচার-মাধ্যমসমূহ ভারতে জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)-এর বিরুদ্ধে নিরন্তর তীব্র প্রচারকার্য চালিয়ে গিয়েছে, এদেশে ত্রিশক্তি-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রথমে তারা কিছু সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলে, এদেশের জনমতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৩৮ থেকে আমি সমানে প্রচার করে আসছি যে ভারতের জন্য এই যুদ্ধের অর্থ, তার স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ, এবং ভারতের উচিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা। বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী দল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত আমার দল সম্ভবত দাবি করতে পারে, প্রধানত তার প্রচেষ্টার ফলেই আজ ভারতের জনমত এত ব্রিটিশ-বিরোধী এবং ভারতীয়দের অধিকাংশ সাধারণভাবে অক্ষশক্তিসমূহের পক্ষপাতী।

আমরা নিশ্চিত, এই যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় হবে এবং তার সাম্রাজ্য ভেঙে যাবে। আমরা এও নিশ্চিত জানি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিলোপের পরে ভারত বেরিয়ে আসবে এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে। সেই কারণে আমরা দ্বিবিধ কাজে রত আছি, ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জন্য আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

অতএব এই হচ্ছে উপযুক্ত সময় ভারতের ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী হবে বিবেচনা করা, এবং সেই সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য এখনই ব্যবস্থা করা। বিগত ১০০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয়রা জেনেছে যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম মূল কারণ অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে তার বিচ্ছিন্নতা। অতএব ভবিষ্যতে ভারতকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে হবে বিশেষত সেইসব রাষ্ট্রের সঙ্গে যেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং ভারতের বন্ধু। সেই সম্পর্কের ভিত্তি স্বাভাবিকভাবেই হবে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

এই সম্পর্ক গড়ে তুলবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হবে জার্মানিতে এবং ভবিষ্যতে ভারতে, সমিতি স্থাপন করা যখন সে দেশ থেকে ব্রিটিশরা বহিষ্কৃত হবে। আমি খুশি হয়েছি যে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অযথা কালক্ষেপ করা হচ্ছে না এবং আমি হামবুর্গের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ এ-বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। জার্মানিতে আন্তর্জাতিক ব্যাবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে হামবুর্গের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। তা ছাড়া হামবুর্গ হল জার্মানির জন্য বাইরের পৃথিবীর দিকে এবং পূর্বের দিকে খোলা দরজা। অতএব হামবুর্গকে

Deustch-Indische Gesellschaft স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান, ঠিকই হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে Deustch-Indische Gesellschaft আমার কাছে একটি পুরনো চিন্তা, একটি পুরনো স্বপ্নের পূরণ। ১৯৩৩ থেকে আমি বহু দেশে ভ্রমণ করেছি এবং ভারতের সম্পর্কে আগ্রহ যেখানেই দেখেছি, আমি চেষ্টা করেছি সে দেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত করে তুলবার জন্য একটি সমিতি স্থাপনের। সেই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৪ সালে ভিয়েনাতে আমি সেরকম একটি সমিতি স্থাপনে সহায়তা করতে পেরেছি। আজ হামবুর্গে Deustch-Indische Gesellschaft প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং সম্মানিত। আমি নিঃসন্দেহ শুধু জার্মানিতেই নয়, সারা ইউরোপে অন্য সমিতির স্থাপনেও হামবুর্গ অনুপ্রেরণা জোগাবে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারত যত সংযোগ স্থাপন করবে, তত তার ভাল হবে।

পরিশেষে আমার দেশবাসীর প্রতি এবং আমার প্রতি আপনাদের হার্দিক অভ্যর্থনার জন্য এবং জার্মানি-ভারত সম্পর্কের জন্য আপনারা যা করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

Herr Burgermeister, আপনাকে আরও ধন্যবাদ দিই, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই সাম্মানিক সদস্য পদ দানের জন্য। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে, আপনাদের কাজে আপনারা আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আমি নিঃসন্দেহ, আপনাদের কাজ আমাদের দুই দেশের মঙ্গলসাধন করবে।

জার্মানি দীর্ঘজীবী হোক!
ভারত দীর্ঘজীবী হোক!

৩২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ভারত

বেতার প্রচার, ১৫ অক্টোবর ১৯৪২[১]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিন থেকে কথা বলছি:

দেশবাসী এবং বন্ধুগণ! আমি শেষ বেতারে আপনাদের উদ্দেশে কথা বলেছি, আমি ইউরোপের আরেক অঞ্চলে ভ্রমণ করছি, পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখবার জন্য এবং সেখানে আমার যেসব স্বদেশবাসী আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য। বার্লিনে ফিরে এসে আমি আবার এখানকার হ্রস্ব-তরঙ্গের বেতার-কেন্দ্রের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি আমার স্বদেশবাসী যারা সারা পৃথিবীতে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। আমি তাঁদের কাছে বিশ্ব পরিস্থিতির বিবরণ দিতে চাই, যাতে আমরা সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারি, এবং স্থির করতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের কী কর্তব্য।

প্রত্যেক ভারতীয় সে দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক, অবশ্য উপলব্ধি করে থাকবেন যে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি, সে-সময়ে সামরিক পরিস্থিতি যাই হয়ে থাক। এমন একজনও ভারতীয় নেই, যিনি বিশ্বাস করেন, কোনও গতিকে ব্রিটেন যদি যুদ্ধে জিতে যায়, তার ফলে ভারতের অবস্থার কোনও উন্নতি হবে। কিন্তু এ-কথা আমি জানি, অনেক দায়িত্বশীল ভারতীয় উচ্চপদে আছেন, যাঁরা এক সময়ে বিশ্বাস করতেন, যুদ্ধে যদি ব্রিটেন কোথাও কোনও গুরুতর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, এবং তখন ব্রিটেন ভারতের সঙ্গে আপস করার কথা চিন্তা করবে। এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি, এই কারণে যে চার্চিল এবং এমারি (ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় তৎকালীন ভারত সচিব, সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া— অনুবাদক), এঁদের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের মন অন্যরকমভাবে কাজ করে, তাঁদের রাজনৈতিক রণকৌশল অন্য ধরনের। প্রথম থেকেই এই সাম্রাজ্যবাদীরা চিরদিনের মতো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবির সামনে এক পাও পিছু হটা হবে না। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাঁরা বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং পরে সেই ক্ষতির পূরণ করবেন ভারতকে আরও বেশি শোষণ করে। সেই কারণে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর মতো উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক, যাঁরা ভারতের সঙ্গে কোনওরকম একটা বোঝাপড়া চেয়েছিলেন, তাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীর নীতি এখন সারা বিশ্বের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তা

---

১. বার্লিন থেকে বেতারে প্রচারিত ১৫ অক্টোবর ১৯৪২

নিয়ে গোপনীয়তা কিছু নেই। তাঁদের রাজনীতিকদের কথা শুনলেই তা বোঝা যায়। তাঁরা দাবি করেন, এ দেশ মার্কিন প্রভাবের অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এবং ব্রিটেন সুদ্ধ অন্য সমস্ত রাষ্ট্রের সেটা স্বীকার করা উচিত এবং সেইভাবে কাজ করা উচিত। আশ্চর্যের বিষয়, এমনকী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অনেকের মধ্যেই এইরকম একটা চিন্তা বেড়ে উঠেছে যে তাঁরা খোলাখুলি ঘোষণা করছেন, যে ব্রিটেন অধস্তন স্থানে অবস্থিত, বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য তার স্বীকার করে নেওয়া উচিত একটা অবিসংবাদিত সত্য হিসাবে এবং ব্রিটেনের উচিত যেন তেন প্রকারেণ সাম্রাজ্যকে একত্র ধরে রাখা। ব্রিটেনের শিবিরে মনোবল যে ভেঙে পড়েছে তার এর চেয়ে নিশ্চিত কোনও চিহ্ন আর হতে পারে না যে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা পূর্বাহ্নেই পরাজয় মেনে নিয়েছেন। একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের চোখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি ট্র্যাজেডির দৃশ্য বলে মনে হয়, কেননা ব্রিটেন তার অধিকৃত সাম্রাজ্যের একটি অংশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে, আরেকটি অংশ তুলে দিচ্ছে তার মস্ত বড় এক মিত্রের হাতে।

গত যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট উইলসন যে ভুল করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তা করবেন না। কাজেই তিনি ব্রিটেনকে সাহায্য করবার জন্য বিনামূল্যে সামরিক সরঞ্জাম ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিচ্ছেন না। সর্বত্র তাঁর গভর্নমেন্ট নগদ মূল্য দিতেই হবে বলছে। তার ফলে ব্রিটেনের সম্পত্তি ও তমসুক ইত্যাদি সব হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে আর সেসব ঢুকছে আমেরিকার পকেটে। মার্কিন গভর্নমেন্ট সারা পৃথিবীতে সামরিক ঘাঁটিগুলি দখল করছে, আর সেগুলি হারাচ্ছে ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্য, এবং এত বোকা কে আছে যে বিশ্বাস করবে, যুদ্ধের শেষে আমেরিকা সেসব ঘাঁটি স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেবে? এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র, এমনকী ইংল্যান্ডে, উত্তর আয়ারল্যান্ডে এবং ভারতেও মার্কিন সৈন্য দেখা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র মার্কিন সৈন্যেরা তাদের নিজেদের অধিনায়কদের অধীনে আছেন এবং কোনও কোনও জায়গায় যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যান্ডে, ব্রিটিশ সৈনিকরাও মার্কিন কর্তৃত্বাধীন অর্থাৎ আমেরিকা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখল নিচ্ছে, এবং তা হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে।

সামরিক অধিকার যেমন এগোচ্ছে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকানরা তাদের ক্ষমতা জাহির করছে। আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ইংল্যান্ড এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও আমেরিকান সৈনিকরা দেশের আইনের ঊর্ধ্বে। তারা সরাসরি ওয়াশিংটনের অধীনে, আমেরিকান আইনের অধীনে। তার ফলে আজ আমেরিকানরা দেশের আইনের বহির্ভূত নানা অধিকার ভোগ করে, যা ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল ভোগ করত চিনদেশে, মিশরে এবং অন্যান্য দেশে। তার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ, যেভাবে জেনারেল দ্য গল এবং তাঁর সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করে হোয়াইট হাউসের নিজের লোক, Admiral Darlan-কে উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল দ্য গল-এর জায়গায় বসানো হল, ইঙ্গ-মার্কিন জোটে কনিষ্ঠ অংশীদারদের সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও। আমি স্বীকার করছি আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম, যেদিন বিবিসি ঘোষণা করল, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করেছেন একজন আমেরিকান জেনারেল আইসেনহাওয়ার-এর আদেশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মানবেন। বিশ্বাস করা কঠিন, হোয়াইট হাউসের প্রভুরা ব্রিটিশ সিংহের আজ এমন মেষশাবকের দশা করেছেন। কিন্তু ঘটনা সেটাই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একদা সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এখন প্রকাশ্য অধিবেশনে Darlan-এর ঘটনা আলোচনা করতে পারে না, পাছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট হন।

ভারতের কথা বলতে গেলে, আমার দেশবাসী জানেন, মার্কিন সৈন্য, মার্কিন প্রযুক্তিবিদ মিশন, মার্কিন কূটনৈতিক এজেন্টরা এর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। মার্কিনরা এখন প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন, ভারতে মার্কিনরা লন্ডনের কর্তৃত্বের অধীনে নেই, ওয়াশিংটনের কর্তৃত্বের অধীনে আছে। এবং এ-কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ক্ষমতা কমিয়ে তার জায়গায় ভারতে আমেরিকানদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা হচ্ছে। সন্দেহ নেই, চার্চিল এবং এমারি এবং তাঁদের সহকর্মীরা হোয়াইট হাউসের হাতে এত অপমান সহ্য করে যাচ্ছেন এই আশায় যে তাতে তাঁরা কোনওভাবে তাঁদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও ভাল কূটনীতিজ্ঞ। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের আত্মসমর্পণ ধন্যবাদসহকারে গ্রহণ করে তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সবসুদ্ধ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। এখন তিনি মি. উইলিয়াম ফিলিপসকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতে পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি ব্রিটিশ ভাইসরয়, লর্ড লিনলিথগোর শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এখনকার মতো, মি. ফিলিপস, রাজসিংহাসনের পিছনে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। কিন্তু মার্কিন পরিকল্পনা যদি সফল হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনওরকমে যুদ্ধে জেতে, মি. ফিলিপস খোলাখুলি শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয়ের কুর্শিতে গিয়ে বসবেন। কিন্তু ভারতের কোনও বাসনা নেই ব্রিটিশ ভাইসরয়ের আসনে মার্কিন প্রো-কনসালকে দেখার এবং সেই কারণে ভারতের এই বিষয়টির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

আমার স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে আমাদের যেন কোনও মোহ না থাকে। *আমরা কৃতজ্ঞ যে আমেরিকানদের একটি বড় অংশ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের নিজেদের গভর্নমেন্টের ওপর তাঁদের কোনও প্রভাব নেই। ভারত সম্পর্কে আমেরিকার সরকারি যে নীতি তা ব্রিটেনের নীতির মতোই সাম্রাজ্যবাদী।* হোয়াইট হাউস যদি সত্যিই চাইত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বাধ্য করতে পারত ভারতকে স্বাধীনতা দিতে, তার বদলে সে নিজেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত অধিকারের নীতি গ্রহণ করেছে, এবং এখন মি. ফিলিপস ভারতে যাচ্ছেন ভারতীয়দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে, যাতে উপযুক্ত সময় এলে তিনি এবং মার্কিন সেনাবাহিনী অতিরিক্ত সাড়া-শব্দ না তুলে সরকারের লাগাম হাতে তুলে নেবেন। দেশবাসীগণ, তার সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। তাকে বয়কট করুন।

ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারবিদেরা তুমুল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, ত্রি-শক্তি এই যুদ্ধ জিতলে বেচারি বিশ্ববাসীর কী দশা হবে, তাই নিয়ে, ছোট ছোট জাতি এবং সংখ্যালঘুদের অদৃষ্টে কী আছে তাই নিয়ে তারা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছে। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা মানবজাতির যাঁরা এক পঞ্চমাংশ, জানি আমাদের অদৃষ্টে কী থাকবে যদি তথাকথিত সংযুক্ত রাষ্ট্র কোনও প্রকারে এই যুদ্ধে জিতে যায়। আটলান্টিক চুক্তি, যার কথা আমরা এত শুনেছি, গত যুদ্ধের প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ পয়েন্টের মতোই একটা কাগজের টুকরোর বেশি কিছু নয়। কিন্তু সেই কাগজের টুকরোটিও ভারতের বিষয়ে প্রযোজ্য নয় বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, কারণ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় নির্লজ্জভাবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করে।

যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা রচিত হয়ে গেছে, এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যদি তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তাকে কার্যকরী করতে পারেন, তা হলে তাঁরা ভারতকে চার কিংবা

পাঁচটি দেশে ভাগ করে দেবেন একটি শক্তিশালী গভর্নমেন্টের অধীনে, যে সরকার তাদেরকে এখনকার চাইতে আরও কঠোরভাবে শোষণ করবে, যুদ্ধে তাদের যা লোকসান হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য। ইউনিয়ন জ্যাক তখন শুধু বর্তমান ভারতের রাজধানীর ওপর উড়বে না, উড়বে 'হিন্দুস্থান', 'পাকিস্তান' 'রাজস্থান' 'খালিস্তান' এবং 'পাঠানিস্তান'-এর ওপরেও। এবং ব্রিটিশেরা ভারতীয়দের গ্যারান্টি দেবে চিরস্থায়ী দাসত্বের। মি. এম এ জিন্না এবং তাঁর মুসলিম লিগ একটু চিন্তা করুন।

এবারে আমরা একটু ভেবে দেখব, হোয়াইট হাউস এবং ওয়াল স্ট্রিট যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তুলে দেয় এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে যান বিশ্বের পরিচালক, "The Director of the World", তখন কী হবে? তখন যা হবে তার একটা অগ্রিম আভাস এখনই আমরা পাচ্ছি মার্কিন সরকারের ব্যবহারে। সেই সরকার বরাবরই দাবি করে এসেছে চিনে উন্মুক্ত দ্বার নীতি (open door policy), কিন্তু চিন কিংবা জাপান কিংবা ভারত কিংবা কোনও এশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি খোলা দরজা পেয়ে থাকে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশীয় জাতিসমূহের অভিবাসন নিষিদ্ধ কেন? যে-প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় দীর্ঘকাল আমেরিকায় বসবাস করেছেন তাঁদের কেন নাগরিক অধিকার দেওয়া হয় না? মানবজাতির জন্য যদি আটলান্টিক চার্টারের কোনও অর্থ কিংবা তাৎপর্য থেকে থাকে, ভারতের এই অবমাননা ও অপমানের কি এখনই অবসান হওয়া উচিত নয়? আমেরিকায় যে শাসক সম্প্রদায় অন্যত্র সংখ্যালঘুদের অদৃষ্ট নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে থাকেন, নিজেদের দেশে কেন তাঁরা নির্বিকার নিষ্পাপ নিগ্রোদের নিধন বন্ধ করেন না, যা আজও চলছে? কেন তাঁরা poll tax এবং নিগ্রোদের ওপর আরোপিত অন্য সব অন্যায় দূর করেন না?

না, আমার দেশবাসীগণ, আমেরিকান রাজনীতিকদের এবং তাঁদের প্রেসিডেন্টের এইসব কথাবার্তা, এইসব উচ্চাঙ্গের ভাষণ সবই ভণ্ডামি, সম্পূর্ণ বাজে কথা এবং যদি মি. উইলিয়াম ফিলিপস মার্কুইস অফ লিনলিথগোর পদে বসেন, এবং মার্কিন সেনারা গর্ডন হাইল্যান্ডারদের (স্কটল্যান্ডের উত্তরভাগের পর্বতসংকুল অঞ্চলের একটি রেজিমেন্ট— অনুবাদক) স্থলাভিষিক্ত হয়, ভারত আজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। ভারতের মুক্তির একমাত্র আশা, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমূহ পরাজয়ের মধ্যেই নিহিত আছে।

স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ! আমার কর্তব্য আপনাদের জানানো যে আমাদের শত্রুরা গত যুদ্ধে যে তাস খেলছিল, আবার সেই একই তাস খেলতে চেষ্টা করছে। সেই রক্তের তাসটি হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তখনকার শত্রুদের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রচার। কিন্তু সেসময়ে ব্রিটিশ প্রচারে যে-সব রক্ত হিমকরা কাহিনি শোনানো হত, যেসব মিথ্যাকে শোনানো হত, তার সব পৃথিবীর লোকে ভুলে যায়নি। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ প্রচারের বিষয়ে বিশিষ্ট ব্রিটিশ প্রচারবিশেষজ্ঞ যেসব বই লিখেছেন, যেমন "Figures" কিংবা "Crewe House" এবং "Wartime Falsehoods", সেসব বই কে না পড়েছে? এমন কে আছে, যার এখনও মনে নেই যে সমস্ত স্বীকারোক্তি করেছেন General Charteris এবং অন্যেরা, যুদ্ধের সময়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত মিথ্যা প্রচার করেছেন সে বিষয়? সেই অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী এখন আগেকার চেয়ে বিচক্ষণ হয়েছে এবং তা ছাড়া বেতারের যে উন্নতি হয়েছে তার ফলে সম্ভব হয়েছে প্রতিপদে ব্রিটিশ প্রচারের মিথ্যাচারিতা অনাবৃত করে দেওয়া। আর ভারতের কথা বলতে গেলে নৃশংস অত্যাচার সম্পর্কিত এইসব প্রচারে কোনও কাজ হবে না ভারতীয়রা জানে, বোধহয় অন্য সকলের চেয়ে ভালই জানে, ব্রিটিশদের আধিপত্যের

অর্থ কী। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ, ইতিহাসে যিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছেন জালিয়াত বলে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে ঘুষ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার ভিত্তির ওপরে, সামরিক শক্তির ফলে নয়। ভারতে শক্তি হস্তগত করবার সুদীর্ঘ সংগ্রামের সময়ে এমন কোনও অত্যাচার নেই যা ব্রিটিশরা ভারতে করেনি। কে না জানে ১৮৫৭ সালে আমাদের বিপ্লবে নির্দোষ ব্যক্তিদের হাত-পা বেঁধে তাদের ওপর কামান দাগা হয়েছিল। ১৮৫৭ থেকে আজ পর্যন্ত, শান্তির সময়ে, ব্রিটিশ মিলিটারি এবং পুলিশ সব রকমের সন্ত্রাস এবং নৃশংসতা কাজে লাগিয়েছে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য। ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ওপর ব্রিটিশ সরকারের সরকারি রিপোর্ট ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিকে ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে অকারণ ব্যাপক নরহত্যা এবং সব রকমের অত্যাচার ও অবমাননা ও নির্যাতন এবং অসহায় নারীর মর্যাদাহানির অভিযোগে।

এমনকী ১৯১৯-এর পরেও ভারতীয় পুরুষদের প্রাণ ও ভারতীয় নারীদের ইজ্জতকে ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারি সর্বদাই খেলার জিনিস মনে করেছে। ভারতে কে না জানে, বঙ্গদেশের মেদিনীপুরের অধিবাসীদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, যখন ঘরবাড়ি এবং গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের নারীদের ইজ্জত লুঠ করা হয়েছিল, কারণ তারা কর না দেবার একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়েছিল? বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে সবাই জানে ১৯৩১ সালে হুবলিতে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে বন্দিশিবিরে অত্যাচারের কথা। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে আমি নিজের চোখে দেখেছি, ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ সৈনিকরা মুণ্ডহীন ব্রহ্মদেশবাসীদের যেসব ফোটো ব্রিটেনে তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, একমাত্র ব্রিটিশ সৈনিকদের পক্ষেই এরকম বিকৃতমনস্ক নৃশংসতা সম্ভব এবং এসবকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারি নিরস্ত্র নারী ও পুরুষদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল, স্বাধীনতা দাবি করার অভিযোগে। অন্যদের নৃশংসতার অভিযোগ ব্রিটিশদের মুখে মানায় না, কারণ তারা নিজেরাই যখন সে কাজে অন্য সকলের চেয়ে দক্ষ।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির একমাত্র আশা যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে, এই সত্য তো আছেই, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই যুদ্ধ শেষ হতে পারে একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মধ্যে। এই সাম্রাজ্যের একটা অংশ সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যাবে। এর বড় বড় অংশ নিজেরাই চিরদিনের মতো স্বাধীনতা পেয়ে যাবে এবং কয়েকটি অংশ হয়তো অন্য-রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। মি. উইনস্টন চার্চিল হয়তো সেই সাম্রাজ্যের পৌরোহিত্য করতে না চাইতে পারেন এবং সে কথা যখন তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর মনের কথাই বলেন। কিন্তু যে নীতি তিনি অনুসরণ করছেন, অনিবার্যভাবে তার পরিণতি হবে সাম্রাজ্যের বিনাশ। হোয়াইট হলের ওপর অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, তাঁর কর্তৃত্ব আমাদের পক্ষে সবচেয়ে নিশ্চিত গ্যারান্টি যে স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে যে পথ গিয়েছে সে পথে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে কোনও আপস সম্ভব নয়। অতএব আমার প্রার্থনা, ভারতের স্বার্থে এবং মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়তির ওপর তাঁর কর্তৃত্বই যেন বজায় থাকে, তার অন্তিম লগ্ন যতক্ষণ না আসে।

এ আমার কোনও ইচ্ছাপূরক চিন্তা নয়, আমি নিশ্চিত, ব্রিটেন পরাজিত হবে, এবং এই যুদ্ধের শেষে ভারত স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে

পৃথিবীতে একটি রণকৌশল গৃহীত হয়েছে, যাতে সকলেই অংশীদার, যা আগের যুদ্ধে ছিল না। বার্লিন-রোম-টোকিয়োকে অক্ষশক্তির গঠনের ফলে ব্রিটেনের এখন কোথাও শান্তি নেই— আটলান্টিকেও নয়, ভূমধ্যসাগরেও নয়, প্রশান্ত মহাসাগরেও নয়। নৌশক্তির দিন চলে গেছে, এবং নৌশক্তিতে যতই তার শ্রেষ্ঠত্ব থাক, ব্রিটেন এখন দেখছে অবরোধের অস্ত্র। গত যুদ্ধে যার দরুন অন্তিম সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল, এখন সেটা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তার ফলে আজ ব্রিটেনে যুদ্ধ পরিস্থিতি ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডেরই মতো গুরুতর। যুদ্ধের কলাকৌশলে এখন এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন অসুবিধায় পড়েছে। সময়, যা গত যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের এবং তার মিত্রদের পক্ষে ছিল, এখন তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং পরিশেষে, যদিও এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ইউরোপ এবং এশিয়াতে মারাত্মক ভাবে পরাজিত হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এবং তাদের প্রচারবিদেরা খুব ভালই জানেন তাদের অবস্থা কত সঙ্গিন হয়ে উঠেছে, এবং সে সমস্ত আশঙ্কাজনক সত্য থেকে মনোযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতে তারা একটি যুদ্ধ আরম্ভ করেছে যার মূল্য দিতে হচ্ছে অসহায় এবং পরাজিত ফরাসিকে। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ততটা সামরিক নয়, যতটা প্রচার, এবং এই যুদ্ধের আরম্ভের সঙ্গে প্রচারের মাত্রা ইচ্ছে করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা সময়ে বিবিসি বলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে, তারপর তারা বলল, সোভিয়েত রাশিয়া জেনারেল উইন্টার-এর সাহায্যে সেই অবস্থা থেকে তাদের বাঁচাবে। তারপর অক্ষশক্তিসমূহ যখন প্রমাণ করল, এ সমস্ত আশাই মিথ্যা, বিবিসি বলল, আফ্রিকার লড়াই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। এই সমস্ত ঘটনায় আপনারা অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিনরা, এই সব বাগাড়ম্বর, প্রচার এবং মিথ্যা সত্ত্বেও এখন অবশ্যম্ভাবী এবং বিধ্বংসী পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের বিনাশ অনিবার্য এবং সমূহ পরাজয়ের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের ভারতীয়দের উচিত আমাদের যা কিছু আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে সব ঢেলে দেওয়া। ব্রিটিশরা যারা ১৫০ বছরের বেশি ভারতকে শোষণ করেছে, তারা এখন তাদের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই চরম সংকটকালই ভারতের শেষ সুযোগ। আমরা যদি কঠোর সংকল্প সহকারে কঠিন আঘাত হানতে পারি, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমরা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীনতা লাভ করতে পারব। স্বাধীনতার জন্য সেটাই হবে আমাদের শেষ যুদ্ধ এবং আমার আশা, এই শেষ সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন বলতে পারা যাবে যে, সারা পৃথিবীর ভারতীয়রা এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

পরিশেষে আমি বঙ্গদেশে আমার দেশবাসীকে এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই, তাদের সামনে কঠিন সময়, ওই পূর্ব প্রদেশে প্রচুর রক্ত বয়ে যাবে। কিন্তু সেখানকার আমার দেশবাসীগণ যেন ভয় না পান, ভারতে ব্রিটিশদের দরজা খুলে দিয়েছিল বঙ্গদেশই এবং তাদেরকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজা বঙ্গদেশকেই দেখাতে হবে।

অতীতে ব্রিটিশরা ভারতকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং ভারতের ধনসম্পদ ব্রহ্মদেশ জয় করবার জন্য ব্যবহার করেছে। এখন ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং আবার তারা ভারতকে, বিশেষ করে বঙ্গদেশকে ব্যবহার করতে চায় ব্রহ্মদেশকে পুনরায় কুক্ষিগত করার জন্য।

সেইভাবে তারা চেষ্টা করছে যুদ্ধকে ভারতের মাটিতে টেনে আনতে। কাজেই অন্য কোনও প্রদেশের আগে সামূহিক যুদ্ধের ভয়ংকরতা বঙ্গদেশকেই দেখতে হবে, কিন্তু বাংলার উচিত তাতে গর্ব বোধ করা। আমি নিশ্চিত, বঙ্গদেশ তার যথাকর্তব্য করবে এবং তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে, আবার স্বাধীনতার সূর্য পূর্বে উদিত হবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

৩৩

ভারতের নিকটে কোথাও

জার্মানির বিদেশমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ (Von Ribbentrop)-এর প্রতি পত্র
৫ ডিসেম্বর ১৯৪২

মান্যবর,

রোম থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই আমি আপনাকে পত্র দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমার বিলম্ব হল, আমার নিজের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছার কথা বলবার আগে আমি ভারতের পরিস্থিতির কথা বলতে চাই।

আমি আপনাকে জানাতে পেরে আনন্দিত যে, আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে যা যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের পরিস্থিতির তেমন কোনও অবনতি হয়নি। বরং সাধারণ লোকের মনোভাব এখন আগেকার চেয়ে অধিক ব্রিটিশ-বিরোধী। নিম্নলিখিত কারণে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে:

(১) উত্তর আফ্রিকা ভারত থেকে অনেক দূরে এবং সেখানকার সামরিক ঘটনাসমূহের প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ পড়ে না।

(২) ফিল্ড মার্শাল রোমেল-এর বর্তমান পশ্চাদপসারণের পরে এখনও লোকের আশা, ভবিষ্যতে আবার তিনি লিবিয়ায় আক্রমণ করতে পারবেন।

(৩) সামরিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জাপানি সামরিক বাহিনীর সাফল্য। জাপানি বাহিনী যতদিন ভারতের সীমান্তে হাজির, অন্য কোনও রণাঙ্গনে তাদের পিছিয়ে পড়ার তেমন কোনও প্রভাব ভারতের ওপর পড়তে পারে না।

(৪) সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকের কথাবার্তা ভারতীয়দের মনে আরও তিক্ততার সৃষ্টি করছে।

(৫) যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা এবং হাউস অব কমন্সের নেতৃত্ব থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর অপসারণ ভারতের কাছে এটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি আরও বেশি সাম্রাজ্যবাদী হতে চলেছে।

(৬) পরিশেষে, লন্ডন থেকে বর্তমান প্রচার ইউরোপের কোনও কোনও অংশে প্রভাব ফেলতে পারলেও, ভারতীয়দের ওপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না। আমরা ভারতে ব্রিটিশ প্রচারের সম্পর্কে অবিশ্বাস উৎপন্ন করছি যাতে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, যতদিন ভারতীয় নেতারা কারাগারে আছেন, এবং যতদিন ব্রিটিশ নীতি

সাম্রাজ্যবাদী থেকে যাবে, ততদিন লন্ডন থেকে যে প্রচার করা হচ্ছে, তাতে কেউ কান দেবে না।

এখন আমাদের নিজেদের প্রচারের কাজ হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন সূত্র থেকে যে-প্রচার করা হচ্ছে, তার প্রতি অবিশ্বাস আরও দৃঢ় করা। একই সঙ্গে আমাদের দেশবাসীদের বলতে হবে, পৃথিবীর কোথাও স্থানীয়ভাবে ইঙ্গ-মার্কিনরা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে, আমরা শুধু যেন আরও বেশি কষ্ট স্বীকার করি এবং আগের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করি। আমাদের সবার শত্রু অভিন্ন, তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম একই, এবং অভিন্ন রণকৌশল আমাদের অবলম্বন করতে হবে— এই ধারণার ওপর ভবিষ্যতে আরও বেশি জোর দিতে হবে।

এক অভিন্ন বিশ্ব-রণকৌশলের দিক থেকে দেখলে ইঙ্গ-মার্কিনদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে ভারতের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে, সুদূর প্রাচ্যে এই সময়টাতে আমাদের উপস্থিতি আরও বেশি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের কাছাকাছি যদি আমি থাকতে পারতাম, আমার দেশের জন্য আরও অনেক বেশি কিছু করতে পারতাম। তা হলে আমি এই যুদ্ধে ভারতকে এমন একটা ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করতে পারতাম যা শুধু ভারতের নিজের জন্যই নয়, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের পক্ষেও যেটা হত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এমন একটা জায়গা যেখানে সরাসরি ব্রিটেনকে এবং আমেরিকাকে অপ্রত্যক্ষভাবে আঘাত করা যায়। কাজেই, স্বাভাবিকভাবে আমার কাছে এটা একটা হতাশার কারণ যে সম্পূর্ণ প্রায়োগিক (technical) কারণে আমার সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা পরিত্যাগ করতে হল, যদিও এই বিষয়ে জার্মান সরকার যথাসাধ্য করেছে। তবু আমি আশাবাদী এবং আমার মন বলছে, আমার যাত্রা সম্ভব করবার কোনও একটা উপায় বের হবে।

আমার বিশ্বাস জার্মান সরকারের পক্ষে আমার যাত্রায় সাহায্য করা কলাকৌশলগতভাবে সম্ভব, বিমানে কিংবা ডুবোজাহাজে। সে যাত্রায় অবশ্যই কিছু বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কোনও রকম কাজে এগোতে গেলেই কিছু বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সেই বিপদের ঝুঁকি আমি সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব। সেই সঙ্গে আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি এবং সেই কারণে বিশ্বাস করি সেই প্রচেষ্টা সফল হবে। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য আমি মান্যবরের প্রতি এবং জার্মান সরকারের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব, তাতে অসুবিধা এবং বিপদের ঝুঁকি যতই থাক। এবং যত শীঘ্র আমি যেতে পারব, ভারতের পক্ষে এবং আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটা ভাল হবে। শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনাদের
সুভাষচন্দ্র বসু

৩৪

ইউরোপের পরিস্থিতি

বেতার প্রচার, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪২[১]

বার্লিনের হ্রস্ব-তরঙ্গের বেতার-কেন্দ্র থেকে মাস দুয়েক আগে অক্টোবর মাসের শেষে আমি আপনাদের উদ্দেশে আমার কথা বলার পর ভেবেছিলাম ইউরোপ ত্যাগ করে আমার হেড কোয়ার্টাসে ফিরে যাব, যেখান থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে আবার আমি আপনাদের উদ্দেশে কিছু বলতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং কয়েক সপ্তাহ ঘরে বন্দি হয়ে থাকি। তার পরে আমি ঠিক করি সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য আরেকবার অল্প সময়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ইউরোপ সফরে বেরোব। সেই সফরে আমি ইউরোপের যেসব অংশে গিয়েছি তাকে বলা হয় 'অধিকৃত' এলাকা।

আমি কোনও কোনও নতুন রাষ্ট্রে গিয়েছি, যেমন স্লোভাকিয়া যার অস্তিত্বের শুরু বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে, এবং আমি কোনও কোনও রাষ্ট্রে গিয়েছি যেমন ইতালি, যারা ইঙ্গ-মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করছে। কাজেই আমি এই মহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি চিত্র রচনা করতে পারি। এই পর্যবেক্ষণ সফরের সময়ে আমি অবশ্যই সাধারণভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে ভারতের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি। এখন আবার আমি বার্লিনে, সেই কারণে এখানকার হ্রস্ব-তরঙ্গের বেতার-কেন্দ্রের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি আমার চোখে বর্তমান পরিস্থিতি এবং দেশে আমাদের কী কর্তব্য সে বিষয়ে আপনাদের কিছু বলবার জন্য।

প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনও ভাষণ দেবার আমার দরকার নেই। সাধারণ লোকেরা যেমন লক্ষ্যহীন ভাবে কথা বলে, আমার তারও দরকার নেই। আমি আগের মতো সহজ সরলভাবে আপনাদের উদ্দেশে কথা বলব। যাঁরা সহজেই ধৈর্য হারান তাঁরা স্বভাবতই হতাশ হবেন গত দু'মাস ঘটনার অগ্রগতি তত দ্রুত হয়নি বলে এবং তাঁরা হয়তো মনে করতে পারেন পরিস্থিতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যা ছিল, মূলত তাই আছে। আমি কিন্তু খোলাখুলি আপনাদের বলতে বাধ্য, আমি তা মনে করি না, যুদ্ধ এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে সময় ত্রি-শক্তির রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে এবং আমাদের অভিন্ন শত্রুর বিপক্ষে কাজ করছে। গত যুদ্ধে অবস্থা যেরকম দিকে ছিল, এখন তেমন নেই, এই যুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গেছে, জার্মানির বিরুদ্ধে যায়নি। উপরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একাংশ চলে যাচ্ছে তার শত্রুদের হাতে, আরেক অংশ তার মস্ত এক বন্ধুর হাতে। ফলে, এই যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তত আমরা নিজেদের চোখে দেখব, একদা বিশাল ও শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হওয়া। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত

---

১. বার্লিন বেতারে ৭ ডিসেম্বর ১৯৪২-এ প্রচারিত এবং "আজাদ হিন্দ" (১১-১২-১৯৪২) পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

মি. উইনস্টন চার্চিলের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেই পথেই যাচ্ছে যে পথে গিয়েছে অতীতের অন্য সব সাম্রাজ্য। এখন একমাত্র প্রশ্ন এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী কারা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমরা শিখেছি অদৃষ্টের পরিহাসে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রবল প্রবক্তারাই তার ধ্বংস ডেকে আনেন, ঠিক তেমনি ভারতে আমরা দেখেছি, লর্ড কার্জনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়ক শাসকেরা লর্ড রিপন ও লর্ড আরউইনের মতো তথাকথিত ভারত-বন্ধুদের চেয়ে জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করে তুলবার জন্য অধিকতর দায়ী হয়ে থাকেন। অতএব ভাগ্যবিধাতার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে ঠিক উপযুক্ত সময়ে তাঁর বিধানে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটেনের হাল ধরলেন। মি. চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্ব ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তার গ্যারান্টি যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কোনও আপস হবে না এবং অনতিবিলম্বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। অতএব আসুন আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম, বীভৎস পতনের সময়ে তার অদৃষ্টের হাল ধরে থাকেন।

তা যতদিন না হচ্ছে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতো উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক নেতারা যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বড় বিপদ-স্বরূপ, তাঁরা বহিষ্কৃত হন, কেননা তাঁদের মতো উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিকেরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে কেবল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারেন। ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান নির্ভর সাম্রাজ্যবাদই যেন ভারত শাসন করে যাতে ভারতীয়রা নিজেরাই দেখতে পায়, আসলে সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি কী, এবং সেটা জানার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে তারা অস্বীকার করবে।

শেষ দু'-তিন মাসের সামরিক ঘটনাবলির বিচার করা যাক। এ বিপর্যয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে অধিকতর অনুকূল হয়ে এসেছিল। মি. চার্চিল এবং তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নানা উক্তি এবং আচরণের দ্বারা পরিস্থিতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ভারতীয় এখন বুঝতে পারছেন, যুদ্ধে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য কী, দরিদ্র ভারতবাসীদের জন্য আটলান্টিক চার্টারের এবং তথাকথিত সংযুক্ত রাষ্ট্রের (United Nation)-এর নববিধান (New Order)-এর তাৎপর্য কী। কাজেই প্রত্যেক ভারতীয় এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ (এত নিঃসন্দেহ আগে কখনও ছিল না) যে তার জন্য স্বাধীনতার রাস্তা একটাই, এবং সেটা হল অতিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনাশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরা যদি ভারতের সেই উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে, ভাল কথা। কারণ ভারতের কাজ তার ফলে সহজ হবে। যদি তা না হয় ভারতবাসীদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে এবং শপথ নিতে হবে যে, নিজেদের মুক্তি সাধন করতে হবে নিজের প্রচেষ্টায়, দুঃখ ও ত্যাগের দ্বারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনও আপস সম্ভব নয়। একটিকে বাঁচতে হলে আরেকটিকে মরতে হবে, এবং যেহেতু ভারতীয় জাতীয়তা জীবিত থাকবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মরতে হবে।

বন্ধুগণ, আমরা দেখছি, ব্রিটেনে যখন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদীরা শাসনভার হাতে নিয়েছেন এবং তাঁদের নিজস্ব পথে শাসন চালাচ্ছেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে প্রকৃতই ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আগ্রহী এবং খোলাখুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিন্দা করছেন। পক্ষান্তরে, গভর্নমেন্ট এবং ক্ষমতার লাগাম যাঁদের হাতে তাঁরা যে-নীতি অনুসরণ করছেন, তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বস্তুত আমেরিকায় এই রকম একটা চিন্তাধারা প্রচলিত হয়েছে, পৃথিবী আমেরিকানদের

সম্পত্তি এবং মার্কিনি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের এই যে তত্ত্ব, ইতিমধ্যেই আটলান্টিকের এপারে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, এবং কয়েকজন প্রধান চিন্তক সোজাসুজি কিংবা ঘুরিয়ে তাকে সমর্থন করছেন। তবে তাঁদের মতে ব্রিটিশরা যেমন বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার প্রাধান্য স্বীকার করবে, আমেরিকাকেও তেমনি তার দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার সমস্ত অধীনস্থ রাজ্য অথবা উপনিবেশসহ বাঁচতে দিতে হবে, এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের অংশীদারত্ব বজায় থাকবে, এবং প্রেসিডেন্ট জানেন, কনিষ্ঠ অংশীদার রুজভেল্টের আদেশ পালন করবেন যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করবে মার্কিন সহায়তার ওপর। ভারতীয়দের এতদিনে বোঝা উচিত ছিল, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা তথাকথিত রাষ্ট্রসংঘের কাছ থেকে কোনও সাহায্য আশা করতে পারে না এবং ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যা ঘটেছে তাতে ওই মত যে সঠিক তাই প্রমাণিত হয়। অতএব ভারতীয়দের তাদের নিজের যুদ্ধ নিজেদেরই করতে হবে এবং বাইরের কোনও সাহায্য তার যদি দরকার হয়, আসতে পারে একমাত্র তথাকথিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শত্রুদের কাছ থেকে।

এই প্রসঙ্গে আমি সারা বিশ্বে আমার স্বদেশবাসীগণকে জানাতে চাই যে, মি. চার্চিল এবং ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যখন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত, তাঁদের কোনও পরিকল্পনায় স্বাধীন ভারতের কোনও স্থান নেই। ভারতীয় সমস্যা তাঁরা সমাধান করতে চান, আটলান্টিক চার্টারের নীতিগুলি ভারতে প্রয়োগ করে নয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে চূর্ণ করে দেবার জন্য মৌলিক এবং কঠোর পন্থা অবলম্বন করে, যার ফলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ভূখণ্ডে অনেকগুলি রাষ্ট্র থাকবে এবং সেইসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি এইরকমভাবে ব্রিটিশদের বুটের তলায় থাকবে। আমি জানি, আমার দেশবাসীদের মধ্যে অনেকে আগে বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ সরকার তার সংকটজনক অবস্থার কারণে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করবে এবং তার দ্বারা ত্রি-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে একটি যোগ্য সহযোগী লাভ করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ব্রিটিশদের যা নীতি, আমার ধারণা সেটা একটি দশ বছরের বালকেও পরিষ্কার বুঝতে পারবে। মি. চার্চিল এবং ব্রিটেনের শাসক চক্রের কল্যাণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয়দের কাছে অবনত হবেন না। যদি হতেই হয় ব্রিটেন অবনত হবে হোয়াইট হাউসের কাছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য ক্ষতিপূরণ করতে হবে ভারতকে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, যাতে অবস্থা আগেকার চেয়ে খারাপ হবে। অর্থাৎ "জন বুল"-এর রক্ত শুষে নেওয়া হবে। "আঙ্কল স্যাম" (আমেরিকা— অনুবাদক)-কে সন্তুষ্ট করবার জন্য, এবার ভারতকে রক্ত ঝরাতে হবে "জন বুল"-কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ভারতের ভবিষ্যতের একমাত্র অর্থ হতে পারে যন্ত্রণাদায়ক দাসত্ব।

এত দিনে আমার দেশবাসীর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকবে যে তথাকথিত রাষ্ট্রসংঘ একটা অভিন্ন রণকৌশলের মতো কিছু একটা রচনা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা ত্রি-শক্তির, বার্লিন-রোম-টোকিয়োর যে অক্ষ, তার একটা অক্ষম অনুকরণ। ইঙ্গ-মার্কিনরা যে অভিন্ন বিশ্ব-রণকৌশলের কথা এত বলেছে, সেই অনুযায়ী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়, বিশেষত ব্রিটেন এক দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পরিকল্পনা করছে, যেটা যথাশীঘ্র সম্ভব ইউরোপে হওয়ার কথা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং চূড়ান্ত চাপের মধ্যে পড়ে ইঙ্গ-মার্কিনরা ইউরোপের কয়েক জায়গায় সেই

চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই পরিচিত ব্যর্থতার সম্মুখীন তাদের হতে হয়।

অগত্যা শেষ চেষ্টা হিসাবে এক লোক দেখানো 'দ্বিতীয় রণাঙ্গণ' খুলবার জন্য তারা আফ্রিকার ওপর একটা আক্রমণ করে, যেটা ত্রি-শক্তির দখলেও ছিল না, তাদের অধিকারেও ছিল না, যেটা ছিল ফরাসি সাম্রাজ্যের অধিকারে এবং ফরাসিদের হাতে যেটা ইচ্ছে করে রাখা হয়েছিল একটি পরাজিত শত্রুর প্রতি সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে। এক অসহায় অরক্ষিত ভূমিখণ্ডের ওপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের পর এই আকস্মিক আক্রমণ নিয়ে লন্ডন এবং নিউইয়র্ক এমন ভাবে ঢাক পেটাচ্ছে যেন সেটা একটা বিরাট সামরিক কীর্তি। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের বিচারে এই সামরিক কীর্তি ফরাসি সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ম্যাডাগাস্কার রি-ইউনিয়ন দ্বীপের ওপর আক্রমণের সমকক্ষ। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য অন্যান্য রণাঙ্গনে ব্রিটেনের পরাজয়কে লোকচক্ষুর আড়াল করা, যেসব পরাজয় বর্তমান যুদ্ধের শেষ ফলের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মনোযোগ ফেরানো এবং সোভিয়েত সরকার যারা ক্রমাগত ইউরোপে 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' দাবি করে চলেছে, তাদেরকে ভোলানোই এর উদ্দেশ্য। বন্ধুগণ, এবার এখানকার পরিস্থিতিটাকে আবেগশূন্য ভাবে বিচার করে দেখা যাক। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় সুদূর প্রাচ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং তাদের নৌবহর এখন প্রশান্ত মহাসাগরে কবরস্থ। ইউরোপে ব্রিটিশ শক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং 'দ্বিতীয় রণাঙ্গণ' সম্পর্কে যাবতীয় কথাবার্তা শিশুসুলভ স্বপ্ন। ইঙ্গ-মার্কিনরা এখন যা করতে পারে তা হল আফ্রিকার মহাদেশে কোথাও ছোট-বড় লড়াই বাধানো যার জন্য মূল্য দিতে হবে ফরাসি সাম্রাজ্যকে। কিন্তু এই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করবে আফ্রিকা নয়, ইউরোপ ও এশিয়া। এবং ইউরোপ ও এশিয়ার কথা বলতে গেলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এবং তাদের সঙ্গীদের ভবিষ্যৎ যার-পর-নাই অন্ধকার। উত্তর আফ্রিকায় অরক্ষিত ফরাসি ভূখণ্ডে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ নিয়ে বেতার বক্তৃতায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খুব শোরগোল তুলেছে। আমি ভাবি, উন্নত শ্রেণীর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এরা যদি প্রকৃতই কোনও লড়াইয়ে জিতত তা হলে এরা কী ধরণের প্রচার করত। ব্রিটিশ প্রচারের কৌশল স্পষ্ট প্রমাণ করে ব্রিটেনে জনসাধারণের মনোবল এত নীচে নেমে গেছে যে ওই ধরনের কৃত্রিম উত্তেজক দরকার হয়ে পড়েছে, ব্রিটিশ জনগণের মনোবল উঁচুতে ধরে রাখার জন্য। কিছুকাল বিবিসি বিশ্বকে বলছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। তারপর তারা এই যুক্তি খাড়া করল যে সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটেনকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবে। এখন তারা বলছে, আফ্রিকা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। কখনও একবারও আমি গত তিন বছরের মধ্যে কোনও ব্রিটিশকে বলতে শুনিনি, যা এক মহান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন "ইংল্যান্ড নিজের চেষ্টায় নিজেকে বাঁচাবে।"

না, বন্ধুগণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেইসব দিন চলে গেছে এবং এখন আমরা নিজেদের চোখে দেখছি, একদা যা ছিল এক বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য, তার দ্রুত ধসে পড়া। আমি আপনাদের খোলাখুলি বলতে পারি সর্বশেষ ঘটনাসমূহের আলোকে সামগ্রিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে আমি আজ যত আশাবাদী আগে কখনও তা ছিলাম না। ভারতীয় জনগণ এবং তাদের লক্ষ্য যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তার মধ্যে আর কোনও বাধা নেই। তবে, এই অভিন্ন সংগ্রাম যার লক্ষ্য এক, তাতে আমাদেরকে আরও সক্রিয়ভাবে, আরও প্রবলভাবে যোগ দিতে হবে। পুরনো যে বিশ্ব ব্যবস্থা, তার যত অবিচার, যার ওপরে সে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে রক্ষা করার, চিরস্থায়ী করে রাখবার জন্য একটা অভিন্ন কৌশল আছে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার

জন্য, পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার জন্যও একটি অভিন্ন কৌশল আছে।

এবারে, ভারতের পরিস্থিতির প্রশ্নে এসে আমি প্রথমেই গত কয়েক মাস আপনারা যা করেছেন তার জন্য আপনাদের আরেকবার অভিনন্দন জানাতে চাই। আপনাদের সাফল্যে বিশ্ববাসী বিস্মিত ও আনন্দিত। দিনের পর দিন ব্রিটিশরা যে প্রচার চালিয়েছে তাতে কেউ আশা করতে পারেনি নিরস্ত্র ভারতীয়রা ট্যাঙ্ক, মেশিনগান এবং বিমান সজ্জিত অত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে অমন সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ করতে পারবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত চেষ্টা করে এসেছে বাইরের জগৎ থেকে ভারতের পরিস্থিতির প্রকৃত সত্য আড়াল করে রাখতে কিন্তু তাদের সমস্ত অভিসন্ধিমূলক চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে কী ঘটছে তার খবর পৃথিবীর কাছে সমানে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ভারতের পক্ষে যেটা আনন্দের বিষয় তা হল তথাকথিত রাষ্ট্রসংঘের শিবিরেও ভারতের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে প্রচুর সহানুভূতি ও সমর্থন আছে।

বন্ধুগণ, আমি আগেই জোর দিয়ে বলেছি যে আমরা এক অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে এক অভিন্ন সংগ্রামে রত আছি। এই সংগ্রামে ভারত এবং নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিকে ভবিষ্যতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনাদের জন্যই, যারা দায়িত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এবং আপনাদের দায়িত্ব সেই কারণে বিরাট এবং ভারতীয়দের দায়িত্ব সবচেয়ে বড়। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ। বস্তুত ভারতই এই সাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর্তা এবং সেই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে মানবজাতির বন্ধনমোচনে সাহায্য করা ভারতেরই কর্তব্য।

সন্দেহ নেই, জাতীয় সংগ্রামে ভারতবাসী প্রচুর দুঃখভোগ করেছে। কিন্তু আরও কষ্টভোগের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতার পথ কোনওদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমাদের দেশবাসীর অদৃষ্টে এখনও দুঃখভোগ লেখা আছে। আরও রক্ত, নিরপরাধের রক্ত, এখনও হিন্দুস্তানের পুণ্যভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, তবে আমরা স্বাধীনতার আশা করতে পারি। শহিদের রক্ত দিয়ে চিরদিন স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কাজেই আমরা সে মূল্য দিতে প্রস্তুত। আমাদের জয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। মনে রাখবেন, এই সেদিন আমি কী স্লোগান দিয়েছিলাম। "দুটি বৎসর এবং এক লক্ষ জীবন!" এই সংগ্রামে স্বেচ্ছায় এক লক্ষ জীবন দান করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তা হলে স্বাধীনতা চিরদিনের মতো আমাদের করায়ত্ত হবে।

বন্ধুগণ, আমার কোনও কোনও ব্রিটিশ বন্ধু যাঁরা বিবিসি-র অফিসে বসে আছেন তাঁরা অতিশয় বিচলিত বোধ করছেন, আমি যে আমার প্রতিশ্রুতিমতো দেশে ফিরে এসে আমাদের সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে যোগ দিইনি, সেই জন্য আমি বলি, তাঁরা ধৈর্য ধরুন। ইতিমধ্যে আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে পারি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে নয়, আমার দেশবাসীকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সময় এলে তা পূর্ণ করা হবে। যেমন রাত্রির পরে আসে দিন, তেমনি অনিবার্যভাবে বর্তমান যুদ্ধের পর আসবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া। ঠিক যেমন রাত্রির পরে আসে দিন, তেমনি বর্তমান সংগ্রাম থেকে ভারত বেরিয়ে আসবে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে। এবং ঠিক যেমন রাত্রির পর আসে দিন, শেষ সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য আমি বেঁচে থাকব—বিদেশ থেকে নয়, স্বদেশে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যেসব সঙ্গীরা ইতিমধ্যেই অকুতোভয়ে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, যখন আমি নিজের কর্তব্য সাধনে বিদেশে থেকেছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

৩৫

দেশপ্রেমী ভারতীয়দের কর্তব্য

বেতারে প্রচার, ১ জানুয়ারি ১৯৪৩[১]

সৌভাগ্যবশত গত বছরের সামরিক ঘটনাবলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ একটু ম্লান করে দিয়েছে। ইউরোপে মিত্রশক্তির বহুকথিত 'দ্বিতীয় রণাঙ্গণ'-এর প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে বিফল হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় অক্ষশক্তির অবস্থা বেশি ভাল। বীর জাপানিরা সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিনদের ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে এবং ভারতীয় রণাঙ্গনে জাপানিরা তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এক কথায়, ব্রিটিশ এবং মার্কিন প্রভাব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। যুদ্ধ এখন শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। অক্ষশক্তি অপরাজেয় এবং সময় তাদের পক্ষে কাজ করছে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয় মহাদেশের বৃহৎ অংশে মিত্রশক্তির প্রাধান্য ছিল কিন্তু আজ ইউরোপ থেকে তারা বহিষ্কৃত। গত যুদ্ধে প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ফ্রান্স কিন্তু এবার তারা যুদ্ধের বাইরে। সেবার রাশিয়া আক্রমণে ছিল, এবার আছে আত্মরক্ষায়। জার্মান সৈন্যবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে অনেক দূরে ঢুকে পড়েছে। গত যুদ্ধে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয়েরই সমুদ্রের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল আর এবার তাদের যৌথ ভূ-বায়ু এবং নৌ-সেনা অক্ষশক্তির সমকক্ষ নয়। গত যুদ্ধ ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আর এবারকার যুদ্ধের আগুন প্রায় সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে। তার কারণ অক্ষশক্তির বায়ু, ভূমি ও সমুদ্রের ওপর আধিপত্য। গত যুদ্ধের সময়ে ভূমধ্যসাগর ছিল ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু আজ সেখানে ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। মিত্রশক্তি জার্মানিকে অবরোধ করেছিল, আজ অবস্থা ঠিক তার বিপরীত—জার্মানি ব্রিটেনকে অবরোধ করেছে।

অক্ষশক্তির হাতে অপরিমিত সহায়-সম্পদ, খাদ্যশস্যের বিপুল সম্ভার। মিত্রশক্তির অবস্থার দিনে দিনে অবনতি হচ্ছে এবং জাহাজের অভাব মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনেতাদের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। এই যুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণ অক্ষশক্তির জয় সুনিশ্চিত করেছে। ব্রিটেন দীর্ঘকাল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সুরক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত, পূর্ব ভারতের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে ১৯৪১ সালে। সিঙ্গাপুর, যাকে ব্রিটেন বিশ বছর সুরক্ষিত রেখেছে, জাপান দখল করে নিয়েছে সাত দিনে। এই সব বিষয় বিবেচনা করে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ব্রিটেন ধ্বংসের সম্মুখীন।

ভারতীয়দের উচিত এখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, ইঙ্গ-মার্কিনদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে তাদের ভূমিকা পালন করা। ব্রিটেনের জোয়াল কাঁধ থেকে তাদের ফেলে দেওয়া উচিত।

---

১. বার্লিন বেতারে ১ জানুয়ারি, ১৯৪৩-এ প্রচারিত।

ব্রিটেনের পরাজয়ের পর ভারতীয়দের থাকবে নিজস্ব স্বাধীন সরকার।

ভারতীয়রা এবং বিদেশে যাঁরা ভারতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত, আমি জানি আমার ওপর আপনাদের পূর্ণ আস্থা আছে। এই যুদ্ধের পরিণতি কী হবে তা পরিষ্কার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিলোপ অনিবার্য। ভারত স্বাধীন হবে। অতএব ভারতীয়দের উচিত অক্ষশক্তিকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যোগ না দেবে তারা বিশ্বাসঘাতক। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় জাতির যাঁরা আছেন বর্তমান সংগ্রামে তাঁদেরও ভূমিকা আছে। ব্রিটেনের অত্যাচার এবং নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। জেলখানা, বন্দুকের গুলি যেন আমাদের মনোবল ভেঙে না দেয়। প্রত্যেক ভারতীয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে। ত্যাগ এবং কাজ আপনাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করবে।

৩৬

স্বাধীনতা দিবস

ভাষণ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৩[১]

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ!

আজ, ২৬শে জানুয়ারি পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয়রা সমবেত হন তাঁদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে। আজকের দিনে তাঁরা তাঁদের জাতীয় পতাকার নীচে একত্র হন স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের মৃত্যুহীন আনুগত্য এবং যতদিন জয় না অর্জিত হয় ততদিন জাতীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অনড় সংকল্প ঘোষণা করতে। আজকের দিনে প্রত্যেক গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সর্বত্র শোভাযাত্রা বের করা হয় যেখানে স্বাধীনতার ইস্তাহার পাঠ করা হয় এবং গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়। ভারতীয়দের সব সময়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠান বিনা বাধায় পালন করতে দেওয়া হয় না। বারে বারে তাঁদের বাধ্য করা হয় পুলিশের নিষেধ অগ্রাহ্য করতে, ব্রিটিশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করতে। যেমন ১৯৩১-এ, ১২ বছর আগে, ভারতের বৃহত্তম শহর কলকাতার মেয়র হিসাবে স্বাধীনতা দিবসে যখন একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম তখন আমি এবং মিছিলে আমার সঙ্গীরা ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হন যার ফলে আমাদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। তবু যাঁরা বেয়নেট ও রাইফেলের গুলির আক্রমণের সামনে পড়েছিলেন তাদের চেয়ে আমাদের অদৃষ্ট ভাল ছিল।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, জার্মান সরকারের সৌহার্দ্যে, তাঁদের আতিথেয়তায় আমার স্বদেশবাসীরা এবং আমি এই বছর জার্মানিতে স্বাধীনতা দিবস উপযুক্ত মর্যাদায় পালন করতে

---

১. বার্লিন থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে প্রচারিত এবং "আজাদ হিন্দ" (১/২, ১৯৪৩) পত্রিকায় মুদ্রিত। এই ভাষণ মূল জার্মান ভাষায় প্রদত্ত হয়েছিল, কিন্তু অব্যবহিত পরেই নেতাজি ইংরেজিতে এটি প্রদান করেন। বার্লিন বেতার বার্লিন থেকে অনুষ্ঠানটি প্রচার করে এবং ভাষ্যকার প্রথমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবসের শপথ বাক্যটি পাঠ করেন, তারপর দৃশ্যটির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : "ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা বার্লিনে এক বৃহৎ সভায় উপস্থিত হয়েছি। শত শত অতিথি সমবেত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসুর একটি ভাষণ শুনতে। বহু সংখ্যক ভারতীয় এখানে এসেছেন এবং আরও এসেছেন 'স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় কমিটি' দ্বারা আমন্ত্রিত অন্য অনেক ইউরোপীয় জাতির প্রতিনিধি। এসেছেন বহু জার্মান, ইতালিয়ান, জাপানি এবং জার্মান সামরিক বাহিনীর অনেক অফিসার এবং ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট (নাৎসি) পার্টির অনেক সদস্য। অতিথিদের মধ্যে আছেন জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রী রশিদ আলি গিলানি। এক বর্ণময় এবং অতি বিশিষ্ট সমাবেশ। সভাকক্ষ সুন্দরভাবে ফুলসজ্জায় সজ্জিত রক্তবর্ণের টিউলিপ এবং শ্বেতবর্ণের লাইল্যাকে। স্বাধীন ভারতের মহান নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এখন উঠে স্পিকারের চেয়ারের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর পরিধানে কালো শেরওয়ানি। তিনি এগিয়ে আসছেন দেখে বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনি। সুভাষ জার্মান ভাষায় ভাষণ দিচ্ছেন। অবশ্য আপনারা অনেকে বুঝতে পারবেন না, তাই আমরা ব্যবস্থা করেছি যাতে আপনারা তাঁর ভাষণ ইংরেজিতে শুনতে পান। সুভাষচন্দ্র বসু অনুগ্রহ করে আপনাদের প্রতি ইংরেজিতে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। এখন সুভাষচন্দ্র বোস আপনাদের প্রতি ভাষণ দিচ্ছেন।" এরপর ভাষণটি প্রদত্ত হয় যা এখানে মুদ্রিত হল।

পারছি। কিন্তু স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ছে, স্বদেশে আমাদের দেশবাসীর কথা, যাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করতে হচ্ছে কাঁদানে গ্যাস এবং পুলিশের ব্যাটন এবং মেশিনগান অগ্রাহ্য করে। এমনই এক আশ্চর্য বস্তু আটলান্টিক চার্টার যার জন্য মিত্রশক্তি যুদ্ধ করছে। ভারতে সমস্ত জনসভা ও মিছিল ইত্যাদি স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ধৃষ্টতা সহকারে ভারতবাসীদের জন্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র চেয়েছিল।

গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা, আধুনিক জীবনে বিশেষত আধুনিক যুদ্ধে প্রচারের গুরুত্বের বিষয়ে বিশ্বের চোখ খুলে দিয়েছে। মোটামুটি সকলেই স্বীকার করবে ব্রিটেনই প্রথম তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আধুনিক প্রচারের অস্ত্র ব্যবহার করেছে, এবং তাতে প্রচুর ফললাভ করেছে। এই মিথ্যা দুরভিসন্ধিমূলক এবং কখনও কখনও সূক্ষ্ম, চাতুর্যপূর্ণ প্রচারের কুফল যাদের ভোগ করতে হয়েছে, ভারত তাদের অন্যতম। অনেক দেরিতে আমরা ভারতীয়রা উপলব্ধি করেছি যে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের শুধু ন্যায্য কারণ থাকলেই হবে না, বিশ্বকেও বোঝাতে হবে যে ন্যায্য কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে। যখনই ভারতের বাইরে গেছি আমি দেখে স্তম্ভিত হয়েছি, ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রচার সারা বিশ্বে কত কার্যকর। সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন বন্ধুদের মুখ থেকেও শুনি এমন ভারতবিরোধী প্রচার যা রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রচারবিদেরা শুনিয়ে থাকেন।

ব্রিটিশদের ভারতের ওপর আধিপত্য এবং ভারতকে শোষণের কোনও রকম একটা নৈতিক সাফাই দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ প্রচার বিদেশে ভারতকে এমন এক দেশ হিসাবে চিত্রিত করেন যার মধ্যে কোনও ঐক্য নেই, যে দেশে লোকে চিরকাল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে এসেছে, যে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, উন্নয়নের জন্য ব্রিটেনের শক্ত হাত দরকার। কিন্তু এই উদ্ধত ব্রিটিশরা নিজেদের সুবিধামতো ভুলে যায়, তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রশাসন এবং জাতীয় ঐক্যের কথা কিছু শিখবার অনেক আগেই, বস্তুত রোমানরা সংস্কৃতি ও সভ্যতা শেখাবার জন্য অসভ্য ব্রিটেনে আসার আগেই ভারতে শুধু যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল তা নয়, চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত একটি বিশাল সাম্রাজ্য ছিল দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উত্তরে আফগানিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত, যে সাম্রাজ্য ছিল আমাদের ভারতের চেয়ে বড়। ভারত এমন একটি দেশ যে ব্যাবিলন, মিশর অথবা গ্রিসের মতো অতীত বিস্মৃত হয়নি, যে দেশে ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের রক্তে ও আমাদের মজ্জায় এখনও জীবিত আছে। এই যে জাতীয় আত্মসচেনতা, এর জন্যই রাজনৈতিক পরাধীনতা কিংবা অর্থনৈতিক দারিদ্র্য কিছুই আমাদের আত্মাকে হত্যা করতে পারেনি। আমরা ইতিহাস পরিমাপ করি দশক নয়, শতক নয়, হাজার হাজার বছর দিয়ে। তার ফলে যখন দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর এসে পড়ে আমরা মনোবল হারাই না। আমরা জানি, আমরা যদি হাল ছেড়ে না দিই, লড়াই চালিয়ে যাই, আবার আমরা শীর্ষে পৌঁছব।

আমাদের কাছে জীবন এক দীর্ঘ, অন্তহীন তরঙ্গ। সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এ হল লীলা শক্তির চিরন্তন খেলা। নানা শক্তির এই মহাজাগতিক খেলায় শুধু সূর্যালোকই নেই, অন্ধকারও আছে, শুধু আনন্দ নয়, দুঃখও আছে, শুধু উদয়ই নয়, অস্তও আছে। নিজেদের ওপরে এবং আমাদের যে দৈব সত্তা তার ওপরে বিশ্বাস যদি আমরা না হারাই, অন্ধকার, দুঃখকষ্ট এবং অধঃপতন আমরা পেরিয়ে যাব সূর্যালোক, আনন্দ এবং অগ্রগতির অভিমুখে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, দার্শনিকতার এই অবতারণার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু ভারতকে যদি আপনি বুঝতে চান তা হলে আপনাকে বুঝতে হবে ভারতের আত্মাকে, যে চিরন্তন বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, আমাদের যৌবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যার বলে আমরা তাকাতে পারি সামনের দিকে, সভ্যতা, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির দিকে। এ-সব কথা বোঝা মুশকিল যে দেশে লক, হিউম, মিল এবং স্পেনসর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের প্রতিনিধি। কিন্তু কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel), গ্যেটে (Goethe) এবং শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer), শ্লেগেল (Schlegel), এবং Ruckert, ম্যাক্স মুলার (Max Muller) এবং Deussen-এর দেশে ভারতকে বোঝা যায়, বোঝা যাবে।

ভারত ও ব্রিটেনের সংঘর্ষ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধাক্কা মেরে আমাদের জাগিয়ে দিল, আমাদের তন্দ্রা ভেঙে দিল, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে তন্দ্রা ভারতীয়দের আচ্ছন্ন করেছিল। তবে ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সংযোগের একটি অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ হয়েছে। ব্রিটিশরা যে-সব বস্তুকে মূল্যবান মনে করে, সুনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতিকে তার মধ্যে ওরা যথেষ্ট মর্যাদা দেয়নি। তারা যাকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রশংসা ও সম্মান করে তা হল যুদ্ধ করা ও হত্যা করার ক্ষমতা। আরেকটি জিনিস, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভারত দখল করে নেবার জন্য ব্রিটিশরা শুধু অস্ত্রই ব্যবহার করেনি, ঘুষ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সব রকমের দুর্নীতিও ব্যবহার করেছিল। প্রথম যখন ব্রিটিশরা ভারতের একটি অঞ্চল বঙ্গদেশ অধিকার করে, তারা এমন এক জনসমষ্টির সংস্পর্শে এল যারা শিল্প এবং দর্শনে অতি উন্নত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তাদের হেয় জ্ঞান করত, কারণ ব্রিটিশরা যোদ্ধা হিসাবে তাদের নিকৃষ্ট মনে করত। মানুষ যখন কিছুদিন পরে বুঝতে পারল, ব্রিটিশেরা যাকে গুরুত্ব দেয় তা হল শক্তি, শিল্প কিংবা নৈতিকতা নয়, তারা বোমা এবং রিভলবার ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। তারপর থেকে ব্রিটিশেরা তাদের খাতির করতে আরম্ভ করেছে, যদিও তাদের ভয় এবং তীব্রভাবে ঘৃণাও করতে আরম্ভ করল। সারা ভারত এখন জেনে গেছে যে একমাত্র যে যুক্তি ব্রিটিশেরা বোঝে এবং খাতির করে, সেটা হল শক্তির যুক্তি।

জাপানিরা বোধহয় একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যদিও তাদের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যত দিন জাপান সসম্মানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিল এবং অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিকেই নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল, বাইরের জগতের প্রশংসা কিংবা মনোযোগ সে আকর্ষণ করেনি। কিন্তু যখন ১৯০৫ সালে সে আধুনিক যুদ্ধে সাম্রাজ্যের অধিকারী রাশিয়াকে পরাস্ত করতে পারে, সারা বিশ্ব তাকে সম্মান করতে আরম্ভ করল। জাপানের এই অভিজ্ঞতা থেকে শুধু ভারতই নয়, এশিয়ায় অন্যান্য দাসত্ব- শৃঙ্খল-আবদ্ধ দেশও শিক্ষালাভ করতে পারে।

আমাদের পূর্বসূরিদের সব চেয়ে বড় ভুল, যে-ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিলেন একদম প্রথমেই তাদের প্রকৃত চরিত্র এবং ভূমিকা বুঝতে না পারা। তাঁরা বোধহয় ভেবেছিলেন অতীতে যে অসংখ্য জাতি ভারতে এসে পড়েছিল এবং ভারতকে তাদের ঘরবাড়ি বানিয়েছিল, ব্রিটিশরাও তাদেরই মতো একটি জাতি। তাঁদের বুঝতে অনেকদিন লেগেছিল যে ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল ভারতকে জয় করতে, ভারতে লুঠ করতে, ভারতে বসবাস করতে নয়। সারা দেশে সবাই যখন এ কথাটা বুঝে গেল, ১৮৫৭ সালে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল, ফলে ইংরেজ ইতিহাসবিদেরা ভুল করে বললেন এ সিপাহী বিদ্রোহ, কিন্তু ভারতীয়রা যাকে

মনে করল প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবে ব্রিটিশরা প্রথম দেশ থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছিল, কিন্তু অংশত অপেক্ষাকৃত ভাল রণকৌশলের এবং অংশত অদৃষ্টের গুণে শেষ পর্যন্ত তাদের জয় হল। তারপর আরম্ভ হল এমন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব যার সমতুল্য কিছু ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপক গণহত্যা আরম্ভ হল যাতে নিরপরাধ মানুষদের হাত-পা বেঁধে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হল।

ভারতে সংগঠিত ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয় ১৮৫৮ সাল থেকে, অর্থাৎ ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবের পর থেকে। তার আগে হাজার হাজার বছর ধরে ব্রিটেনের সহায়তা ছাড়া ভারত যদি বেঁচে থাকতে পেরে থাকে, সমৃদ্ধি ভোগ করতে পেরে থাকে, আবার ভবিষ্যতে, যখন সে স্বাধীন হবে, সে বেঁচে থাকতে পারবে, সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারবে।

১৮৫৭-র বিপ্লবের পর, ব্রিটিশেরা বুঝতে পারল যে শুধু পশুশক্তির দ্বারা তারা ভারতকে শাসন করতে পারবে না। অতএব তারা দেশকে নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করল এবং আমাদের পূর্বসূরিদের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূর্খতা ও ভুল হল সেই নিরস্ত্রীকরণ মেনে নেওয়া। অত সহজে যদি তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ না করতেন, তা হলে ১৮৫৭ থেকে ভারতের ইতিহাস যা হয়েছে তা না হয়ে বোধহয় অন্যরকম হত। দেশকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে ব্রিটিশরা একটি ক্ষুদ্র অথচ কর্মক্ষম আধুনিক বাহিনীর সাহায্যে ভারতকে নিজেদের হাতে রাখতে সক্ষম হল।

নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, যার নিয়ন্ত্রণ হত সোজাসুজি লন্ডন থেকে, "বিভক্ত করে শাসন করো", এই নীতিতে শাসন আরম্ভ করল। "বিভক্ত করে শাসন করো" এই হল ১৮৫৮ থেকে আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নীতি ছিল ভারতকে বিভক্ত রাখা, দেশবাসীদের তিন-চতুর্থাংশকে সরাসরি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রণে এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশকে দেশীয় রাজন্যবর্গের অধীনে রেখে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ ভারতের বড় বড় জমিদারদের প্রতি প্রভূত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করল। এই শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশেরা অবশ্য বুঝতে পারল, রাজন্যবর্গকে এবং বড় জমিদারদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তারা আর ভারতে আধিপত্য করতে পারবে না। তখন তারা ১৯০৬ সালে মুসলিম সমস্যা আবিষ্কার করল, যখন লর্ড মিন্টো ছিলেন ভাইসরয়। তার আগে পর্যন্ত ভারতে সেরকম কোনও সমস্যা ছিল না। ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবে হিন্দু ও মুসলিমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং একজন মুসলিম বাহাদুর শাহ-এর পতাকার তলে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশেরা যখন দেখল ভারতীয়দের আরও বেশি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে তখন তারা বুঝতে পারল যে মুসলিমদেরকে অবশিষ্ট দেশবাসীর থেকে বিভক্ত করলেই হবে না, ফলে তখন তারা হিন্দুদের নিজেদেরকেই বিভক্ত করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। সেইভাবে ১৯১৮ সালে তারা হিন্দুদের মধ্যে জাতি বা বর্ণভেদ আবিষ্কার করল এবং হঠাৎ তারা তথাকথিত "দলিত জাতি"দের পক্ষ নিয়ে তাদের উদ্ধারকর্তা হয়ে উঠল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন আশা করেছিল রাজন্যবর্গের, মুসলিমদের এবং দলিত শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে লড়াই করবার ভাব দেখিয়ে ভারতকে বিভক্ত করে রাখতে পারবে। ১৯৩৫-এর নতুন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, তারা বিস্মিত হয়ে দেখল, তাদের সমস্ত চালাকি এবং ধাপ্পাবাজি ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রবল জাতীয়তাবোধ সমস্ত জাতিকে, তার সমস্ত অংশকে প্রভাবিত করেছে। তার ফলে ব্রিটিশ নীতি এখন তাদের শেষ আশাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

ভারতীয় জাতিকে যদি বিভক্ত করা না যায়, তা হলে দেশটিকে, ভারতকে, বিভক্ত করতে

হবে ভৌগোলিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে। এই হল সেই পরিকল্পনা যার নাম পাকিস্তান, যার জন্ম হয়েছে একজন ব্রিটিশের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য অংশেও যার উদাহরণ দেখা গেছে। যেমন, সিংহল, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে যা ভারতের অন্তর্গত, অনেক দিন আগেই তাকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই আয়ারল্যান্ড, যা চিরকাল ছিল এক অখণ্ড দেশ, তাকে দু'ভাগ করা হল, 'আলস্টার' ও 'আইরিশ ফ্রি স্টেট' নামে। ১৯৩৫-এর নতুন সংবিধান-এর পর ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে আলাদা করা হল এবং মাঝখানে যদি এই বর্তমান যুদ্ধ এসে না পড়ত, তাহলে আগেই প্যালেস্টাইন একটি ইহুদি রাষ্ট্র, একটি আরব রাষ্ট্র এবং সেই দুয়ের মধ্যে ব্রিটিশদের একটা যাতায়াতের পথে ভাগ হয়ে যেত। নিজেরাই পাকিস্তানকে আবিষ্কার করে কিংবা ভারতকে ভাগ করার মতলবটা আবিষ্কার করে, ব্রিটিশেরা তার সমর্থনে এক বিশাল অথচ চতুর প্রচার চালাচ্ছে।

যদিও ভারতীয় মুসলিমদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটি স্বাধীন ভারত চায়, যদিও আজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একজন মুসলিম, এবং যদিও মুসলিমদের মধ্যে লঘিষ্ঠ সংখ্যকই পাকিস্তানের প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবুও সারা বিশ্বে ব্রিটিশপ্রচার এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, ভারতীয় মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের পিছনে নেই, এবং ভারতের বিভক্ত হওয়া চায়। ব্রিটিশরা নিজেরাই জানে, যা তারা প্রচার করছে সেটা মিথ্যা কিন্তু তা হলেও তারা আশা করে মিথ্যাটা বার বার বলে তারা বিশ্বকে সেটা বিশ্বাস করাবে। ভারতকে বিভক্ত করার চিন্তাটা নিজেরাই উদ্ভাবন করে, তাকে এমনভাবে বিস্তারিত করে তুলেছে যে তারা যদি নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যাপারটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারত, তাহলে ভারতকে প্রথমে তারা যা প্রস্তাব করেছিল, সেই অনুযায়ী, দু'ভাগ নয়, পাঁচ কিংবা ছ'ভাগে ভাগ করত এবং সেই সবক'টি রাষ্ট্র বাধ্য হয়েই ব্রিটিশদের জুতোর তলায় থাকত।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতে ব্রিটিশদের নীতির বিশ্লেষণ করতে আমি আপনাদের এতটা সময় নিলাম তার কারণ আমি আপনাদের বলতে চাই যে, যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের এক চতুর ও শয়তানিতে পরিপক্ক শত্রু, আমাদের শত্রুকে আমরা এত উত্তমরূপে চিনি যে ভবিষ্যতে আবার আমরা প্রতারিত হব, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। শত্রুকে আমরা ভালভাবে চিনে নেবার পর আমরা তাকে পর্যুদস্ত করতে পারব। ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে আপসের কোনও সম্ভাবনা নেই। কোনও বিষয়েই তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও মিল নেই এবং তাদের ও আমাদের জাতীয় স্বার্থ একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। ত্রি-শক্তি এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব একই সঙ্গে সম্ভব নয়। একটিকে যদি বেঁচে থাকতে হয় আরেকটিকে মরতে হবে, এবং যেহেতু ভারতীয় জাতীয়তা বেঁচে থাকবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মরতে হবে।

ভারতের আজকের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবেরই ধারাবাহিকতা। উনিশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে ভারতীয় আন্দোলন সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে আন্দোলনের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই আন্দোলন একটি সংগঠনের রূপে দানা বাঁধে যখন ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। এই শতাব্দীর সূচনায় ভারতে এক নবজাগরণ দেখা যায় এবং তার সঙ্গে সংঘর্ষের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। প্রথম দুই দশকে আমরা দেখি এক দিকে ব্রিটিশ সামগ্রীর অর্থনৈতিক বর্জন এবং আরেক দিকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ

(revolutionary terrorism)। গত যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করবার এক মরিয়া প্রচেষ্টা চালান, সেই সময়ে যখন জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও তুরস্ক আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় বিপ্লবীরা হেরে যান।

যুদ্ধের পর ভারতের সংগ্রামের জন্য একটি নতুন অস্ত্রের প্রয়োজন হল, এবং ঠিক এমন সময়টিতে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর সত্যাগ্রহ অথবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নিয়ে। গত বাইশ বছরে কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছে সারা দেশে, দেশীয় রাজ্যেও। দূর দূর গ্রামেও দেশবাসীর সব শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সত্তা জেগে উঠেছে। সবচেয়ে বড় জিনিস, ভারতের জনগণ শিখেছে কী করে কোনও অস্ত্র ছাড়াই একটি শক্তিশালী শত্রুর ওপর আঘাত হানা যায়, এবং মহাত্মাজির নেতৃত্বে দেখিয়ে দিয়েছে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অস্ত্রের সাহায্যে প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়। এক কথায়, ভারতের এখন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন আছে যা সুদূর গ্রামেও পৌঁছে গেছে, যা দিয়ে একটি জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করা যায় এবং যার সাহায্যে পরবর্তীকালে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়।

তবে গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের তরুণতর প্রজন্ম বুঝেছে যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিদেশি প্রশাসনকে অচল অথবা পঙ্গু করে দেওয়া হলেও দৈহিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তার পতন ঘটানো কিংবা তাকে বহিষ্কার করা যায় না। এই অভিজ্ঞতার প্রেরণায় আজ দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে সক্রিয় সংগ্রামের দিকে যাচ্ছে। সেই কারণেই আজকে ব্রিটিশের জোরালো কাঁধ থেকে নামার জন্য আপনারা নিরস্ত্র ভারতীয়দের দ্বারা রেলপথ, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন যোগাযোগের ধ্বংসের কথা, পুলিশ-থানায়, ডাকঘরে এবং সরকারি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের কথা এবং আরও নানাভাবে শক্তি প্রয়োগের কথা শুনছেন ও পড়ছেন।

১৯২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত আমি সমস্ত আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। ওই সময়ের মধ্যে এগারো বার ব্রিটিশেরা আমাকে আটক করে রেখেছে, এবং তার মধ্যে অধিকাংশ সময়েই আদালতে কোনও বিচার ছাড়া। এই অভিজ্ঞতা থেকে এবং ভারতে বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে আমি যা খবর পেয়েছি, কোনও অতিশয়োক্তি ছাড়াই আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, এবার যে আন্দোলন হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তা দমন করা অসম্ভব। আমার এই আশাবাদের কারণ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও আছে। অভ্যন্তরীণ যে যে কারণ তার মধ্যে আমি বলতে পারি, আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এই সর্বভারতীয় সংগ্রামে দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও যোগ দিয়েছেন, এবং এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে সক্রিয় সংগ্রামে পরিবর্তিত হয়েছে। বাইরের কারণসমূহের মধ্যে বলা যায়, এইবার ভারত একাকী যুদ্ধ করছে না। ত্রি-শক্তি এবং তাদের সঙ্গীরাও অভিন্ন শত্রুর সঙ্গে আমাদের অভিন্ন যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছে। এমনকী ভারতের সাধারণ মানুষ অবশ্যই বুঝতে পেরেছে যে ভারতের কাছে মুক্তিলাভের এমন এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, যা ইতিহাসে কদাচিৎ আসে। এবং সবচেয়ে যা বড় জিনিস তা হল ভারতে এইরকম একটি ব্যাপক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই যুদ্ধ শেষ হবে একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় এবং ভেঙে পড়ার মধ্যে।

ভারতে আমরা বরাবরই দুঃখবোধ করেছি, বিগত যুদ্ধের সময়ে, তখনকার নেতারা

আমাদের ভালর জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেননি। সেইজন্যই আমাকে এ বার ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবার জন্য এবং আমাদের পুরনো শত্রু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে, ত্রি-শক্তির যে যুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সঙ্গে তাকে যুক্ত করার জন্য। যদিও ভারতবাসীদের, তাদের স্বাধীনতা জয় করে নেবার জন্য, প্রধানত তাদের নিজেদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। যা-কিছু ব্রিটেনকে দুর্বল করবে, এমনিতেই তা ত্রি-শক্তিকে সহায়তা করবে এবং অদৃষ্ট ও ইতিহাস তাদের যে সহায়তা দিচ্ছে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করা তাদের পক্ষে মূর্খতা হবে। বিদেশে আমার কার্যকলাপের বিষয়ে আমি বলতে পারি ভারতের বাইরে যা করছি, তার পিছনে আমার দেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার যে অভিন্ন লক্ষ্য, তার জন্য দেশে যাঁরা সংগ্রাম করছেন এবং যাঁরা বিদেশে সংগ্রাম করছেন, তাঁদের মধ্যে এখন পরিপূর্ণ সহমত বিদ্যমান।

তবে আমার এমন ধারণা সৃষ্টি করা উচিত নয় যে, দেশে আমরা যতটা করতে পেরেছি, তাতে আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট। এইটুকুই আমাদের সন্তোষের কারণ যে, আন্দোলন এখন গতি পেয়েছে এবং সক্রিয় প্রতিরোধের আকার নিয়েছে এবং এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষে তাকে দমন করা সম্ভব হবে না। আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে তার দুটি লক্ষ্য, ভারতের প্রশাসনকে বাধা দেওয়া এবং সে-দেশে সামরিক বস্তুসমূহের উৎপাদন ধ্বংস করা। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। তার মানে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব। সে কাজ কী করে সম্পন্ন হবে, এবং সেই বিপ্লব সফল করবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বাইরে থেকে কী করে আনা যাবে, সেই সমস্যাটারই এখন সমাধান করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের স্থির বিশ্বাস, এই বছর, ১৯৪৩-এই ভারতকে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করতে হবে আমরা যাতে জয়যুক্ত হই। মিত্রশক্তিগুলি সম্ভবত এই বছরের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং সেইজন্যই নববর্ষের দিন থেকে তারা এক ভয়ংকর প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে। লন্ডন কিংবা নিউ ইয়র্ক এখন যা বলছে তা শুনলে মনে হয় ইঙ্গ-মার্কিনরা এর মধ্যেই যুদ্ধ জিতে ফেলেছে। কিন্তু এখন আর মিথ্যা বাগাড়ম্বর এবং হামবড়াই দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। ইঙ্গ-মার্কিনরা আবার এক রক্ত হিম-করা নিষ্ঠুরতার প্রচার চালাচ্ছে ত্রি-শক্তির বিরুদ্ধে, গত যুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে ঠিক যা করেছিল। কিন্তু সেটা যে কত মিথ্যা, দ্বিতীয় বার করতে গেলে তা সহজেই ধরা পড়ে যাবে। ইঙ্গ-মার্কিনরা যে নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ওই রকম পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের অবস্থা বাস্তবিক কেমন। যে কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখতে পারবে, সে একটাই সিদ্ধান্তে আসতে পারবে যে এই যুদ্ধে ত্রি-শক্তিরই জয় হবে।

এই যুদ্ধ শুধু ভারতকেই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ অন্য জাতিকেও এক অনন্যসাধারণ সুযোগ দিচ্ছে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার। আনন্দের বিষয়, ইরানের এবং সমগ্র আরব দুনিয়ার মানুষও স্বাধীনতা লাভের এই সুযোগের ব্যবহার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আরব জগতের নেতা মহামান্য গ্র্যান্ড মুফতি এবং ইরাকের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী রশিদ আলি এল গিলানি যে এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে বাইরে আছেন সেটা বিশেষ আনন্দের এবং আশার বিষয়,— শুধু আরব দুনিয়ার পক্ষে নয়, সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষেও।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা ভারতবাসীরা নিশ্চিত, অদূর ভবিষ্যতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করব। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, শুধু আমাদের নিজেদের জন্য নয়, মানবজাতির জন্য, কারণ সমগ্র মানবজাতির আমরা এক-পঞ্চমাংশ। স্বাধীন ভারত বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় প্রভূত দান করতে পারে। স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান করতে পারে, যে সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির এক বৃহৎ অংশের দাসত্ব, দারিদ্র্য ও শোষণের জন্য দায়ী। স্বাধীন ভারত সেইসব যুদ্ধের অবসান করতে পারে, অতীতে যে সব যুদ্ধ ইউরোপে এবং অন্যত্র ঘটেছে, ভারতের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বাধীন ভারতের অর্থ নিকট, মধ্য এবং সুদূর প্রাচ্য যেখানে সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে কেননা তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবার জন্য তখন আর কেউ থাকবে না। এবং পরিশেষে (এরও গুরুত্ব কম নয়) স্বাধীন ভারত দায়ী হবে জগতের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।

আমার কোনও সন্দেহ নেই স্বাধীন ভারত একমাত্র গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত, সমগ্র বিশ্বের কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ হবে, তার সঙ্গে যে সব জাতি সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাদের প্রত্যেকের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। ভারতের মতো একটি দেশ, ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ যার জনসংখ্যা, তার শিল্পায়ন, সমগ্র শিল্পজগতের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে আমরা যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি, জানি, স্বাধীন ভারতে আমরা কী করব। সেই আমরা নতুন ভারত গড়ে তুলবার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করছি। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনে শুধু ভারত নয়, সমগ্র সভ্যজগৎ আগ্রহী হবে।

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ। পরিশেষে আমাদের সংগ্রামে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতি আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আপনারা প্রদর্শন করেছেন, জন্য তারা আমার দেশের নামে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দিক থেকে, আমরা আপনাদের নিশ্চয়তা জানাচ্ছি যে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতদিন না আমাদের সকলের যারা শত্রু তারা পরাভূত হয় এবং সকলের জয় হয়। এই সংগ্রাম যা ভারতের পক্ষে জীবন-মরণের লড়াই তার একটাই সমাপ্তি হতে পারে, আমাদের সকলের জয়।

ত্রি-শক্তি এবং তাদের সঙ্গীরা দীর্ঘজীবী হোক!
স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হোক!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাঁওতা এবং হামবড়াই করপোরেশন[১]

১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষভাগে/ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে প্রদত্ত ভাষণ[২]

বন্ধুগণ, যখন আমি এক অনন্যসাধারণ পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করে ভারত ত্যাগ করি, আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ— প্রথমত, বিশ্বে যা ঘটছে সে বিষয়ে সত্য নিজের চোখে দেখা এবং দ্বিতীয়ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনও সঙ্গী আছে কিনা দেখা। যতদিন আমি বিদেশে আছি, আমি যা দেখবার নিজের চোখে দেখেছি, যা শুনবার নিজের কানে শুনেছি। এই যুদ্ধে দুই পক্ষই যে প্রচার চালিয়েছে, আমি খুব নিবিড়ভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেছি। কাজেই আমি এখন যা ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক মতামতে পৌঁছেছি। বিশ্ব সম্পর্কিত ব্যাপারের এই দীর্ঘ শ্রমসাধ্য এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণের পর এমন বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই যে আমাকে কেউ প্রতারিত কিংবা বিভ্রান্ত করতে পারবে। আমি আরও বলতে চাই, দেশত্যাগের পর থেকে আমি যা করেছি, কিংবা ভবিষ্যতে যা করব, সে সবেরই একমাত্র উদ্দেশ্য আমার দেশের দ্রুত স্বাধীনতা প্রাপ্তি, এবং আমি কখনওই এমন কিছু করব না ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যা অনুমোদন করবেন না। তা ছাড়া, আমি বলতে পারি, চতুর, ধূর্ত ও অসৎ এবং মিথ্যাভাষণে পটু ব্রিটিশ সরকার যদি আমাকে প্রলুব্ধ ও দুর্নীতিগ্রস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, পৃথিবীর কোনও শক্তিই কোনও দিন সে-কাজ করতে পারবে না। আমার যাই ঘটুক আমার একমাত্র দায়িত্ব হবে ভারতের এবং একমাত্র ভারতের প্রতি।

ইউরোপে আসার পর থেকে আমি নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছি এবং সেই কারণে আমি বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে লন্ডনের বিবিসি অর্থাৎ Bluff and Bluster Corporation (ভাঁওতা ও হামবড়াই করপোরেশন) প্রতিদিন যে মিথ্যা প্রচার করে যাচ্ছে তার তুলনা করতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ব্রিটেন এই যুদ্ধে হারতে চলেছে এবং তার সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। আমরা সক্রিয়ভাবে ব্রিটেনের সহায়তা করি বা কঠোরভাবে নিরপেক্ষ থাকি, তাতে এই বিশাল সংঘর্ষের শেষ পরিণতির এক চুলও তফাত হবে না। সেই পরিস্থিতিতে এটা যে শুধু বিচক্ষণতার কাজ হবে, তাই নয়, ভারতের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্যও হবে একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। ভারতকে তার নিজের চেষ্টায় এবং নিজে ত্যাগ স্বীকার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়ায় সাহায্য

---

১. বিবিসি অর্থাৎ British Broadcasting Corporation কে নেতাজি The Bluff and Bluster Corporation এই নামে পরিচিত করেছেন— অনুবাদক

২. বার্লিন বেতারে (১ মার্চ, ১৯৪৩) প্রচারিত কিন্তু স্পষ্টত তাঁর ইউরোপ ত্যাগের (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩) আগে রেকর্ডভুক্ত।

করতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে জয়যুক্ত ভারত, যার সৃষ্টিকর্তা হবে ভারতবাসীরা।

বন্ধুগণ, এই সংকটে নিষ্ক্রিয় অথবা নিরপেক্ষ থাকা হবে আত্মহত্যার সামিল। আমরা যদি সে কাজ করি তা হলে হয় আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সত্ত্বেও পরের দাস হয়েই থাকব, নয়তো যুদ্ধে যারা জিতবে সেই ত্রি-শক্তির দয়ার দান হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করব। এই দুইয়ের কোনওটাই আমরা চাই না। অতএব ভারতবাসীদের তাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে হবে যুদ্ধ করে কিন্তু সে যুদ্ধে কিছু সহায়তা বাইরে থেকে দরকার হবে। স্বাধীনতার এই সংগ্রামে, যা গত ২০০ বছর ধরে চলেছে, আমি অত্যন্ত যত্নসহকারে তা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তার এমন একটি দৃষ্টান্তও আমি পাইনি যাতে কোনও রকমের বাইরের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনতা জয় করা হয়েছে। শত্রু যেখানে একটি শক্তিশালী বিশ্বসাম্রাজ্য, বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে আরও বেশি এবং যখন সেই শক্তিশালী সাম্রাজ্য, ব্রিটেন আরও কয়েকটি শক্তির সম্মিলিত সাহায্যের দ্বারা আরও বলশালী, মূর্খতার চূড়ান্ত হবে সেই সাহায্য কেউ দিতে চাইলে তা গ্রহণ না করা। ব্রিটেন যখন আমেরিকা, চিন, আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র থেকে ভারতে সামরিক সরঞ্জাম এবং সৈন্য আমদানি করছে, কোথাও থেকে আমরা সহায়তা গ্রহণ করলে তা নিয়ে আপত্তি করা তাদের মুখে শোভা পায় না। অবশ্য তার কোন সাহায্য প্রয়োজন সেটা ভারতকেই ঠিক করতে হবে এবং যত কম সাহায্যের প্রয়োজন হয় ভারতের পক্ষে ততই ভাল। আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি একমাত্র তাদের কাছ থেকেই যারা আমাদের বন্ধু ও সহযোগী। বর্তমান ক্ষেত্রে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের জন্য চেষ্টা করছে তারা আমাদের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করছে। তাই তারা আমাদের বন্ধু ও সহযোগী এবং যারা সেই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে তারা চেষ্টা করছে আমাদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করতে। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়াও, আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং হিটলার এবং সিনর মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে ত্রি-শক্তির তিন রাষ্ট্র ভারতের বাইরে আমাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু ও সহযোগী।

বন্ধুগণ, আমি জানি স্বামী সহজানন্দের মতো আমার বন্ধুরা ত্রি-শক্তির আন্তরিকতার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে ইতস্তত করতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ওই তিনটি রাষ্ট্র তাদের নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যতদিন না তার পতন হয় এবং নিঃসন্দেহে তারা তাই করবে। ব্রিটিশ শক্তি ধ্বংস হলে অনিবার্যভাবে ভারতকে তা ব্রিটিশের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে। তা ছাড়া সমগ্র বিশ্ব, ত্রি-শক্তি সমেত, লাভবান হবে যদি ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারতের অধীনতার অবসান নিয়ে দুঃখ করবে একমাত্র ব্রিটেন। *ভারতের এই সংকটের সময়ে শুধুমাত্র মতাদর্শগত কারণের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া সাংঘাতিক ভুল হবে। জার্মানি কিংবা ইতালি কিংবা জাপানের অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। সেসব ওই দেশগুলির অধিবাসীদের নিজস্ব ভাবনার বিষয়। কিন্তু একটি শিশুরও বোঝা উচিত, ওই ত্রি-শক্তির দেশগুলির অভ্যন্তরীণ নীতি যাই হোক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনাশ, যে ব্রিটিশ শক্তি ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় শত্রু। আমরা কি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি না, মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কেমন সহযোগিতা করছে? দেশে আমার বন্ধুদের বুঝবার সময় এসেছে,*

স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার। স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি একমাত্র ভারতবাসীদের নিজেদেরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত এবং বৈদেশিক নীতি হওয়া উচিত ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা। বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমি চাই ত্রি-শক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা এবং ভারতের জাতীয় ব্যাপারে ভারতের চূড়ান্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ। স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ আমি বরদাস্ত করব না। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে আমার মতামত আমি যখন দেশে ছিলাম, তখন যা ছিল তাই আছে, এবং কেউ যেন ভুল করে না ভাবেন, বৈদেশিক ক্ষেত্রে ত্রি-শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার অর্থ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের, এমনকী তাদের মতাদর্শের আধিপত্য মেনে নেবে।

বন্ধুগণ, আজ আমার কাজ ভারতের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দান। যখন সে কাজ সম্পূর্ণ হবে, ভারত স্বাধীন হবে, তখন আমার কাজ হবে, আমার দেশবাসীর কাছে বিবরণ পেশ করা এবং তারা কী ধরনের সরকার চান সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত তাঁদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া এবং মহাত্মা গান্ধীকে ১৯৪০-এর জুন মাসে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের সময়ে জেলে যাওয়ার আগে, যেমন বলেছিলাম, আমি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব ব্রিটিশ অধীনতাপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করার আমার লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার পর। আমাদের সকলের পক্ষে এক গভীর আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে ত্রি-শক্তির পূর্ণ কূটনৈতিক সমর্থন লাভ করে সুদূর প্রাচ্যে আমার স্বদেশবাসীগণ ব্যাংককে এক সমাবেশে সম্মিলিত হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমিকে দ্রুত স্বাধীন করবার পন্থা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। আমি যে কথা প্রায়ই বলে থাকি, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায় আরম্ভ হয়, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর ভারত থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা শীঘ্র যে পর্যায়ে পৌঁছব তখন ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনী স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ না করলে আমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। বন্ধুগণ, সেই শুভদিনের জন্য প্রস্তুত হোন, এবং একই সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের জন্য এবং যে পোড়া-মাটি নীতির দ্বারা ব্রিটিশেরা ভারত থেকে পলায়ন করবার আগে আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চায়, তা প্রতিরোধ করবার জন্যও প্রস্তুত হোন।

আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এমন টলমল করছে যে আমার স্থির বিশ্বাস, সঠিক নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া গেলে ভারতবাসীরা তাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে পারবে। মুক্তির আর দেরি নেই। এই যুদ্ধ চলাকালেই ভারত তার স্বাধীনতা জিতে নেবে এবং আবার আমি বলছি, ঠিক সময়ের ঘণ্টা যখন বাজবে, শেষ সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তখন আমি আপনাদের পাশে উপস্থিত থাকব। যে-শক্তি ভারত থেকে আমার বেরিয়ে আসা আটকাতে পারেনি, তারা আমার ভারতে প্রবেশও রোধ করতে পারবে না। ইতিমধ্যে, বন্ধুগণ, আমাদের কারারুদ্ধ কমরেডদের কাছে খবর পাঠান। তাঁরা যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন কারণ যখন তাঁরা সংগ্রামের খবর পাবেন, তাঁরাই প্রথম তাকে স্বাগত জানাবেন এবং তখন আমরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম এনে দেব, যার সাহায্যে তাঁরা হবেন ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক।

স্বদেশবাসীগণ ও বন্ধুগণ! আর কিছু বলবার আগে আমার নিজের পক্ষ থেকে ও যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। সর্বপ্রথমে আমরা আপনাদের জানাতে চাই, স্বাধীনতার জন্য ভারতের নির্ভীক লড়াই সারা বিশ্বে এক গভীর ছাপ ফেলেছে। বস্তুত ভারতে ব্রিটিশ সংগ্রাম ও নৃশংসতার

কাহিনি লোকে প্রথমে বিশ্বাস করেনি এবং ইংল্যান্ডের নেতৃবৃন্দ নিরস্ত্র নারী ও পুরুষের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণের সাফাই দেওয়ার জন্য বক্তৃতা করতে বাধ্য হন। ওইসব বক্তৃতা শুনে লোকের বিশ্বাস হয়, ভারতে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং যেসব খবর আসছিল সব সঠিক, আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই। ভারতের অভ্যন্তরে ঘটনার বিবরণ নিয়মিত পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে যাচ্ছে। এখন আর ব্রিটেন ভারতকে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমিও লক্ষ করেছি এক-একটা দিন যায় আর অধিক থেকে অধিকতর সহানুভূতি এমনকী সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মহল থেকেও ভারতের দিকে আসে। সারা বিশ্বে আজ ভারত দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ থেকে ভারত শুধু সহানুভূতিই নয়, তার স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কোনও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারে। ভারতবাসীদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিদেশ থেকে কোনও সাহায্য তার দরকার আছে কিনা। দরকার থাকলে সেটা কতটা। বন্ধুগণ আপনাদের আমার আরও বলা দরকার, ইউরোপ, আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্যে আপনাদের স্বদেশবাসীরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন যে ব্রিটিশদের জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ ভারত পেয়েছে। স্বাধীনতা দিবসে জার্মানিতে ভারতীয়রা দেশে যে সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্য ঘোষণা করেছেন এবং সেই সংগ্রামকে সহায়তা ও সমর্থন দানের জন্য যথাসাধ্য করছেন। আরও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাদের জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে যোগদান করবেন।

ভারতের কথা বলতে গেলে, ঘটনা পরবর্তী মোড় নেবে অবিলম্বে এবং সেই সময় এলে এবং জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায় শুরু হলে ভারতকে শেষ আঘাত হানতে হবে। সেই অন্তিম আঘাত যা হানতে হবে ভারতকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে হবে মরণ আঘাত এবং সেই কারণে ভারতই সেই শয়তানের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর বিশেষ অধিকারের গৌরব লাভ করবে। বন্ধুগণ, বিদেশ বাসের কালে আমি নিজে যা দেখেছি, যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে আমি নিশ্চিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবে এবং সেই সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে স্বাধীন ভারত। অতএব আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি, ভয়, সন্দেহ, দ্বিধা ত্যাগ করুন, আপনাদের সাধ্যমতো জাতীয় সংগ্রামে সহায়তা করুন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে যাঁরা যুদ্ধ করবে, তাদের সর্বনাশ হবে। একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সময় এখন ব্রিটেন এবং তার সহযোগীদের বিপক্ষে, ভারতের পক্ষে। কাজেই আমাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে যে কোনও মূল্যে, সর্বপ্রকারে। আমাদের মনস্থির করতেই হবে, অন্তত আরও দু'বছর আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব এবং সংগ্রামে আমরা ১০০০০০ জীবন উৎসর্গ করব আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য। আপনারা যদি তা করতে পারেন, আমি যদি তা করতে পারি, আমি আপনাদেরকে সাফল্য ও স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিচ্ছি।

আবার আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিই, যে অহিংস গেরিলা যুদ্ধ আপনারা এখন করছেন তার দ্বিবিধ লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথমত, ভারতে অসামরিক প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ভারতে সামরিক উৎপাদন ধ্বংস করা। আমি আপনাদের আরও বলতে চাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার তীব্রতর করবার সময় এসেছে। এই কাজ সবচেয়ে ভাল করে করা যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের দলের সদস্যদের প্রচুর সংখ্যায় পাঠিয়ে। জাতীয় সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বন্ধুগণ, এর মধ্যে আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করে থাকবেন, ভবিষ্যতে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গদেশকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বঙ্গদেশে আমার সব ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ যেন সেই প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত থাকেন। আমি আবার সিংহলে আমার ভগ্নী এবং ভ্রাতাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের সকলের স্বাধীনতা জয় করে নেবার জন্য এগিয়ে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা আরম্ভ করুন। এ এক সুবর্ণ সুযোগ, শুধু ভারতের জন্য নয়, সিংহলের জন্যও। ভারত যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করবার একটি বিশাল যুদ্ধে রত, সিংহলের কাজ এখন আগেকার চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। যেমন ভারতের জন্য, তেমনি সিংহলের জন্যও মূলমন্ত্র এখন হওয়া উচিত, 'Now or Never'. সিংহল স্বাধীনতা আশা করতে পারে একমাত্র যদি সে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে।

বন্ধুগণ, ইঙ্গ-মার্কিনদের জন্য যারা প্রচার করছে তাদের ভণ্ডামি এবং প্রতারণার দ্বারা বিপথচালিত হবেন না। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে নিজেরাই তাকিয়ে দেখুন। তা হলেই আপনারা পরিস্থিতি বুঝতে পারবেন। আফ্রিকা বাদে পৃথিবীর কোথাও মিত্রশক্তি বলবার মতো কোনও সাফল্য পায়নি এবং আফ্রিকাতেও মিত্রশক্তিরা তা করতে পারেনি যা তারা পৃথিবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জেনারেল আইসেনহাওয়ার এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে লেফট রাইট করছেন এবং উত্তর আফ্রিকায় কখনও কখনও পশ্চাদপসরণ করছেন। পরাজয়ের লজ্জা ঢাকবার জন্য তারা বলছে, যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এখন রাশিয়া, আফ্রিকা নয়। ইউরোপে ব্রিটেনের শক্তি এবং প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। রাশিয়াতে প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার বোঝা যায় দুই সৈন্যবাহিনীর পারস্পরিক অবস্থানের দিকে তাকালেই। সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিনরা সাংঘাতিকভাবে হেরে গেছে এবং জাপানিবাহিনী এখন ভারতের পূর্বসীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। জাপানি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো বারে বারে ঘোষণা করে বিশ্বকে এবং ভারতবাসীদের জানিয়ে দেন এশিয়াতে জাপানের নীতি কী এবং ভারত সম্পর্কে জাপানের নীতি প্রকৃতপক্ষে কী। এই যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হবে আফ্রিকায় নয়, এশিয়া এবং ইউরোপে এবং যে কেউ নিজেই দেখতে পাচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিনদের অবস্থা এখন কী, তাদের অবস্থা মরিয়া। যতই চিৎকার করুক আর বাগাড়ম্বর করুক, তাতে তারা বাঁচবে না।

বন্ধুগণ, পরিশেষে আমি আপনাদের বলছি, ইতিমধ্যে এই সংকটকালে যতদূর পারেন পরিশ্রম করুন, জয় নিশ্চিত। সময় আমাদের অনুকূল। বিদেশে আমাদের সহযোগীরা সবাই আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আর আমরা কী চাইতে পারি? আমাদের শুধু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, তার জন্য আমাদের যতই ত্যাগ স্বীকার করতে হোক, নিশ্চিন্ত থাকুন, ভারত স্বাধীন হবে এবং অনতিবিলম্বে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পতন হোক। স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হোক। বিপ্লব জিন্দাবাদ!

৩৮

অমৃতসরের রক্তস্নানের চব্বিশতম বার্ষিকী

ভাষণ: জানুয়ারির শেষভাগ, ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভ ১৯৪৩[১]

দেশবাসীগণ,

গত বছর জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে আমি আপনাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার পরে দ্রুত অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। পূর্ব এশিয়াতে সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, ভারতের চেহারা একদম বদলে গেছে। ব্রিটিশের অধীনতা থেকে ব্রহ্মদেশের মুক্তিলাভ ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন উৎসাহ জুগিয়েছে এবং মিশর থেকে একদম ভারত পর্যন্ত ব্রিটেনের শাসনাধীন সব মানুষের আত্মবিশ্বাস আরও জোরালো হয়েছে। ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক চিন্তার আন্তরিকতা সম্পর্কে মোহ ভেঙে যাওয়ার ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের পেছনে উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই আন্দোলন যাকে মহাত্মা গান্ধী খোলাখুলি বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন, গত আট মাস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই আন্দোলন এমন আকার ধারণ করেছে যে বিদেশিদের সরকার ভারতে সন্ত্রাসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু আগুন এত দূর ছড়িয়েছে, ব্রিটিশ অত্যাচারীদের চূড়ান্ত নৃশংস ও বর্বরোচিত নির্যাতন সে আগুনের শিখা নেভাতে পারেনি। মেশিনগান, আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ, কাঁদানে গ্যাস, বেয়নেট আক্রমণ, মৃত্যুদণ্ড— এর কিছুই ভারতের নিরস্ত্র জনগণকে দমাতে পারেনি।

অমৃতসর গণহত্যার মতো ঘটনা গত আট মাসে এতবার ঘটেছে যে চব্বিশ বছর আগেকার সেই ঘটনাকে ভারতের মাটিতে এখন আর ওরকম নৃশংসতার একটি মাত্র উদাহরণ বলা যায় না।

তবুও, অমৃতসর গণহত্যা ভারতে ব্রিটিশের প্রদত্ত স্বাধীনতা, শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে থেকে গেছে। সেই রক্তাক্ত ঘটনা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভণ্ডামিকে অনাবৃত করে দিয়েছে। ব্রিটেন গত যুদ্ধে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার জন্য, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য এবং পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ বানাবার কারণে লড়াই করবার ভান করেছিল। ভারত ব্রিটেনের বড় বড় কথায় এবং যে স্বাধীনতার পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল তাতে বিশ্বাস করে সেই যুদ্ধে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। যুদ্ধের পরে আশা করেছিল অন্তত ডমিনিয়ন স্টেটাস পাবে। জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুর হত্যা মৌলিক মানবিক অধিকারের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ দাবির নৃশংস জবাব

---

১. নেতাজির অনুপস্থিতিতে Hotel Kaiserhof-এ পঠিত এবং ১৩ এপ্রিল ১৯৪৩ আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচারিত ও "আজাদ হিন্দ" পত্রিকায় (৩/৪/ ১৯৪৩) মুদ্রিত, কিন্তু স্পষ্টত তাঁর ইউরোপ ত্যাগের (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) আগে রেকর্ডভুক্ত।

ব্রিটিশের পক্ষ থেকে। এই ঘটনা ব্রিটেনের ওপর ভারতের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন এতে জোরদার হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের ছদ্ম গণতন্ত্রে বিশ্বাস আর থাকল না। ভারত আর তার অত্যাচারীর ফাঁদে পা দেবে না, এই মহাযুদ্ধে আর একই ভুল করবে না।

কাজেই বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটেনের কথা ও কাজের প্রতি চূড়ান্ত প্রতিকূল মনোভাব গ্রহণ করল। ফরওয়ার্ড ব্লক খোলাখুলি বলল, ব্রিটেনের শত্রুরা ভারতের প্রকৃত বন্ধু। ইংল্যান্ডের দুঃসময় ভারতের সুযোগ এবং আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে। কংগ্রেস স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর অলীক প্রস্তাব খারিজ করল। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমান আন্দোলন আরম্ভ করা হল। এই আন্দোলন, আমাদের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম, গত ২৩ বছরের আইন অমান্য আন্দোলন থেকে অনেক বিষয়ে আলাদা। এই আন্দোলনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার মধ্যে আছে আমাদের চূড়ান্ত সাফল্যের নিশ্চয়তা। প্রথমত, ভারতীয়রা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আজ যত ঐক্যবদ্ধ, আগে কখনও তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে নিয়ে যেতে ব্রিটিশেরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয়ত, এই আন্দোলন তথাকথিত ব্রিটিশ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশীয় রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত যে তাদের জয় হবে, সে বিষয়ে ভারতবাসীরা নিশ্চিত। পঞ্চমত, আন্দোলন অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, যেখানেই সম্ভব মানুষ হিংসার এবং অস্ত্রের ব্যবহার করছে।

স্বদেশবাসিগণ ও স্বদেশে আমার বন্ধুগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা যে বীরত্ব এবং দৃঢ়সংকল্প দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি এই সুযোগে আপনাদের অভিনন্দিত করি। আপনাদের মনোভাব আপনাদেরকে বিশ্বের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এনে দিয়েছে। ভারতের ঘটনাবলি বিশ্বের চোখে ব্রিটিশদের ভণ্ডামি অনাবৃত করে দিয়েছে এবং কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই আজ ব্রিটেনের ভারত-বিরোধী প্রচার কিংবা তার উচ্চমার্গীয় কথাবার্তায় বিশ্বাস করে না। এইটাই যথেষ্ট উৎসাহজনক। এ ছাড়া আরও দুটি বিষয় আছে যাতে জয়লাভ সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়া উচিত। প্রথমত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে, অন্তিম বিনাশ থেকে বিশ্বের কোনও শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে ভারত একাকী নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনাশে ভারত যত আগ্রহী, ত্রি-শক্তিও ততই আগ্রহী। আমাদের রণকৌশল হওয়া উচিত, এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিনাশ ত্বরান্বিত করবার জন্য আমাদের যা করবার করা উচিত। ভারতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড। একবার সেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেলে, সাম্রাজ্য বলে আর কিছু থাকবে না। কোনও পর্যায়ে আপনারা যদি দেখেন ব্রিটিশ শক্তির ধ্বংস সাধনে আপনাদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, আপনারা যতটা প্রয়োজন মনে করবেন, ততটা সাহায্য ত্রি-শক্তির কাছ থেকে অবাধে চাইতে পারেন। কিন্তু শত্রুকে উত্ত্যক্ত করা, অবসন্ন করে দেওয়ার আসল কাজটি আপনাদেরই করতে হবে। কারণ আমরা যদি স্বাধীনতার যোগ্য হতে চাই, তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। যে স্বাধীনতা বিজয়ী শক্তিরা দান হিসাবে দেবে, আমরা কখনওই তাকে রক্ষা করতে পারব না। স্বাধীনতাকে যে মূল্য দিতেই হয়, তা হল শহিদের রক্ত। আমি আপনাদের বলে আসছি, ভারতের স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের সবরকমের কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যান্য সময়ে আমি বলেছি আপনাদেরকে স্বাধীনতার বেদীতে অন্তত এক লক্ষ প্রাণ বলি দেবার জন্য প্রস্তুত

থাকতে হবে। এবং আপনাদেরকে শক্তি সংরক্ষণ করতে হবে প্রায় দু'বছর ব্যাপী সংগ্রামের জন্য। বিদেশে আপনাদের স্বদেশবাসী ও সহযোগীরা যথাসময়ে আপনাদের সহায়তার জন্য মানুষের যা সাধ্য সবই করছেন। এ কল্পনা করা বোকামি, অস্ত্রবল ছাড়াই ব্রিটিশদের পরাজয় স্বীকার করানো যাবে। বর্তমান আন্দোলনের পরে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন হবে। বিদেশে আপনাদের স্বদেশবাসীরা সেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, যে সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ওপর মরণ আঘাত হানবে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, ঠিক মুহূর্তটি এলে আমাদের নৃশংস অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। ততদিন আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের পথ যে ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ে আপনাদের বিশ্বাস যেন অটল থাকে, আমাদের শতাব্দী-প্রাচীন অত্যাচারী যাদের প্রধান গুণ মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি, লোভ ও নৃশংসতা, তাদের সঙ্গে আপসের লেশমাত্র চিন্তা যেন না থাকে। বর্তমান সংগ্রাম শেষ সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্য উপক্রমণিকা এবং শেষোক্তের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে পূর্বোক্ত সংগ্রাম কত সুসম্পূর্ণ হয়, তার ওপর।

বর্তমান সংগ্রামে এই মুহূর্তের উদ্দেশ্য প্রথমত, অসামরিক প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সামরিক উৎপাদন অচল করে দেওয়া। এই কাজ আপনারা যত উত্তমরূপে সমাধা করবেন, আপনাদের জয় তত নিকটবর্তী হবে।

ভগিনী এবং ভ্রাতাগণ!

এই বছরের গোড়ায় আমি আপনাদের বলেছি, এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হবে এই বছর এবং এই যুদ্ধের মীমাংসা হবে ইউরোপ এবং এশিয়ায়। ব্রিটিশদের প্রচার সত্ত্বেও সময় নিশ্চিত ভাবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং তার শত্রুদের পক্ষে কাজ করছে। ইঙ্গ-মার্কিনরা এ পর্যন্ত ইউরোপে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে পারেনি। ব্রহ্মদেশকে আবার নিজেদের অধীনে আনবার জন্য মার্শাল ওয়াভেলের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ত্রি-শক্তি দিনের পর দিন ইঙ্গ-মার্কিনদের ওপর শেষ আঘাত হানার জন্য নিজেদের শক্তিকে সংহত করছে। ইঙ্গ-মার্কিন রণকৌশলের পরিকল্পনায় ভারতের স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার মস্ত বড় দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে অবস্থিত। সেটা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, জয় নিঃসন্দেহে আমাদেরই হবে এবং যে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তাতে ভারতের যা কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, তা হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়ার একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। স্বাধীন ভারত, যে বেরিয়ে আসবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের মধ্য থেকে, সে আবার তার দায়িত্ব, মানবজাতির শান্তি, সুখ ও প্রগতিতে অবদান জোগানো, পালন করবে। দেশে এবং বিদেশে স্বদেশবাসীগণ!

অমৃতসরের শহিদদের পুণ্য স্মৃতিতে আজ আমরা শপথ নিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার। আজ আমরা যেন ব্রিটিশ সন্ত্রাস ও বিশ্বাসভঙ্গের কথা পুনর্বার স্মরণ করি। আজ আমরা যেন ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য "করো অথবা মরো" এই শপথ গ্রহণ করি।

১৩ এপ্রিল সারা ভারতে গত তেইশ বছর ধরে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত জানি সেদিন শীঘ্রই আসবে যখন সেই দিনটিতে মুক্তি এবং জয়ের জন্য উৎসব করা হবে।

৬৬

বিপদের পথে

শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি পত্র
৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩[১]

পরমপূজনীয় মেজদাদা,

আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে, হয় তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি— যথাসময়ে এ সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে— যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করুক— সফল ও পূর্ণ করুক— ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে— মা, মেজবৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে দিবে।

ইতি
তোমার স্নেহের ভ্রাতা
সুভাষ

বার্লিন
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩

---

১. ইউরোপ থেকে এশিয়ায় সাবমেরিনে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুকে এই পত্র লেখেন। এই পত্র পেয়ে শরৎচন্দ্র বোস তাঁর পত্নী বিভাবতী এবং তিন সন্তান শিশির, রমা ও চিত্রাকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে ভিয়েনা যাত্রা করেন এবং সুভাষের পত্নী এমিলি ও কন্যা অনিতাকে বসু পরিবারে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

২. শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী বিভাবতী।

নির্দেশিকা

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ১০৯, ১১২, ১২৪, ১৩৮-১৪০
১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধ ২৪, ২৬, ২৭, ৩০

'অকালি দল' ১০৬
অকালি পার্টি ৩৭
অক্ষশক্তি ২০, ২১, ২৪-২৭, ২৯, ৩০, ৩২-৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৯১, ৯৫, ৯৬, ১০৮, ১২৫, ১৩৪, ১৩৫
অক্ষশক্তি-বিরোধী নীতি ৮৯, ৯০
অটোমান সাম্রাজ্য ২৭
অনিতা (বসু) ১৫২ট
অন্নপূর্ণাইয়া ৯০
অমরাবতী ৯৭
অমৃতসর ১৪৯
অমৃতসর গণহত্যা ১৪৯
অশোক ৫৫
অস্ট্রিয়া ৭৫, ১৪১
অস্ট্রেলিয়া ২৯, ৭৫, ১২১
অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য ২৭
অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ৬, ১০, ১১
অল ইন্ডিয়া ভিলেজ ইন্ডাসট্রিস অ্যাসোসিয়েশন ৮
অল ইন্ডিয়া স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশন ৮
অহরর পার্টি ৩৭
অহিংস গেরিলা যুদ্ধ ১০৬, ১০৮, ১৪৭
অহিংস প্রতিরোধ ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৯৩, ৯৪, ১৫০
অহিংসা ধর্ম ৬৭, ৯৫
অহিংসা মন্ত্র ৯৬

আইন অমান্য আন্দোলন ৫, ৮, ১৭, ৭৯, ৯১, ৯৩-৯৭, ১০০, ১৪৯, ১৫০
'আইরিশ ফ্রি স্টেট' ১৪০
আইসেনহাওয়ার ১২১, ১৪৮
আকবর শাহ ৩৭
আগ্রা ৯৭
"আঙ্কল স্যাম" ১৩১
আজাদ (স্বাধীন) মুসলিম লিগ ১০৬
'আজাদ হিন্দ' পত্রিকা ৫২, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৭৮, ৮৫, ৯৭, ১০৯, ১১৬, ১২৯, ১৩৬, ১৪৯
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৮১
আজাদ হিন্দ বেতার *দ্রষ্টব্য* আজাদ হিন্দ রেডিও
আজাদ হিন্দ রেডিও ৪৬, ৪৬ট, ৪৮ট, ৫৫, ৫৮ট, ৬১, ৬৩, ৮১, ৮৫, ৯৭, ১০৩, ১০৩ট, ১০৫, ১২৯, ১৪৯
আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ৭০, ৮৩, ৮৪
আটলান্টিক চার্টার ৯৪, ১০১, ১০২, ১০৮, ১২২, ১২৩, ১৩০, ১৩১, ১৩৭
আটলান্টিক মহাসাগর ১২৫, ১৩১
আড্ডা সাহেব ৩৬
আন্দামান ৩২
আফগানি ২৬
আফগানিস্তান ২০, ২১, ২৪-২৬, ৩৪, ৪১, ৪৪, ৭৫, ১৩৭
আফ্রিকা ২১, ২৯, ৬৫, ৮০, ৮৬, ৯৯, ১২৭, ১৩২, ১৪৫, ১৪৮
উত্তর ৩৩, ৩৪, ৭৬, ১২১, ১২৭, ১৩২, ১৩৪, ১৪৮
উত্তর-পশ্চিম ১২৫

দক্ষিণ ২৮, ২৯
পশ্চিম ৭৭
আবদুর রহমান ৯০
আমেদাবাদ ৯৭
আমেরিকা ৩২, ৪৪, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৯, ৯৪, ৯৯, ১০৪, ১২১, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭
উত্তর ২২
দক্ষিণ ২২
আয়ারল্যান্ড ২৮, ২৯, ৫০, ৫৬, ৬৪, ১১৩, ১৪০
উত্তর ১২১
(লর্ড) আরউইন ১৩০
আরব দেশ ৩৩, ৭৫, ১৪০, ১৪২
'আলস্টার' ১৪০

ইউ. পি ৯০
ইউনিয়ন জ্যাক ১২৩
ইউরোপ ২১, ২৪-২৯, ৭১, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৯, ১০৪, ১১২, ১১৬, ১১৮-১২০, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৪৪, ১৪৭-১৪৯, ১৫১, ১৫২ট
পশ্চিম ১২৭
ইংল্যান্ড ৮, ২০, ২১, ২৯, ৩০, ৪১-৪৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬৪, ৬৯, ৭৪, ৭৭, ৮৯, ৯৫, ১২১, ১৩২, ১৪৭, ১৫০, ১৫১
ইঙ্গ-ইরাক যুদ্ধ ৩৮
ইঙ্গ-ফরাসি জোট ২৭
ইঙ্গ-মার্কিন জোট ১২১, ১৩৪, ১৫১
ইঙ্গ-মার্কিন প্রচার ৯০, ৯২, ৯৮, ১২২, ১৪৮
ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১, ১৩২
ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্র ৯৩
ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক ১৩১
ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ৪৭, ৬১, ৬৯, ৭১, ৮৪, ১২৩, ১২৪, ১২৯
ইঙ্গ-মার্কিন সূত্র ১২৮
ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনী ৮৫, ৮৮, ১৪২, ১৪৬
ইতালি ২০, ২১, ৫৪, ৬০, ৭৩, ৮৭, ১১৫, ১২৯, ১৪৫
ইতালিয়ান সরকার ৭২
ইনডিপেন্ডেন্স লিগ ৫
ইন্ডিয়ান লিজন ৭৩, ৮১
ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ৯০
ইন্দো-জার্মান সোসাইটি ১১৬
ইপি-র ফকির ২৫
ইরাক ২৯, ৩৩-৩৫, ১৩৬, ১৪২
ইরান ১৪২
ইস্ট ইন্ডিয়া ৩২

(মি.) উইনস্টন চার্চিল ১৬, ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ১২০-১২২, ১২৪, ১৩০, ১৩১
(জেনারেল) উইন্টার ১২৫
(প্রেসিডেন্ট) উইলসন ৬৩, ৯৪, ১২১, ১২২
(মি.) উইলিয়াম ফিলিপস ১২২, ১২৩
উত্তম চাঁদ ৩৮
উত্তমাশা অন্তরীপ ৭৭
উন্মুক্ত দ্বার নীতি ১২৩
উপনিষদ ১১৭
উমিচাঁদ ৫১, ৫৩

এ. কুয়ারোনি ২৩
এইচ. ভি. কামাথ *দ্রষ্টব্য* হরিবিষ্ণু কামাথ
এম. এন. রায় ১১, ৬৭
(মি.) এমারি ৫৫, ১২০, ১২২
এমিলি (বসু) ১৫২ট
এল আলামেন ১০৮
এল.সি.সি ১২
এলগিন রোড ৩
এলাহাবাদ ৮৯, ৯৭
এশিয়া ২৮, ৪৭, ৪৮, ৬১, ৬২, ৭৯, ৮০, ১২৫, ১৩২, ১৩৮, ১৪৮, ১৫১, ১৫২ট

ওয়াকফ পার্টি ৩৩
ওয়ার্ধা ৯, ১১, ৯১, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১১৪
ওয়াল স্ট্রিট ১২৩
ওয়াশিংটন ৯২, ১০১, ১০৪, ১২১, ১২২
(জেনারেল) ওয়েভেল ৫০, ৬৪, ১৫১
ওয়েস্টমিনিস্টার ৫৪

কংগ্রেস *দ্রষ্টব্য* ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৬, ১১-১৩, ৯৫
কংগ্রেস কর্ম সমিতি *দ্রষ্টব্য* কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি
কংগ্রেস মন্ত্রীসভা (১৯৩৭ সালে) ৯
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ৬, ১১, ১২, ১৪
কংগ্রেস হাই কমান্ড ১৩
কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ৯১
কংগ্রেসের যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ৭
ককেশাস অঞ্চল ৪২
করাচি ৯৭
"করো অথবা মরো" ১৫১
কলকাতা ৩৬, ৩৭, ৯৭, ১৩৬
কলকাতা কংগ্রেস (১৯২৮) ৫
কলকাতা করপোরেশন ১০৬
কানপুর ৯৭
কানপুর কংগ্রেস (১৯২৫) ৫
কানাডা ২৯
কান্ট ১৩৮
কাবুল ২০, ২২, ২৫, ৩৬-৩৮
কাবুল তত্ত্ব ৪
কাবুল সেন্ট্রাল ২১
কামাথ ৯০
(লর্ড) কার্জন ১৩০
কালিকট ৯০
কিষান আন্দোলন ১০৮
কিষাণ সভা ১২, ১৩, ১৭
কুমারিকা অন্তরীপ ১৩৭
(মি.) কেপলার ৪১, ৪২, ৭৩
কেরালা ৯০

ক্রিপস ৫০, ৫১
ক্রীট ৫৩
ক্রেমলিন ১০৪
"ক্ষমতার রাজনীতি" ৯

'খালিস্তান' ১২৩

গর্ডন হাইল্যান্ডার ১২৩
গান্ধী আন্দোলন ৪-৬, ৮, ৯
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৫
গান্ধী সেবা সংঘ ৮
গান্ধীর বিদ্যালয় ১১৪
গান্ধীজি *দ্রষ্টব্য* মহাত্মা গান্ধী
গান্ধীবাদ ৫, ৬, ৯, ১০, ১৭
গান্ধীবাদী সংহতি ১০
গুরুকুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১১৪
গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশল ১০৬
গোমো ৩৮
গ্যেটে ১১৭, ১৩৮
গ্রিস ২১, ৩৩, ১৩৭
গ্রেট ব্রিটেন ৭, ১৬, ২১, ২৪, ২৫, ২৭-৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৮-৫০, ৫২-৫৪, ৫৬-৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩-৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮৩, ৮৫-৮৭, ৮৯-৯১, ৯৩-৯৫, ৯৯, ১০৩-১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১২৮-১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৪২-১৪৯
গ্র্যান্ড মুফতি ১৩৬, ১৪২
গ্র্যান্ড হোটেল, ভিয়েনা ৪০

চট্টগ্রাম ১২৪
চন্দ্রগুপ্ত ১৩৭
চিত্রা (বসু) ১৫২
চিন ৩২, ৪৪, ৬৪, ৬৯, ৮৬, ৯১, ১২১, ১২৩, ১৪৫
চিন-জাপান যুদ্ধ ৬৯
চিনা কমিউনিস্ট পার্টি ৪৪
চিয়াং-কাই-শেক ৪৪, ৬৫, ৬৯, ৭৫

চুংকিং ৯০, ৯২
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩০

(পণ্ডিত) জওহরলাল নেহরু ১১, ৭৪, ৭৬, ৮৯-৯১, ৯৫
"জন বুল" ১৩১
জমিয়ত উলিমা ৩৭
জমিয়ত-উল-উলেমা ১০৬
জয়পুর ৯৭
জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ ৬
জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি ১১৪
জাতীয় ফ্রন্ট ১১-১৪
জাতীয় যুদ্ধ মোর্চা ৭০
জাতীয় শোকদিবস ১৫১
জাতীয় সংহতি ১১২
জাতীয় সমাজতন্ত্র ১১৮
জাতীয় সেনাবাহিনী ১১১
জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৭
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১১২
জাপান ২০, ২১, ৩২, ৩৪, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৬০-৬২, ৬৮-৭০, ৭৪-৭৭, ৮৭, ৯১, ৯৫, ১১৮, ১২৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৮
জাপানি গভর্নমেন্ট ৭৯
জাপানি ডুবোজাহাজ ৭৭
জাপানি নৌবহর ৩২
জাপানি বৈদেশিক নীতি ৩২
জাপানি সশস্ত্র বাহিনী ৭৩, ৮৪, ১২৭
জামসেদপুর ২৯
জামিয়া মিলিয়া (জাতীয় মুসলিম) বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪
জার্মান গভর্নমেন্ট ২৪, ৩৩, ৪৩, ৭২, ৭৩, ১২৮, ১৩৬
জার্মান ডুবোজাহাজ ৭৭
জার্মান প্রচার ৩১
জার্মান বাহিনী ৪৪, ১৩৪
জার্মান বিদেশ দপ্তর ৪১, ৪১ট
জার্মান বিদেশ মন্ত্রণালয় ৪০
জার্মান ভাষা ১০৯, ১৩৬
জার্মান রাইখ ২৭
জার্মান সরকার *দ্রষ্টব্য* জার্মান গভর্নমেন্ট
জার্মান-ভারত সম্পর্ক ১১৭-১১৯
জার্মানি ১৬, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৩০, ৩২-৩৫, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৮ট, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৭১, ৭৩-৭৭, ৮৫, ৮৭, ১০৩ট, ১১৪, ১১৬-১১৯, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭
উত্তর ৪৮ট
জার্মানি এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ১১৭
জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস ৬৭, ১৪৯
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১২৪, ১৪৯
(মি.) জিন্না ১০৬, ১২৩
জেরুসালেম ১৩৬ট

টাকা ২৬
টাটা ইস্পাত কারখানা ২৯
টোকিও ৫৫, ১২৫, ১৩১

ডমিনিয়ন স্টেটাস ৫, ২০, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৭, ৮৯, ১৪৯
ডাউনিং স্ট্রিট ১০১
ডানকার্ক ৫০, ৫৩
'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ৫৬
ডোবামা ৩৭

ঢাকা ৯৭, ১২৪

তুরস্ক ৩৪, ৪৪, ১৪১
তেনালি ৯৭
(জেনারেল) তোজো ৫১, ৫৪, ৬১, ৬৯, ১৪৮
ত্রিদলীয় চুক্তি ৫১
ত্রিপুরী কংগ্রেস (১৯৩৯) ৭, ২১
ত্রি-শক্তি (জার্মানি-ইতালি-জাপান) ৬১, ৬২,

৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৭-৮৯, ৯১-৯৩, ৯৫, ১১৫, ১১৮, ১২২, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৪০-১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫০, ১৫১

দক্ষিণ ককেশাস ৭৫
দক্ষিণ ভারত ৩৬
দক্ষিণপন্থী সংহতি ১০
"দলিত জাতি" ১৩৯
দার্জিলিং ৩৭
দিল্লি ৫৯, ৬৬, ৯৭, ১১৪
'দ্বিতীয় রণাঙ্গণ' ১৩২, ১৩৩, ১৫১
(জেনারেল) দ্য গল ১২১

'ধীরে চলো' নীতি ১০০, ১০৭

নতুন সাম্রাজ্যবাদ ১০৪
নরওয়ে ৩০, ৫৩
নাওমি ভেটার ৪৫
নাগপুর ১১, ১৭, ৯৭
নাটাল ৭৭
নাৎসি ১৬, ৪১
নিউইয়র্ক ১০৪, ১৩২, ১৪২
নিউজিল্যান্ড ২৯, ১২১
নিকট প্রাচ্য ৩৪, ১৩৩, ১৪৩
নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ৮৯
নিরক্ষরতার সমস্যা ১১৩
নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো ৭৩
নেপাল ৩৭
নেপালি গোষ্ঠী ৩৭
ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট (নাৎসি) পার্টি ১৩৬

পঞ্জাব ৩৭
পঞ্জাবি মুসলিম ৩২
পঞ্জাবি শিখ ৩২
পঞ্জাবের মন্ত্রিসভা ৫৭
পল স্মিডট ৭৩, ৭৭
পাকিস্তান ৮৯, ১২৩, ১৪০
পাটনা ৯৭
'পাঠানিস্তান' ১২৩
পারস্য ৩৪, ৪২
পারস্য উপসাগর ৩৪, ৭৫
পুণে ৯৭
পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ১০৪
পুশতু ভাষা ৩৮
পূর্ণ স্বাধীনতা ৪৬, ৫৯, ৯৬
পূর্ব এশিয়া ৪৯, ৭৪, ৭৬, ১৪৯
পূর্ব প্রদেশ ১২৫
পেশোয়ার ৩৭, ৫৯
'পোড়া মাটির' নীতি ৫০, ৫৩, ৫৭, ৬৪, ৮৫, ৯১, ১৪৬
পোল্যান্ড ৩০
প্যারিস ৩৬
প্যালেস্টাইন ২৮, ২৯, ৩৩, ৫৬, ১১৩, ১৪০
প্রকৃত বামপন্থী ১৬
প্রজা পার্টি ১০৬
"প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ" ১০৯
প্রশান্ত মহাসাগর ১২৫, ১৩২
দক্ষিণ-পশ্চিম ১৩৪
প্রেসিডেন্সি জেল ৩২

ফরওয়ার্ড ব্লক ৪, ১০-১৯, ৩৭, ৫৬, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১০৮, ১৫০
ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির লেখ্যাগার ৭৩ট
ফ্যুরের ৭৪-৭৭
ফ্রান্স ২৭, ৩০, ৪৯, ৫২, ১৩৪

বঙ্গদেশ ১০৯, ১২৪-১২৬, ১৩৮, ১৪৮
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ১২, ১৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১২, ১৩
বয়কট আন্দোলন ১১৭, ১১৮
বরোদা ১০৮
বর্মা ৯১

বলশেভিক ৭৪
বল্কান উপদ্বীপ/ বলকান ৩৪, ৬৩
(সর্দার) বল্লভভাই পটেল ৯২
বাটাভিয়া ৫০, ৫৩
বাপাট ৯০
বামপন্থী মতবাদ ১৫
বামপন্থী সংহতি ১০
বাম সংহতি সমিতি ১১-১৩
বাম-সংহতি ১৬, ১৭
বার্লিন ২২, ২৪, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২, ৭৩, ৭৮, ৮৫, ১২০, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩৬ট, ১৫২
বার্লিন বেতার ৫২ট, ৬৭, ১৩৪ট, ১৩৬ট, ১৪৪
বাহাদুর শাহ ১১৩, ১৩৯
বিক্রমপুর ১০৩
বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ১৫
বিপিসিসি *দ্রষ্টব্য* বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বিবিসি ৮৬, ৯৫, ৯৯, ১০৩, ১০৭, ১২১, ১২৫, ১৩২, ১৩৩, ১৪৪
"বিভক্ত করে শাসন করো" নীতি ৫৪, ৫৫
বিভাবতী বসু ১৫২ট
বিহার ৩ট, ১০৮
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪
বেনেস সিকোসি ৩০
বেরার ১২
বেলজিয়াম ৩০
বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ ১৪০
বোম্বাই ১১, ৩৬, ৩৭, ৯১, ৯৪, ৯৭, ৯৮
বৌদ্ধ দর্শন ১১৭
ব্যাংকক ৭৭, ৮৩, ৮৩ট, ১৪৬
ব্যাবিলন ১৩৭
ব্রহ্মদেশ ৩৭, ৪৪, ৪৯, ১২৪, ১২৫, ১৪০, ১৪৯, ১৫১
(কর্নেল) ব্রিটন ৯৯, ১০৭
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ২৬, ৩২, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০৫, ১০৭, ১৩২, ১৩৩
ব্রিটিশ কূটনীতি ৩০
ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক দল ৮৯, ১০২
ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ২৬, ২৯-৩২, ৪৪, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭০, ৮৫, ৮৬, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১০৫, ১১৩, ১১৫, ১২০, ১২২, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪১, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৯
ব্রিটিশ নৌবহর ৩২
ব্রিটিশ বাহিনী ২২, ৭৫, ৮৬
ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন ৯৪, ৯৫
ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ১০২
ব্রিটিশ শক্তি ৭৬
ব্রিটিশ শ্রমিক দল ৫৮, ৫৯, ৮৯, ১০২
ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ৫৫, ৫৭, ৫৯, ১১৮
ব্রিটিশ সরকার ৬-৮, ২৬, ৫৫-৫৭, ৬৭, ৭৯, ১০০, ১১০
ব্রিটিশ সামগ্রীর অর্থনৈতিক বর্জন ১৪০
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ২৪, ২৬-২৯, ৩৪, ৪৩, ৪৬, ৪৮-৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ৯৭, ১০০-১০২, ১০৪-১০৬, ১০৮, ১১৭, ১১৮, ১২১-১২৫, ১২৯-১৩৫, ১৪০-১৪২, ১৪৪, ১৪৫-১৪৭, ১৫০, ১৫১
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৩৬, ৩৯, ৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৯৮-১০১, ১০৩-১০৫, ১০৮, ১১৮, ১২৩, ১২৫, ১৩০, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০
ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ১০৫
ব্রিটেন *দ্রষ্টব্য* গ্রেট ব্রিটেন
'ব্লিজক্রিগ' কাল ৮
ভগতরাম তলওয়ার ৪
ভন রিবেনট্রপ ৪৩, ৭১, ১২৭
ভবিষ্যতের ভারত রাষ্ট্র ১১১
ভারত ৮, ২০-৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৪,

৪৬-৫১, ৫৩-৫৫, ৫৭, ৫৯-৬২, ৬৪-৬৬, ৬৮-৭০, ৭৩-৮১, ৮৩-৯১, ৯৩-৯৯, ১০১-১০৬, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৫-১২৮, ১৩৩, ১৩৬-১৪০, ১৪২-১৫১
জাতীয় পতাকা ১৩৬
ভারত ছাড়ো আন্দোলন ৯৭
ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো ১০৫
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৪, ৫, ৯, ১০, ১২, ১৪-১৮, ২১, ৩০, ৪৬, ৪৮, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৭, ৮৯-৯৩, ৯৭, ১০৯, ১১২, ১১৪, ১১৮, ১৩৬ট, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০
ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম ৬৯, ১০৯, ১৩৬, ১৪১, ১৪৭
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ১০৪, ১০৬, ১৪০
ভারতীয় বিধান পরিষদ ৫৬
ভারতীয় বিধানসভা ৫৬
ভারতীয় সংস্কৃতি ১১৭
ভারতে ব্রিটিশনীতি ২৯
ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ২৫
ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৩৫, ১৪৬
ভার্সাই-উত্তর যুগ ১১২
ভার্সাইয়ের চুক্তি ২৭, ৫১, ৫৪, ১১৮
ভি. ডি. ত্রিপাঠী ৯০
(মহারানি) ভিক্টোরিয়া ৯৮
ভিয়েনা ৪০, ৪৫, ১১৯, ১৫২ট
ভূমধ্যসাগর ৪৪, ১২৫, ১৩৪
(প্রেসিডেন্ট) ভেটার ৪৫
ভেনিস ৪০

মইন আকবর শাহ ৯০
মজলিশ-ই-অহরর ১০৬
মধ্য ভারত ৩৬
মধ্যপ্রদেশ ১২, ১০৮
মধ্যপ্রাচ্য ২২, ৩৪, ১৩৪, ১৪২
মসুলিপট্টম ৯৭
মস্কো ১০৪
মহাত্মা গান্ধী ৫-৮, ১৫, ১৭, ১৮, ৪৪, ৬৭, ৭৬, ৮৫, ৮৮-৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ১০৮-১১০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৯
মহারাষ্ট্র ৯০
মহীশূর ২৯, ১০৮
মাদুরা ৯৭
মাদ্রাজ ৯৭
মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) ৭
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ৯০
মার্ক ২৬
মার্কিন গভর্নমেন্ট ১২১, ১২৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৯, ১২০-১২৫, ১৩০-১৩২
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১০২, ১৩০
মালয় ৯১
মিউনিক চুক্তি ৬, ৭
মিত্রশক্তি ২৭, ৩০, ৪৬, ৫২, ৬৩, ৬৫, ৯১-৯৫, ১০৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪২
(লর্ড) মিন্টো ১৩৯
মিল ১৩৮
মিশর ২৯, ৩৩, ৩৪, ৭৫, ৯৪, ১০৮, ১২১, ১৩৭, ১৪৯
মীরজাফর ৫১, ৫৩
মুফতি খিফায়াত উল্লাহ ১০৬
মুসলিম লিগ ৫৭, ৮৯, ১০৬, ১২৩
মুসোলিনি ৭৯, ৮৭, ১৪৫
মেকি বামপন্থী ১৬
মেদিনীপুর ১২৪
মোরাদাবাদ ৯৭
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৩৬, ৯০, ৯২, ১১২, ১৪০
(জেনারেল) ম্যাকআর্থার ৬৪
ম্যাক্স মুলার ১১৭, ১৩৮
ম্যাডাগাস্কার ১৩২
'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' ৫৬

যুগোশ্লাভিয়া ৩৩

রবার্ট ক্লাইভ ১২৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৮

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় ১১৪
রমা (বসু) ১৫২ট
রশিদ আলি গিলানি ১৩৬, ১৪২
রাওয়ালপিন্ডি ৯৭
রাজতন্ত্র ৫৮
'রাজস্থান' ১২৩
(বাবু) রাজেন্দ্র প্রসাদ ১১
রামগড় ১৩, ১৮
রামনাথ ১০৩
রামনাদ ৯৭
রাশিয়া *দ্রষ্টব্য* সোভিয়েত ইউনিয়ন
রাসবিহারী বসু ৮৩
রি-ইউনিয়ন দ্বীপ ১৩২
(লর্ড) রিপন ১৩০
রুইকর ৯০
(প্রেসিডেন্ট) রুজভেল্ট ৪৪, ৯৪, ১০৪, ১২১, ১৩১
রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) ৬১
রুশ-জার্মান চুক্তি ৪১
রুশ-জার্মান যুদ্ধ ৪১, ৪১ট, ৪২
রেঙ্গুন ৪৯, ৫২, ৬১
রোম ২২, ৩৮, ৪১ট, ১২৫, ১২৭, ১৩১
রোমান লিপি ১১৪
রোমেল ৭৫, ১২৭
র‍্যাডিক্যাল পার্টি *দ্রষ্টব্য* র‍্যাডিক্যাল লিগ
র‍্যাডিক্যাল লিগ ১১, ১৪
(মি.) র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ৫৮

লক ১৩৮
লক্ষ্ণৌ ১১, ১২, ৯৭, ১০৩
লন্ডন ২০, ৩০, ৪১, ৪৪, ৫৬, ৫৯, ১০৪, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪
লাল কেল্লা ৮১
লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯) ৫, ৬
(ভাইসরয় লর্ড) লিনলিথগো ৫৯, ১২২, ১২৩
লিবিয়া ৩৪, ৪৯, ৫২, ৫৩, ১২৭
লুই জনসন ৬৪, ৬৫
লেফ্ট-কনসোলিডেশন কমিটি ১১

শকুন্তলা ১১৭
শরৎচন্দ্র বসু ৪, ৩৬, ৩৭, ৯০, ১৫২, ১৫২ট
শান্তিনিকেতন ১১৪
শার্দূল সিং কবিশের ৩৭, ৯০
শিশিরকুমার বসু ৩ট, ৪, ১৫২ট
শোপেনহাওয়ার ১১৭, ১৩৮
শ্লেগেল ১১৭, ১৩৮

সংবিধানবাদ ৯, ১৫, ১৭
সত্যাগ্রহ ৫, ৮, ১৭
সদিচ্ছা মিশন ৬৯
সন্ত্রাসবাদ ২২
সমাজতন্ত্র ১৪, ১৫
সমাজতন্ত্রবাদ ১৫
(মি.) সাভারকার ১০৬
সাময়িক জাতীয় সরকার ৫৬
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট ১৪
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন ১১
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ৩৩
সারা ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলন ১৩, ১৪, ১৮
সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি ৯১, ৯৩
সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ৯৩, ৯৪
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৯০
(দেশবন্ধু) সি আর দাশ ৯৩
সিংহল ৫৭, ১৪০, ১৪৮
সিঙ্গাপুর ৩২, ৪৯, ৫২, ৬১, ৯১
সিঙ্গাপুরের পতন ৪৬, ৪৮, ৪৯
সিপাহী বিদ্রোহ ১০৯, ১৩৮
সিরিয়া ৩৪
সীমান্তপ্রদেশ ৯০
সুয়েজ খাল ৩৪, ৪৯, ৫২

সুয়েজ প্রণালী *দ্রষ্টব্য* সুয়েজ খাল
সেকেন্দ্রাবাদ ৯৭
সোধি ৩৮
সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৬, ৩২-৩৪, ৪১-৪৩, ৬৪, ৭৪, ৭৭, ৮৭, ১২৫, ১৩২, ১৩৪, ১৪৫
সোভিয়েত রাশিয়া *দ্রষ্টব্য* সোভিয়েত ইউনিয়ন
সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকান ৪৪
সোভিয়েত-ব্রিটিশ-আমেরিকান প্রচার ৪৩
স্কটল্যান্ড ১২৩
(স্যার) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ৫৪-৫৮, ৬৩-৬৫, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৮৮-৯১, ১২০, ১২৭, ১৩০, ১৪৬, ১৫০
স্পেনসর ১৩৮
স্বদেশি আন্দোলন ১১৭, ১১৮
স্বরাজ ১০৮
স্বরাজ্য পার্টি ৫
স্বর্ণ-মান ১১৪
স্বাধীন উপজাতীয় অঞ্চল ২৫
স্বাধীন-ভারত আন্দোলন ৩৬
"স্বাধীন ভারত কেন্দ্র" ৪২
স্বাধীন ভারত বেতার-কেন্দ্র ২৫
স্বাধীন ভারত সরকার ২৪-২৬
স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য ১৪৬
স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি ১৪৬
'স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় কমিটি' ১৩৬
স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি ১৪৬
স্বামী সহজানন্দ ৮৭, ১০৮, ১৪৫
স্লোভাকিয়া ১২৯

হংকং ৪৯, ৫২, ৫৩
'হরিজন' ৯৫
হরিজন সেবক সঙ্ঘ ৮
হরিদ্বার ১১৪
হরিপুরা কংগ্রেস (১৯৩৮) ৬, ১৪
হরিবিষ্ণু কামাথ ৩
হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ ১৩
হাউস অব কমন্স ১২৭
হামবুর্গ ১১৬, ১১৮, ১১৯
হায়দ্রাবাদ ১০৮
হিউম ১৩৮
হিটলার ৭৩, ৭৩ট, ৭৭, ৭৯, ৮৭, ১৪৫
হিন্দু প্রচার সমিতি ৮
হিন্দুস্তানি ভাষা ১১২
'হিন্দুস্থান' ১২৩, ১৩৩
হুবলি ১২৪
হেগেল ১৩৮
হোয়াইট হল ৬৫, ১২৪
হোয়াইট হাউস ৬৫, ৭০, ১০১, ১২১-১২৩, ১৩১

(Mr.) Alberto Quaroni ২০, ৩৬
Andreas Hillgrueber ৭৩ট
B. Z. am Mittag ৩৫
Berlin-Charlottenburg ৭১
Bernard ৭৩ট
Bluff and Bluster Corporation of London ৮৬, ১৪৪
British Broadcasting Corporation ৮৬, ১৪৪
Count Ciano ৪০
"Crewe House" ১২৩
(Admiral) Darlan ১২১
Deussen ১১৭, ১৩৮
Deutsch-Indische Gesellschaft ১১৬, ১১৯
Divide and Rule নীতি ৫১
"Figures" ১২৩
Frankfurt ৭৩ট
General Charteris ১২৩
German News Bureau ৭৩
Graefe fuer Weh rwesen ৭৩ট
Hegel ১৩৮
Herr Brugermeister ১১৬, ১১৯

Herr Woermann ৪১, ৪২
Hewel ৭৩
Hotel Kaiserhof ১৪৯
Kant ১৩৮
Konaorzialrat Otto Faltis ৪০
Max Muller ১১৭, ১৩৮
"Mazzota" ৩৯
'Mein Kampf' ৭৭
O. Mazzotta ৪০, ৪৫
Piedmont ১১৫
Reich Chancellory ৭৩
Risorgimento আন্দোলন ১১৫
Ruckert ১১৭, ১৩৮
Schlegel ১১৭, ১৩৮
Schopenhauer ১১৭, ১৩৮
Sophienstr ৭১
Staats maenner und Diplomaten bei Hitler, Part two ৭৩৫
The Fuehrer's Diary ৭৩
the Government of Great Germany ৩৯
"Wartime Falsehoods" ১২৩
(Dr.) Woermann ৪০
Wehrmacht ৭৩
'Wille and Macht' পত্রিকা ১০৯


9 789350 404102